বাসর লগ্ন

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই কার্ত্তিক,
১৮৮৫ শকাব্দ

টা. ৮·৭৫

প্রচ্ছদসজ্জা :
শ্যামল সেন

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
মুদ্রাকর : দেবেশ দত্ত বি. কম.
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়াকস্
৮১ সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

বিমল মিত্র
বন্ধুবরেষু

হয়, কিশলয় আরো শ্যামল। অনেকে দেয়ালের গায়ে দাগ কাটে। একদিন শেষ হল। মুছে গেল একদিনের পরমায়ু।

আগে এ ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজ আমলে শুধু ফাঁসির দিন দণ্ডিতের মনস্কামনা পূর্ণ করা হত। তাকে জিজ্ঞাসা করা হত আয়ুর গোধূলিতে কি তার বাসনা? কোন্ আহার্যে তার আসক্তি? বিশেষ কোন কামনা আছে কি না? অনেকে চাইত, গীতা কিংবা কোরান-শরীফ থেকে পাঠ শুনতে। অনেকে বলত কীর্তন হোক। নশ্বর পাপীদেহ আবর্তিত করে হোক পরমেশ্বরের নামগান।

ইদানীং দিনকাল পালটেছে।

কয়েদীরা চায় কাজের অবসরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ হোক। সৎ আলোচনা! কারাপ্রাচীরের আবেষ্টনীর মধ্যে পথভ্রান্ত, বিপথগামী কয়েকটা প্রাণ ক্ষণেকের জন্য শান্তিলাভ করুক।

কিন্তু রমলা বাধা দিয়েছে। নামগান হোক, হোক শাস্ত্রীয় আলোচনা জেলখানার বিরাট প্রাঙ্গণে। কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তার সেলের মধ্যে কোনপ্রকার সৎ আলোচনার ভান সে সহ্য করবে না। হৃদয়ের শান্তি কি এতই সহজলভ্য যে গীতার কয়েকটা অনুচ্ছেদ আওড়ালেই বুকে পরিপূর্ণ রসের জোয়ার জাগবে! বিদ্রোহী, অশান্ত আত্মা সুখের আস্বাদ পাবে!

তাহলে সারাটা জীবন রমলা কেন জ্বলেছে এমন উল্কার মত! একবিন্দু শান্তিবারির আশায় তৃষিত চাতকীর মতন আকাশের বুকে পক্ষ বিস্তার করে উড়ে বেড়িয়েছে! একমুঠো ছাইয়ে পর্যবসিত করেছে নিজের সুখ-শান্তি, কামনা-বাসনা।

তর্কভূষণ চোখের সামনে থেকে সরে যাবার পর একটু একটু করে রমলা শান্ত হল। বিস্রস্ত বসন ঠিক করে নিল। আঁচল টেনে পরিপূর্ণ উরস ঢাকল। দুটো হাত গালের ওপর দিয়ে দেয়ালে হেলান দিল।

সামনে বিরাট প্রাচীর। দুটো পৃথিবীকে আলাদা করে

দিয়েছে। ছ'জাতের মানুষকে। সৎ আর অসৎ [illegible]
নিষ্পাপ।

কিন্তু তাই কি! পাঁচিলের ওপারে সাজানো [illegible]
কোলাহলমুখর আর একটা পৃথিবীতে কি সবাই নিষ্পা[illegible]
সজ্জন!

না, রমলা ঘাড় নাড়ল। তা নয়। একদল [illegible]
ফন্দি জানে। জানে কিভাবে সমাজের মুখে হাতচাপা [illegible] যায়।
ছলে, বলে, কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে প্রতিপক্ষকে [illegible] ফেলে
দেওয়া যায় নিপীড়নের কাঁটাতারের মধ্যে।

তা ছাড়া আর কি! তা না হলে বিখ্যাত ব্যারিস্টার রাজীব
রায়ের মেয়ের এ দশা কেন হবে! নিগুনশোভিত [illegible]
অন্ধকারাচ্ছন্ন সেলে বসে মৃত্যুর পদধ্বনি গোনবার কি কারণ
থাকতে পারে!

দেয়ালে অনেক দূর পর্যন্ত খড় আঁটা। [illegible]
আসামীরা দেয়ালে মাথা ঠুকে বিচারের কঠিন [illegible]
হাতের পায়ের নখ পর্যন্ত ছোট করে কাটা। যদি [illegible]
টিপে ধরে ফাঁসির পরোয়ানাকে কেউ ফাঁকি দেয়।

রমলার হাসি আসে। প্রেমের ফাঁদের মতন মৃত্যুর ফাঁদও এই
ভুবনে বিচিত্রভাবে পাতা। ধরা পড়বার অজস্র পথ। ছোটখাটো
সাবধানতার বেড়া দিয়ে মহামৃত্যুর আওতা থেকে [illegible] যায়
না।

ফাঁসিমঞ্চের মৃত্যু রমলা এড়াতে চায় না। বিচারের [illegible]
শেষ অঙ্ক দেখতে চায়। একেবারে যবনিকা পতন পর্যন্ত।

আঁচলটা বিছিয়ে রমলা শুয়ে পড়ল। মেঝের [illegible] শুলে
গরাদের ফাঁক দিয়ে আকাশের টুকরো দেখা যায়। একমুঠো
বেলফুলের মতন নক্ষত্রের ছিটে। আগে নক্ষত্রগুলোর নাম রমলা
জানত। পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, মৃগশিরা, আর্দ্রা, বিশাখা। [illegible]

কে শিখিয়েছিল। ছাদে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তাকে আর কি শিখিয়েছিল জয়ন্ত!

মুদিত এক নম্রমুখী কোরককে কুসুমের পূর্ণতা দিয়েছিল। তার ছোঁয়ায়, বর্ণে, গন্ধে, লাবণ্যে ঝলমল করে উঠেছিল সূর্যমুখী।

সে কবে! কোন্ যুগে! বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া অস্পষ্ট স্বপ্নের টুকরোর মতন একটু একটু করে রমলার মনের কোণে জেগে ওঠে।

কলেজের করিডর দিয়ে দ্রুতপায়ে রমলা হাঁটছিল। এমনিতেই দেরি হয়েছে ক্লাসের। পাশে আরতি।

পথরোধ করে দাঁড়াল জয়ন্ত।

ছেলেটিকে এর আগে কলেজে রমলা দেখেছে। সিঁড়ির মাঝখানে, লাইব্রেরি-ঘরে, করিডরের বাঁকে। চোখে পড়বার মতন ছেলে। কানাঘুষো শুনেছে বাপ অস্টিয়োলজিস্ট ডক্টর সৌরীন ঘোষাল, মা আইরিশ মহিলা। বিদেশ থেকে ডিগ্রির সঙ্গে ডক্টর ঘোষাল এঁকেও আহরণ করে এনেছিলেন।

দীর্ঘদেহ। অগ্নিবর্ণ, কেবল নীলচক্ষু। বাংলা বলে চমৎকার, ইংরাজী আরো ভাল।

রমলা পাশ কাটাবার চেষ্টা করল। পারল না। ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল, একি এভাবে পথ আটকে দাড়ালেন কেন?

এন. কে. বি.-র ক্লাসে দয়া করে যাবেন না।

যাব না ক্লাসে? কারণ?

কারণ তিনি আমাদের অপমান করেছেন।

রমলা আড়চোখে জয়ন্তর আপাদমস্তক দেখল। মানুষ নয়, দৃঢ় একটা প্রতিজ্ঞা যেন পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। কণ্ঠস্বরেও সেই প্রতিজ্ঞার স্পর্শ।

ঠোঁট কামড়ে রমলা দু'এক মিনিট কি ভাবল, তারপর বলল, আপনাদের অপমান করেছে বলে আমরা ক্লাসে যাব না?

জয়ন্ত আরো টান হয়ে দাঁড়াল। দুটো হাত বুকের ওপর রেখে বলল, হ্যাঁ, তাই। আপনারা আর আমরা অখণ্ড। এখানে থার্ড-ইয়ার ফোর্থ-ইয়ারের প্রশ্ন নয়, সমষ্টির কথা। একটি ছাত্রের অপমানে সমস্ত ছাত্রের অপমান। এখানে আমরা এক জাতি।

এতক্ষণ পরে আরতি কথা বলল। শান্ত, লাজুক মেয়ে। অধ্যয়নসর্বস্ব। ক্লাসের দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে ইতিমধ্যেই অধীর হয়ে উঠেছে।

কি অপমান করেছেন এন. কে. বি জানতে পারি?

হ্যাঁ, পারেন বৈকি, জয়ন্ত রমলার দিক থেকে চোখ সরাল আরতির দিকে, আমাদের বলেছেন a pack of fools.

রমলা মুচকি হাসল, এন. কে. বি. সত্যদ্রষ্টা এটুকু বোঝা গেল, কিন্তু ক্লাসসুদ্ধ বোকামির কি পরিচয় দিলেন?

জয়ন্ত দুটো হাত কোমরে রেখে বলল, এন. কে. বি. টেনিসনের Crossing Of The Bar কবিতা পড়াচ্ছিলেন।

Sunset and evening star
And one clear call for me
And may there be no moaning of the bar
When I put out to sea.

এন. কে বি. বললেন এমন কবিতা নাকি জগতে বিরল। কোন দেশে, কোন কালে এমন গভীর অধ্যাত্মবাদপূর্ণ লাইন লেখা হয় নি। আমরা কজন আপত্তি করলাম। বললাম, এই দেশেই দু' একজন কবি এর চেয়েও তত্ত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক কবিতা লিখেছেন। এন. কে. বি. চটে উঠলেন। বললেন, আমরা নাকি pack of fools.

জয়ন্তর কথাবার্তার ফাঁকে আরতি পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতে করতে বলল, আপনাদেরই অন্যায় হয়েছে লেকচারারের মুখে মুখে তর্ক করা। মনের মধ্যে যাই থাক, মুখে অন্ততঃ মেনে নেওয়াই উচিত ছিল। সরুন, ক্লাসে যাই।

আরতি এগোতে গিয়েই থেমে গেল। রমলা বজ্রমুষ্টিতে তার একটা হাত আঁকড়ে ধরেছে, না, তোমার ক্লাসে যাওয়া চলবে না আরতি। আমার মনে হয় জয়ন্তবাবু যা বলেছেন, তাই ঠিক। এন. কে. বি. শুধু ফোর্থ-ইয়ারকেই নয়, গোটা ছাত্রসমাজকেই অপমানিত করেছেন। ফোর্থ-ইয়ারের ছেলেরা স্কুলের ছাত্র নয় যে নির্দ্বিধায় সব কিছু মেনে নেবে। মনে সন্দেহ উপস্থিত হলেও মুখ ফুটে কিছু বলবে না। তা ছাড়া সত্যিই কি টেনিসন জগতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবি! বস্তুবাদী দেশে তু'একটা শৌখিন অধ্যাত্ম-বাদের কথা বললেই হাততালি জোটে, কিন্তু এ দেশে যেখানে মাঝি, জেলে, গরুর গাড়ির গাড়োয়ান পর্যন্ত দেহতত্ত্বের গান গায়, সাধু সন্ত ফকিবের কণ্ঠে ঈশ্ববেব উপাসনা-সংগীত, সেখানে হালকা অধ্যাত্মবাদের দাম কি খুব বেশী! জয়ন্তবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা এন কে বি.-র ক্লাসে যাব না। শুধু তাই নয়, টিফিনের সময় এন. কে. বি-র সঙ্গে দেখা করব, আপনি আমাব সঙ্গে থাকবেন। তাঁকে প্রমাণ করতে হবে টেনিসনের সঙ্গে তুলনীয় কবি আমাদের দেশে নেই, অন্ততঃ অধ্যাত্মবাদে।

জয়ন্ত সরে দাঁড়াল। খুব নম্রগলায় বলল, ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যাপাবটা মাঝপথেই থেমে গেল। সম্ভবতঃ এন. কে. বি. ঘটনাব আঁচ পেয়েছিলেন। বোর্ডে নোটিশ টাঙানো হল। ছুটির পরে এন. কে. বি. থার্ড আর ফোর্থ-ইয়ারের কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কবতে চান। তালিকার মধ্যে জয়ন্ত আর রমলা তুজনেরই নাম ছিল।

সেই শুরু।

কারণে অকারণে রমলা আর জয়ন্ত কাছাকাছি আসতে শুরু করল। স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নেব উৎসবে রমলা যদি গান গায় তাহলে গানের সঙ্গে বেহালা বাজাবে জয়ন্ত। স্পোর্টস-এ জয়ন্ত প্রাইজ

পেলে, কাপ হাতে তার ফটো তুলতে এগিয়ে আসবে রমলা। তা ছাড়া পথে, ঘাটে, কলেজের করিডরে, সিনেমার লবিতে দুজনকে প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যেতে লাগল।

কঠিন সিমেণ্টের ওপর বুটের শব্দ। প্রহরারত সেপাইয়ের পদধ্বনি। আগে আগে রমলা চমকে জেগে উঠত। তার ঘুম ভেঙে যেত। আর চোখ বুঁজতে সাহস হত না। মনে হত ঘুমিয়ে পড়লেই বুঝি লোকটা বুটসুদ্ধ ওর বুকের ওপর এসে দাঁড়াবে। নিশ্বাস রোধ করে দেবে। চাপা আর্তনাদও আর বের হবে না।

কিন্তু ধীরে ধীরে মৃত্যুভয় কমে এল। মনে হল জীবন্মৃত এই অবস্থার চেয়ে মৃত্যু অনেক সহনীয়। গাঢ় কালো একটা যবনিকা পলকে চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেবে। শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ চিন্তা। সকল যন্ত্রণার সমাধি।

আঁচলটা আস্তে আস্তে রমলা মুখে ঢাকা দিল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রুপোলী জ্যোৎস্না। কয়েদখানাতেও চাঁদের আলো আসে। বলা যায় না, কান পেতে থাকলে হয়তো বাইরের পৃথিবীর পাখীর স্বরও শোনা যেতে পারে। পাখী আর চাঁদ। জীবনের হাতছানি। অলীক, যন্ত্রণাবিহ্বল জীবনের।

রমলা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুলের পরিচর্যা করছিল, বাপ রাজীব রায় এসে দরজায় দাঁড়ালেন।

রমি।

দর্পণে প্রতিফলিত বাপের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে রমলা উত্তর দিল, কি বাপী?

তোমার হয়ে গেলে আমার ঘরে একটু এস, কথা আছে।

রমলা যখন বাপের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল, তখন রাজীব রায় একটা বই হাতে ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন।

রমলা আস্তে আস্তে গিয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়াল।

বাপী, তোমার মাথায় বিরাট একটা টাক হচ্ছে।

হচ্ছে বুঝি? রাজীব রায় হাসলেন, টাকাহীন টাক বহন করা যে কি কষ্টের রমি, তা কি করে বোঝাব। তুমি টেবিলের ওপর থেকে আমার ডায়েরিটা নিয়ে এসো তো।

রমলা ডায়েরিটা এনে বাপের কোলে ফেলে দিতেই, ডায়েরির মধ্য থেকে একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ল।

কার চিঠি বাপী?

আমার বন্ধু নীরদ বোসের। তার ছেলে, শান্তনু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে জার্মানী থেকে ফিরছে।

রাজীব রায় ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে, চেয়ে বললেন, এ মাসের সতরোই দমদম-এ ল্যাণ্ড করছে। তার মানে পরশু।

রমলা কোন কথা বলল না। বলবার মত কোন কথাই সে খুঁজে পেল না। বন্ধুর ছেলে বিদেশ থেকে শিক্ষা শেষ করে স্বদেশে ফিরছে, এতে আনন্দিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কৃতী সন্তান সকলেরই গৌরব। কিন্তু রাজীব রায়ের আনন্দের কারণ কি শুধু এইটুকুই! অন্য কোন আশা, অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নিভৃতে মনের কোণে বাসা বাঁধে নি কোথাও!

তোমার এই বন্ধুকে আমি কখনও দেখি নি বাপী? রমলা বাপের বিরলকেশ মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করল।

দেখেছিস, তোর মনে নেই। তুই তখন খুব ছোট।

কোথায় থাকতেন তিনি?

আমরা দুজনে এক স্কুলে, এক কলেজে পড়েছি। থাকতামও পাশাপাশি বাড়িতে। ভবানীপুরে। বি. এ. পাস করে ব্যারিস্টারি পড়তে আমি বিলাত চলে গেলাম, নীরদ এম-এ, বি-টি পড়ে শিক্ষকতা শুরু করলে। শেষজীবনে কোন স্কুলে বুঝি হেডমাস্টার হয়েছিল। তারপর বহুদিন আর দেখাশোনা ছিল না। হঠাৎ এ বাড়ির গৃহপ্রবেশের দিন নীরদ এসে হাজির। এ পাড়ায়

কোন বইয়ের দোকানে নিজের লেখা বই দিতে এসে আমার বাড়ির ফটকে আঁটা নেমপ্লেটের ওপর নজর পড়ে। দোকান-দারের কাছে আমার পরিচয় পেয়ে সোজা ড্রয়িংরুমে এসে দাঁড়িয়েছিল।

তখনও অতিথি-অভ্যাগত আসা শুরু হয় নি। আমি কৌচের ওপর বসে, তুই আমার পাশে। নীরদ ধপাস করে বইয়ের গোছা কার্পেটের ওপর ফেলে আমায় বুকের মধ্যে জাপটে ধরল। ব্যাপার দেখে তুই কেঁদে উঠেছিলি। তোর কান্নার শব্দে নীরদ মুখ ফিরিয়ে তোকে দেখে বলল, মেয়েছেলে জাতটাই হিংসুটে রে রাজীব, কারুর ভাল দেখতে পারে না। আমাদের কোলাকুলি দেখে তোর মেয়ের কান্নার বহর দেখেছিস ?

তারপর অনেকদিন আর দেখা হয় নি। মাঝে মাঝে তুজনে তুজনকে চিঠিপত্র লিখেছি। সুখতুঃখের খবরের আদানপ্রদান। তোর মায়ের মারা যাবার খবর পেয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে চারপাতা চিঠি লিখেছিল। মাঝখানে অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। কাল চিঠি পেয়েছি। লিখেছে শান্তনু পরশু দমদমে নামছে। দিন তুয়েক আমাদের বাড়ি থাকবে। এখানে কোন অফিসে বুঝি কি দরকার আছে। তাই ভাবছি পরশু তোকে নিয়ে দমদম যাব শান্তনুকে রিসিভ করতে।

আমি আবার কেন বাপী ?

আমি বুড়োমানুষ, আমার সঙ্গে শান্তনু আর কতক্ষণ কথা বলবে। তুই গেলে অন্ততঃ ও দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা বলবে। নীরদ লিখেছে তার ছেলে নাকি খুব মুখচোরা।

রমলা কথা বাড়াল না। কেবল বলল, পরশু তাহলে কলেজ কামাই হবে যে বাপী ?

একদিনে আর কি এমন ক্ষতি হবে। তোর মা নেই, অতিথির দেখাশোনা তো তোকেই করতে হবে।

শেষদিকে রাজীব রায়ের গলা বাষ্পাচ্ছন্ন। ফেলে আসা দিনের কথাই বুঝি ভিড় করে এল মনের মাঝখানে।

আজও রমলার পরিষ্কার মনে আছে। এতগুলো বছর কেটে গেছে। শান্ত, নিস্তরঙ্গ দিনেব সমষ্টি নয়, উদ্দাম, উত্তাল, ঝঞ্ঝাগতি সময়ের প্রবাহ। আঘাতে আঘাতে রমলার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। শতচূর্ণ করে দিয়েছে মেরুদণ্ড।

তবু মনে আছে। সে দিনের প্রত্যেকটি কথা। প্রতিটি মানুষের চলাফেরা। কিছু ভোলে নি রমলা। কোন কথা ভুলতে সে পারে না।

পথে মোটর থামিয়ে রাজীব রায় নেমে গেলেন। একটা মালা আর একটা ফুলের তোড়া নিয়ে ফিরলেন। মালাটা নিজের কাছে রেখে তোড়াটা তুলে দিলেন রমলার হাতে।

শান্তনু নেমে এলে আমি গলায় মালা পরিয়ে দেব, তুই দিবি তার হাতে ফুলের তোড়া, কেমন?

তোড়াটা হাতে নিয়ে রমলা হাসল, তুমি এমন করছ বাপী, যেন বিদেশে আর কেউ কখনও যায় নি। শান্তনুবাবুই প্রথম।

রাজীব রায় একটু লজ্জা পেলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে বললেন, তা যাবে না কেন! নীবদের ছেলের কথাই আলাদা তার সঙ্গে কার তুলনা!

তুমিও তো বিলেত গিয়েছিলে বাপী, কে তোমার জন্য দমদমে ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল?

রাজীব রায় পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে মেয়ের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, আমাদের আমলে দমদম দিয়ে আমরা আসতাম না রমি, আমরা আসতাম বম্বে হয়ে হাওড়া স্টেশন। সেখানে একজন অবশ্য মালা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সাহস করে আর পরাতে পারে নি।

কে বাপী?

তোর মা। ভিড়ের এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। শাড়ির

আড়ালে যুঁইফুলের মালা। কিন্তু হাতের মালা হাতেই রয়ে গেল, আমার গলায় আর উঠল না।

রমলা আড়চোখে বাপের দিকে চেয়ে দেখল। গাড়ির কাঁচের মধ্য দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে চেয়ে আছেন। অনেক দূরে দিকচক্রবাল-রেখায় অস্পষ্ট একটি বিন্দুর দিকে। হয়তো প্লেন, হয়তো পাখী।

হঠাৎ চাপা গর্জন কানে যেতেই রমলা চমকে উঠে বসল। একি হল! কেন এমন হয়! অতীত আর বর্তমান কিভাবে এমন করে নিঃশেষে মিশে যায়!

সেদিনের প্লেনের প্রপেলারের গর্জন আজও কেমন করে রয়েছে শ্রবণের পরিধির মধ্যে!

না, প্লেন নয়, কালবৈশাখীর গুরু গুরু। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। জ্যোৎস্না উধাও জমাট মেঘের অন্তরালে। কারা-প্রাচীরের ওপারে গাছের মাথা দুলছে। ধুলোর ঘূর্ণি উঠেছে জেলখানার প্রাঙ্গণে।

এখনি বৃষ্টি আসবে। পৃথিবীর সন্তাপহারী বৃষ্টি। মেদিনীর ফাটলে ফাটলে তপ্তদাহ ধোঁয়ার আকারে আকাশে উঠবে। দগ্ধ প্রান্তর শুষে নেবে প্রাণধারা। পৃথিবী কোমল, শ্যামল হবে। কিন্তু কি করে প্রশমিত হবে রমলার অন্তরের সন্তাপ। কোন্ ধারাবর্ষণে।

আস্তে আস্তে রমলা এগিয়ে এল। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। ধারে কাছে কোথাও ধারাপাত শুরু হয়েছে।

ঘুম আসে না রমলার। গ্রীষ্মের দাবদাহে যেমন সারারাত ছটফট করে তেমনি অশান্ত হয়ে ওঠে বর্ষার রাতেও। হৃদয় থেকে যে শান্তি হরণ করেছে, সেই বুঝি নিদ্রাও হরণ করেছে নয়ন থেকে। যতদিন বাঁচবে, ততদিন চলবে এই অস্বস্তিকর অবস্থা।

সেদিনও মেঘের এই গুরুগর্জনের শব্দ নিয়েই প্লেন দমদমের

মাটি ছুঁয়েছিল। ফুলের মালা হাতে রাজীব রায় আর ফুলের তোড়া হাতে রমলা চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে শান্তনুকে খুঁজেছিল। দেখতে পায় নি। দুজনের কেউই দেখে নি তাকে, কিন্তু আশা করেছিল দেখলে, আন্দাজে চিনতে পারবে।

সব লোক বেরিয়ে যেতে রমলাই আঙুল দিয়ে বাপকে দেখিয়েছিল। রাজীব রায় চেয়ে দেখে অনেকক্ষণ আর চোখ ফেরাতে পারেন নি।

খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। পরনে সাদা পাঞ্জাবি, ধুতি, কাঁধে চাদব। খুব ছোট করে ছাঁটা চুল। সুগৌর বর্ণ। আয়ত দুটি চোখ। পুরু চশমার কাঁচে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে।

তুমি এস্ বোস? নীরদ বোসের ছেলে?

একটা হাত প্রসারিত করে রাজীব রায় ছেলেটিব সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ছেলেটি মুখ তুলে একবার রাজীব রায়কে দেখে নিয়ে বলল, আমি শান্তনু। আপনিই বোধ হয় কাকাবাবু?

রাজীব রায় ঘাড় নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শান্তনু নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিল।

ওরই মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রমলা একবার নকল কাশির শব্দ করল, কিন্তু শান্তনু ফিরেও দেখল না।

মোটরে উঠে রাজীব রায় আর রমলার খেয়াল হল ফুলের তোড়া আর মালা দুজনের হাতেই রয়ে গেছে। শান্তনুকে আর দেওয়া হয় নি।

একেবারে কোণের ঘরটা শান্তনুর জন্য নির্দিষ্ট হল। খেতে বসে আবার এক বিপত্তি।

আমি তো টেবিলে খাই না কাকাবাবু। আমায় মেঝেতে একটা বন্দোবস্ত করে দিন।

রমলা অবাক। রাজীব রায়ও আশ্চর্য হলেন।

সেকি, বিদেশে কি করতে?

সেখানেও মেঝেতেই খেতাম। আর একটা কথা কাকাবাবু, আমি মাছ মাংসও খাই না। কথাটা হয়তো আমার আগেই বলা উচিত ছিল। আমাকে নিরামিষ বন্দোবস্ত করে দিন।

অগত্যা রাজীব রায়, রমলা, শান্তনু তিনজনের জন্যই মেঝেতে আসন পাতা হল। বাপ আর মেয়ে পাশাপাশি। শান্তনু একটু দূরে। ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়ে যায়।

তাহলে ওদেশে তোমার খুবই অসুবিধা হয়েছিল শান্তনু?

না, অসুবিধা আর কি হবে!

এই খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে?

আজ্ঞে না, ফল, সবজি, দুধ প্রচুর খেতাম। নিরামিষাশী ওদেশেও কিছু লোক আছে, আপনি তো জানেন।

কিছু একটা বলা দরকার বলেই রমলা বলল, আপনাকে একটু ঘি-ভাত দিতে বলি?

শান্তনু রমলার দিকে চোখ ফেরাল না। রাজীব রায়ের দিকে চেয়ে বলল, আমি অত্যন্ত মিতাহারী। আজ বরং আমার খাওয়া যেন একটু বেশীই হয়ে গেল।

আর কোন কথা হল না। রাজীব রায় চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগলেন। রমলার কথা বলার কোন প্রবৃত্তি হল না।

মুখ হাত ধোয়ার পর রাজীব রায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথাও বেরোবে নাকি শান্তনু? যদি বেরোও তো চলো আমার সঙ্গে, আমি কোর্টে যাবার পথে তোমাকে নামিয়ে দিতে পারি।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শান্তনু বলল, একটু ধর্মতলার দিকে যাব। আমি এখনই তৈরী হয়ে আসছি।

তৈরী হতে মিনিট পনরোর বেশী লাগল না। সস্তা ছিটের স্যুট। টাইয়ের অবস্থাও তাই।

রমলা অনেক কষ্টে হাসি সামলাল।

আশ্চর্য! পোশাক, চালচলন দেখে কে বলবে এই লোকটি তিন বছর বিদেশে কাটিয়েছে। বাপের কাছেই রমলা শুনেছে, বিদেশে থাকা, খাওয়া আর পড়ার সমস্ত খরচ যুগিয়েছে এক নামকরা প্রতিষ্ঠান। শান্তনুর ইনজিনিয়ারীংয়ের ফল দেখে তারাই খরচপত্র করে তাকে বাইবে পাঠিয়েছে উচ্চশিক্ষার জন্য। শর্ত, ফিরে এসে তাদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবে।

কিন্তু এই পোশাকে, এই রুচি নিয়ে শান্তনু অত বড় একটা পোস্টে বসার যোগ্যতা অর্জন করবে কি করে। পদোচিত একটা মর্যাদা থাকা দরকার বৈকি।

বেশী ভাবার বমলা সময় পেল না। টেলিফোনটা বেজে উঠতেই পাশেব ঘবে ছুটে গেল।

হ্যালো!

কি ব্যাপার, কলেজ কামাই কেন? তারের ওপ্রান্তে জয়ন্তর গলা।

তুমি আজ বিকেলে যদি আমাদের বাড়ি আসো জয়ন্ত তো মজার একটা জিনিস দেখাতে পারি।

কি জিনিস?

এসোই না, নিজের চোখেই দেখবে।

ঠিক আছে, যাব। কিন্তু কলেজে এলে না কেন?

বিকেলে এলেই বুঝতে পারবে।

আমি চিন্তিত হচ্ছি রম।

চিন্তিত? কেন?

পৃথিবীর সব রহস্য তুমি বুঝি বিকেলের জন্য জমিয়ে রেখেছ?

রমলা এ কথার সোজাসুজি কোন উত্তর দিল না। বলল, তুমি কোথা থেকে ফোন করছ? কলেজ থেকে?

মাথা খারাপ। এসে একটা ক্লাস করেছি, তারপর তোমার বন্ধু আরতির কাছে খোঁজ করে জানলাম, তুমি আস নি। ব্যস, জীবনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ কাটালাম 'মঞ্জু-কেবিনে'। তারপর এক ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস্ থেকে তোমায় ফোন করছি।

তুমি কবিতা লেখো জয়ন্ত।

লিখব ?

হ্যাঁ, এরকম মনের অবস্থায় যে কোন লোকই কবি হয়ে যায়। তুমি চেষ্টা কর।

ধন্যবাদ। তার জন্যও তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া প্রয়োজন। প্রেরণা না পেলে কবিতা লেখা যায় না।

বেশ, বিকেলে আমি থাকব।

রমলা ফোন নামিয়ে রাখল।

শান্তনু বিকেলের আগেই বাড়ি ফিরল। রাজীব রায় নেই, কাজেই অতিথির সব ভার বস্তুতঃ রমলার ওপর।

তাই রমলা পর্দার ওপার থেকে বলল, আসতে পারি ?

কয়েক মিনিট নিস্তব্ধতা, তারপর শান্তনুর গলা শোনা গেল, আসুন।

পর্দা সরিয়ে রমলা ভিতরে ঢুকল।

সুটকেশ খুলে শান্তনু কি সব কাগজপত্র বের করছিল, রমলা এসে দাঁড়াতে সেগুলো সরিয়ে রাখল।

আপনি কি এখন কিছু খাবেন ? চা কিংবা শরবত ?

শান্তনু মাথা নাড়ল, না, এ সময়ে আমি কিছু খাই না।

বিকেলে চা খান তো, না দুধ ? রমলার স্বরে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের রেশ।

শান্তনু কিন্তু ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল, দুধ যদি দিতে পারেন, দুধই খাব। ওখানে দুধই খেতাম।

ইচ্ছা করেই রমলা কোণের চেয়ারে চেপে বসল একটা পায়ের ওপর আরেকটা পা রেখে।

আপনি তো এখানেই থাকবেন এখন ?

এখানে, মানে ? শান্তনু ঘুরে বসল।

এখানে মানে কলকাতায়।

এখনও কিছু ঠিক করি নি। বাবাকে সব কথা লিখেছি, তিনি যা বলবেন, তাই হবে।

রমলা মুখ টিপে হাসল, তারপর বলল, আজ বিকেলে আমার এক বন্ধু আসবে আলাপ করতে।

মেয়েদের সঙ্গে আমি কি আলাপ করব! শান্তনুর মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া।

মেয়ে নয়, ছেলে। আমার পুরুষ বন্ধু।

আড়চোখে একবার রমলার আপাদমস্তক দেখেই শান্তনু সুটকেশ গোছানোয় মন দিল ঘাড় হেঁট করে।

কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে রমলা উঠে এল।

জয়ন্ত এল প্রায় পাঁচটার সময়। প্রসাধন সেরে সবে রমলা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে একটা মেয়েদের পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল, এমন সময় সিঁড়িতে পরিচিত পায়ের শব্দ।

আসতে পারি ?

কে, জয় !

চলতে চলতে প্রহরী থমকে দাঁড়াল। টিপটিপ যুঁইফুলি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভিজে হাওয়া। আকাশের বুকে তখনও বিদ্যুতের দাপাদাপি। বর্ষাতি জড়িয়ে, গামবুট পায়ে প্রহরী কর্তব্যরত।

একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, রাত অনেক হয়ে গেল মায়ী, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়। কি বলছ বিড়বিড় করে ?

খেয়াল ছিল না রমলার। জয়ন্তর নামটা বুঝি একটু জোরেই উচ্চারণ করে ফেলেছিল। প্রহরীর কণ্ঠস্বরে খেয়াল হল। খেয়াল

হল এটা রাজীব রায়ের সাজানো ড্রইংরুম নয়, সরকারের কয়েদখানা।

অনেকগুলো দিনের কুজ্ঝটিকা। কিন্তু কিছু অস্পষ্ট নয়, কোন ঘটনাই একটু ম্লান নয়। যেটুকু আবছা, সেটুকু রমলা বুকের রক্ত দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

চোখ বুজলেই সেদিনের মানুষগুলো ভিড় করে দাঁড়ায়। একরাশ পুতুলের মতন। হাসে, কাঁদে, হাত নাড়ে; অলক্ষ্যে বিরাট এক শক্তির তন্তুটানার তালে তালে।

কই কি মজার জিনিস বল? জয়ন্ত রমলার মুখোমুখি বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করল।

বসো না একটু। তুমি এত চঞ্চল কেন বল তো?

চঞ্চল! জয়ন্ত উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে, পায় নি। আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের মিল আছে। ভাবগত এক মিল। একই যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত অশান্ত দুটি আত্মা।

এ কথা অনেক পরে জয়ন্ত রমলাকে বলেছে। সাজানো ড্রইংরুমে মুখোমুখি বসে নয়। নির্জন পরিবেশে।

মুক্তিকামী দুটি দেশ সূর্যের উপাসনা করে চলেছে। অত্যাচারের নিগড় থেকে, পরাধীনতার গ্লানি থেকে, দুরপনেয় কলঙ্ক থেকে বন্ধনমুক্তির স্বপ্ন।

সেদিন ড্রইরুমে কিন্তু এসব কথা হয় নি। জয়ন্ত রমলার দিকে চেয়ে হেসেছে। রমলা সে হাসির উত্তর দিয়েছে দুটি গণ্ডের আরক্তিম আভায়।

একটু বসো জয়ন্ত, আমি দেখছি।

রমলা জয়ন্তকে বসিয়ে উঠে দাঁড়াল। চৌকাঠ পার হয়ে, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। সন্তর্পণে পা টিপে টিপে দাঁড়াল শান্তনুর ঘরের কাছে।

উদ্দেশ্য ছিল শান্তনুকে ডেকে নিয়ে যাবে ড্রইংরুমে। জয়ন্তর

সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। কিংবা শান্তনুর যদি আপত্তি না থাকে তো জয়ন্তকে আনবে ওপরে। শান্তনুর ঘরে।

পর্দা সরিয়ে একবার উঁকি দিয়েই রমলা চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটি পা এগোতে পারল না। পেছোতেও না।

মেঝের ওপর আসন পেতে শান্তনু বসেছে। খালি গা। সুগৌর বর্ণে কাঞ্চনের আভা। দুটি হাত জোড় করে নিমীলিত নেত্রে বসে আছে। সামনে একটি ফ্রেমে দুটি ফটো। না, কোন দেব দেবীর নয়। একটি পুরুষ আর একটি মহিলার।

কোনদিন রমলা তাঁদের দেখে নি, কিন্তু তবু চিনতে কোন অসুবিধা হল না। সম্ভবতঃ শান্তনুর মা আর বাবা। রাজীব রায়ের কাছে কিছু কিছু রমলা শুনেছে। শান্তনু যখন বিদেশে তখন তার মা মারা যান দু'দিনের জ্বরে ভুগে।

পর্দাটা আঁকড়ে ধরে রমলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এ বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করলে মায়ের একটা ফটো পাওয়া যেতে পারে। বাপের ঘরের দেয়ালের এক কোণে ছোট একটা ফটো। বছরে একবার বোধ হয় মৃত্যুতিথি স্মরণ করে সে ফটোতে একগাছা করে মালাও ঝোলানো হয়। ব্যস, ওই পর্যন্ত। সারা বছর আর ফটোটার তেমন খোঁজ পড়ে না।

মা যখন মারা যান, তখন রমলা খুব ছোট। কি হারাল সে সম্বন্ধে কোন চেতনা জাগবার বয়স নয়। সকলের কান্নাকাটি দেখে হয়তো নিজেও একটু কেঁদেছিল। কয়েক ফোঁটা চোখের জলে মায়ের স্মৃতিতর্পণ। তার বেশী কিছু নয়।

তারপর আস্তে আস্তে মা হারিয়ে গেছেন। মায়ের স্মৃতিটুকুও। পিসি এগিয়ে এসে কোলে তুলে নিয়েছেন রমলাকে। স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে তাকে ভুলিয়েছেন। হাজার রকমের খেলনা এসে জড়ো হয়েছে সামনে। আত্মীয়ার দল ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। মায়ের অভাব বোধ করার রমলা অবকাশই পায় নি।

আরও বড় হয়ে কিন্তু এটুকু বুঝেছে, যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করা বিশ্বের কারও পক্ষে বুঝি সম্ভব নয়।

সহপাঠিনীদের বাড়িতে গিয়ে মায়েদের স্নেহময়ী রূপ দেখেছে। সে রূপের তুলনা কোথাও খুঁজে পায় নি।

কোথাও দেরি হলে বান্ধবীরা বলেছে, ফিরতে রাত হলে মায়ের কাছে কি বলব? মা যে জেগে বসে থাকবে। বারান্দার রেলিং ধরে একদৃষ্টে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

রমলা নিজের আর কোন আত্মীয়ার মধ্যে এই রূপ খুঁজে পায় নি।

যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তার চেয়েও বুঝি নিঃশব্দে রমলা ফিরে এল।

চঞ্চল জয়ন্ত তখন উঠে কোণের টেবিলে রাখা মেয়েদের দু'-একটা জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছিল। পায়ের আওয়াজ হতে পিছন ফিরে বলল, এই, কই তোমার মজার জিনিস?

রমলা মুখে খুব ক্লান্ত হাসি ফোটাল। দীপ্তিহীন, পাণ্ডুর হাসি। কৌচের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বলল, তোমাকে ঠকালাম জয়। এমন একটা কিছু না বললে তুমি তো আর আসতে না।

জার্নালগুলো নামিয়ে রেখে জয়ন্ত রমলার পাশে এসে বসল। একেবারে গা ঘেঁষে। এত কাছে যে রমলা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

এই, লক্ষ্মী ছেলে, সরে বস একটু। লোকেরা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। দেখে কি ভাববে। তা ছাড়া বাবার আসার সময় হল।

জয়ন্ত একটু সরে বসল, কিন্তু বলতে ছাড়ল না, এত ভীরু কেন তুমি?

রমলা হাসল, ভবিষ্যতে প্রচুর সাহস দেখাবার প্রয়োজন হবে, বলেই আজ ভীরু হতে হয়েছে।

কথাগুলো বলতে।বলতে রমলা একদৃষ্টে জয়ন্তর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। নীল চোখে অগাধ সমুদ্রের ভাষা। সপ্রতিভ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা।

কিন্তু তবু যেন আকাশপাতাল প্রভেদ। জয়ন্তর বয়স কম, এখনও কথাবার্তায়, চলাফেরায় চটুলতার আভাস। গভীরতা নেই, নেই জীবনকে তলিয়ে দেখার ক্ষমতা। পাশ্চাত্ত্য আর প্রাচ্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ, কিন্তু প্রতীচ্যেব সংকল্পের দৃঢ়তা নেই, প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয় প্রত্যয়।

তোমার চোখদুটো ঠিক তোমার মায়ের মতন, জয়?

প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করল রমলা। মনের মধ্যে যে চিন্তার প্রবাহ উদ্বেল হয়ে উঠেছে, কথার উপলখণ্ড দিয়ে দিয়ে তার বেগ রুদ্ধ করার প্রয়াস পেল।

হ্যাঁ, চোখ আর ঠোঁট। দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে জয়ন্ত বলল। তারপরই কথাটা স্মরণ হয়েছে এইভাবে বলল, কিন্তু, তুমি, তুমি আমার মাকে দেখলে কোথায়?

বা রে মনে নেই, আমাদের কলেজের অ্যানুয়েল ফাংশনে গত বছর তুমি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে! তোমার মা অবশ্য বেশীক্ষণ ছিলেন না। অল্পক্ষণ পরেই উঠে চলে গিয়েছিলেন, তাই না?

জয়ন্ত ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, তাই।

জরুরী কাজ ছিল বোধ হয়।

না, না, আমাদের ফাংশন মার ভাল লাগে নি।

ভাল লাগে নি? কেন, অনেকেরই তো খুব ভাল লেগেছিল।

জয়ন্ত ঠোঁট কাঁপিয়ে হাসল, মার কোন জিনিস ভাল লাগে না, unless it was Irish. এমন কি বাবাকেও নয়।

রমলা দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করল। বহুদিন জয়ন্তর মা এদেশে রয়েছেন, তাঁর স্বামীও এদেশীয়, তবু তিনি শাড়ি পরেন নি।

ভারতীয় সাজার একটুও চেষ্টা করেন নি। এমন কি বাংলা যে বলেন, তাও ভাঙা-ভাঙা।

কিন্তু তোমার বাবাকে তো তোমার মা ভালবেসেই বিয়ে করেছিলেন, জয়।

বাবাকে ভালবাসেন নি। বাবার মধ্যে ভালবাসতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের বিদ্রোহী সত্তাকে। যে বাংলা মা'র মনের মধ্যে রূপ নিয়েছিল তা অগ্নিযুগেব বাংলা। বোমা বারুদের ডিপো। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালীর প্রত্যেক নিশ্বাসে তখন ঘৃণার উদগার। মা ভেবেছিলেন, বাবা বিদেশে গিয়েছেন ডাক্তারী পড়তে নয়, ডাক্তাবী পড়া বাবার শুধু একটা ছল। বাবা আসলে গিয়েছেন মাবাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের আমদানি কবতে নিজের দেশে। তখনকার বাংলার মধ্যে মা অশান্ত, বিক্ষুব্ধ আয়ার্ল্যাণ্ডেরই প্রতিচ্ছবি দেখে-ছিলেন। কিন্তু এদেশে এসেই তাঁর ভুল ভাঙল, বাবা যখন অসীম নিষ্ঠায় চেম্বাব সাজিয়ে বসলেন। দিনরাত ডাক্তারী বই নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। একটু একটু করে বাড়িতে লোকের সমাগম হতে লাগল, কিন্তু যারা এল তারা শুধু রোগীর দল, বিপ্লবী নয়, অগ্নিযুগের ফেরারী আসামী নয়, তখন মার আশাভঙ্গ হল। হয়তো মা ফিবেই যেতেন স্বদেশে কিন্তু সেখানে যাবার কোন আস্তানা ছিল না। একমাত্র আত্মীয়া আমার গ্র্যানি মরবার সময় তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি চার্চে সমর্পণ করে গিয়েছিলেন। জীবিকা অর্জন কঠিন ছিল, তাই নিশ্চিন্ত আবাস আর নিরুদ্বেগ জীবন ছেড়ে মা অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান নি।

সেদিন আর বেশী কথা হয় নি। জয়ন্ত রমলাকে নিয়ে বাইরে বোবোতে চেয়েছিল, রমলা যেতে পারে নি, কারণ বাড়িতে অভ্যাগত।

জয়ন্ত বেরিয়ে যাবার একটু পরেই রাজীব রায় ফিরেছিলেন। হঠাৎ একটা কনসালটেশনের ব্যাপারে দেরি হয়ে গিয়েছিল।

কথাগুলো বলতে বলতে রমলা একদৃষ্টে জয়ন্তর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। নীল চোখে অগাধ সমুদ্রের ভাষা। সপ্রতিভ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা।

কিন্তু তবু যেন আকাশপাতাল প্রভেদ। জয়ন্তর বয়স কম, এখনও কথাবার্তায়, চলাফেরায় চটুলতার আভাস। গভীরতা নেই, নেই জীবনকে তলিয়ে দেখার ক্ষমতা। পাশ্চাত্ত্য আর প্রাচ্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ, কিন্তু প্রতীচ্যেব সংকল্পের দৃঢ়তা নেই, প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয় প্রত্যয়।

তোমার চোখদুটো ঠিক তোমার মায়ের মতন, জয়?

প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করল রমলা। মনের মধ্যে যে চিন্তার প্রবাহ উদ্বেল হয়ে উঠেছে, কথার উপলখণ্ড দিয়ে দিয়ে তার বেগ রুদ্ধ করার প্রয়াস পেল।

হ্যাঁ, চোখ আর ঠোঁট। দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে জয়ন্ত বলল। তারপরই কথাটা স্মরণ হয়েছে এইভাবে বলল, কিন্তু, তুমি, তুমি আমার মাকে দেখলে কোথায়?

বা রে মনে নেই, আমাদের কলেজের অ্যানুয়েল ফাংশনে গত বছর তুমি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে! তোমার মা অবশ্য বেশীক্ষণ ছিলেন না। অল্পক্ষণ পরেই উঠে চলে গিয়েছিলেন, তাই না?

জয়ন্ত ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, তাই।

জরুরী কাজ ছিল বোধ হয়।

না, না, আমাদের ফাংশন মার ভাল লাগে নি।

ভাল লাগে নি? কেন, অনেকেরই তো খুব ভাল লেগেছিল।

জয়ন্ত ঠোঁট কাঁপিয়ে হাসল, মার কোন জিনিস ভাল লাগে না, unless it was Irish. এমন কি বাবাকেও নয়।

রমলা দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করল। বহুদিন জয়ন্তর মা এদেশে রয়েছেন, তাঁর স্বামীও এদেশীয়, তবু তিনি শাড়ি পরেন নি।

ভারতীয় সাজার একটুও চেষ্টা করেন নি। এমন কি বাংলা যে বলেন, তাও ভাঙা-ভাঙা।

কিন্তু তোমার বাবাকে তো তোমার মা ভালবেসেই বিয়ে করেছিলেন, জয়।

বাবাকে ভালবাসেন নি। বাবার মধ্যে ভালবাসতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের বিদ্রোহী সত্তাকে। যে বাংলা মা'র মনের মধ্যে রূপ নিয়েছিল তা অগ্নিযুগের বাংলা। বোমা বারুদের ডিপো। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালীর প্রত্যেক নিশ্বাসে তখন ঘৃণার উদ্গার। মা ভেবেছিলেন, বাবা বিদেশে গিয়েছেন ডাক্তারী পড়তে নয়, ডাক্তারী পড়া বাবার শুধু একটা ছল। বাবা আসলে গিয়েছেন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের আমদানি করতে নিজের দেশে। তখনকার বাংলার মধ্যে মা অশান্ত, বিক্ষুব্ধ আয়ার্ল্যাণ্ডেরই প্রতিচ্ছবি দেখে-ছিলেন। কিন্তু এদেশে এসেই তাঁর ভুল ভাঙল, বাবা যখন অসীম নিষ্ঠায় চেম্বার সাজিয়ে বসলেন। দিনরাত ডাক্তারী বই নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। একটু একটু করে বাড়িতে লোকের সমাগম হতে লাগল, কিন্তু যারা এল তারা শুধু রোগীর দল, বিপ্লবী নয়, অগ্নিযুগের ফেরারী আসামী নয়, তখন মার আশাভঙ্গ হল। হয়তো মা ফিরেই যেতেন স্বদেশে কিন্তু সেখানে যাবার কোন আস্তানা ছিল না। একমাত্র আত্মীয়া আমার গ্র্যানি মরবার সময় তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি চার্চে সমর্পণ করে গিয়েছিলেন। জীবিকা অর্জন কঠিন ছিল, তাই নিশ্চিন্ত আবাস আর নিরুদ্বেগ জীবন ছেড়ে মা অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান নি।

সেদিন আর বেশী কথা হয় নি। জয়ন্ত রমলাকে নিয়ে বাইরে বোরোতে চেয়েছিল, রমলা যেতে পারে নি, কারণ বাড়িতে অভ্যাগত।

জয়ন্ত বেরিয়ে যাবার একটু পরেই রাজীব রায় ফিরেছিলেন। হঠাৎ একটা কনসালটেশনের ব্যাপারে দেরি হয়ে গিয়েছিল।

ফিরেই শান্তনুর খোঁজ করলেন।

বিকেলেও উনি চা খান না বাপী, তাই এক কাপ গরম দুধ আর মিষ্টি দিয়েছি।

শান্তনু কোথায়? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রাজীব রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

ঘরের মধ্যে বসে। খুব আস্তে রমলা বলল।

ঘরের মধ্যে? কেন, ওকে ডেকে বারান্দায় বসলেই পারতিস, কিংবা ঘুরে এলেই পারতিস সামনের পার্কে।

রমলা কিছু বলল না। কি করে বলবে, বারদুয়েক ডেকেছিল, কোন সাড়া পায় নি। ভদ্রলোক একমনে কি একটা বই পড়ছিলেন।

রাজীব রায় পর্দা সরিয়ে শান্তনুর ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এভাবে বদ্ধ ঘরে বসে না থেকে একটু বেড়িয়ে এলে পারতে শান্তনু। বাইরে বেশ একটু হাওয়াও রয়েছে।

শান্তনু বইটা মুড়ে উঠে দাঁড়াল। রাজীব রায়ের দিকে চেয়ে বলল, Structural Engineering-এর একটা বই কিনে এনেছি আজ সকালে। পড়তে পড়তে আর খেয়াল ছিল না। ভারি চমৎকার বই।

এসো বাইরে এসো। তুমি তো চা খাও না। এক গ্লাস শরবত বরং এনে দিক। আমার সঙ্গে বসে খাও।

শান্তনু আর আপত্তি করল না। বাইরের বারান্দায় এসে বসল। পোশাক বদলে রাজীব রায় পাশে বসলেন। বেয়ারা এসে চা জলখাবার দিয়ে গেল। শান্তনুর শুধু শরবত।

খাওয়া প্রায় শেষ হতে রাজীব রায় বেয়ারাকে ডাকলেন, রমলা দিদিমণি কোথায় রে?

দেখছি আজ্ঞে। বেয়ারা সরে গেল।

রমলা ঠিক পাশের ঘরেই বসেছিল। ফুলছিল রুদ্ধ অভিমানে। বার বার দুবার শান্তনুকে ডেকেছে। শান্তনু একটা উত্তর দেওয়া

পর্যন্ত প্রয়োজন মনে করে নি। সামান্য শালীনতাবোধটুকুও বুঝি নেই। অথচ বাবার এক ডাকেই বাইরে বেরিয়ে এল। বারান্দায় পাশাপাশি বসল। এটা তাকে নিছক অবহেলা ছাড়া আর কি! কেন, রমলা কি একটা কথা বলবারও যোগ্য নয়! অথচ তাদের বাড়িতে এসে উঠেছে শান্তনু, যথাযোগ্য সমাদর করার চেষ্টাও তারা করেছে। যে শিক্ষা মানুষকে সামাজিকবোধ সম্বন্ধে সচেতন করে না, সে শিক্ষার কি দাম! কতটুকু!

বেয়ারা খুঁজতে আসতেই রমলা খাটের ওপর শুয়ে পড়ল। এক হাতে বাতিটা আড়াল করে।

দিদিমণি, সায়েব আপনাকে ডাকছেন।

বল, বড্ড মাথাটা ধরেছে। শুয়ে আছি।

শুয়ে শুয়েই রমলা শুনতে পেল বেয়ারা রাজীব রায়কে তার অসুস্থতার সংবাদ জানাল।

রাজীব রায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন, মাথা ধরেছে? সেকি, জ্বরটর হয় নি তো?

বেয়ারা বিড়বিড় করে কি বলল রমলার কানে গেল না। কিন্তু রাজীব রায়ের পাশে বসা লোকটি একটি কথা বলল না। একটি প্রশ্ন নয়।

একটু পরেই দরজার কাছে ভারী পদশব্দ। রাজীব রায় খাটের পাশে এসে দাঁড়ালেন, কি হল, হঠাৎ মাথা ধরল কেন?

রমলা যন্ত্রণার একটা অভিব্যক্তি করে বলল, কি জানি, হঠাৎ মাথাটা বড্ড ধরেছে।

চোখের কোন ব্যাপার নয় তো? তোমায় ক'দিন ধরে বলছি চোখটা মেজর গুপ্তকে একবার দেখিয়ে এসো। আরো একবার তুমি মাথাধরার কমপ্লেন করেছিলে।

মুখ টিপে রমলা হাসল। আরো একবার, মানে বছরখানেক আগে কলেজের পিকনিক থেকে ফিরে রমলা অবশ্য মাথাব্যথার

কথা বলেছিল। সারাটা দিন রোদ লাগানোর জন্য মাথাটা ধরে-ছিল। তখন মেজর গুপ্তকে দেখাবার কথা হয়েছিল।

ও কিছু নয় বাপী, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। এখনই সেরে যাবে।

মাথাটা তুলে রমলা এদিক ওদিক দেখার চেষ্টা করল। বাপের পাশে আর কেউ এসে দাঁড়িয়েছে কি না। আশ্চর্য, ভদ্রলোকের সাধারণ শিষ্টাচারজ্ঞানও কি একটা নেই! ভদ্রতাবোধ!

বাইরে আয়। দক্ষিণেব বারান্দায় বেশ বাতাস বইছে।

রমলা উঠে পড়ল। বেতের চেয়ারগুলো খালি। কেউ নেই।

একটা চেয়াবে বসতে বসতে রমলা বলল, শান্তনুবাবু বুঝি ঘবের মধ্যে বসে আছেন? বিকেলে একবার ডাকতে গিয়ে দেখলাম একটা বই পড়ছেন।

না, শান্তনু বেরিয়েছে। বলল কি একটা দরকার আছে।

মেয়েব পাশের চেয়াবে রাজীব রায় বসে পড়লেন। কিন্তু বসতে আর হল না। বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারা এসে দাঁড়াল। নীচের ঘবে মক্কেল এসেছে।

রমি, আমি উঠি। তুমি কাল একবার চোখটা দেখিয়ে এসো। সকালে আমি মেজর গুপ্তকে ফোন করে রাখব বরং।

রমলা কোন কথা বলল না। বাড়িতে রমলা একেবারে নিঃসঙ্গ। পিসি মারা যাবার পর থেকে ঝি চাকরের সংসার। দূরসম্পর্কীয়া কোন আত্মীয়াও নেই যে এসে সংসারের ভার নিতে পারে, রমলার দেখাশোনা করতে পাবে। বুড়ী ঝি বিনুর মা, সে-ই প্রায় অভিভাবিকা। পিসির আমল থেকে আছে। খুব ছোট দেখেছে রমলাকে।

রমলা চোখ বুজিয়ে ছিল, পায়ের আওয়াজ হতে চোখ খুলে দেখল বিনুর মা এসে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক এই সংসারে প্রাচীনতার প্রতীক। মেপেজুপে কথা বলতে পারে না। জোরে হাসে, কাঁদে আরো জোরে। বাড়ির কারো অসুখবিসুখ হলে, বত্রিশ টাকা

ভিজিটের ডাক্তারের ওষুধের সঙ্গে পঞ্চাননঠাকুরের জলপড়াও বিন্নুর মা চালিয়ে দেয়। রমলার পরীক্ষার আগে স পাঁচ আনার পূজো মানত করে। পাস করলে চাল, তরিতরকারী নিয়ে কালিঘাটে দিয়ে আসে। দরকার হলে রাজীব রায়কেও বলতে ছাড়ে না। কথাবার্তা প্রাকৃতজনসুলভ। শোধরাতে গেলে ক্ষেপে ওঠে।

কি গো দিদিমণি, কার ধ্যান করছ?

রমলা হেসে বলল, তোমার।

আমার? তেমন বরাত কি আর করেছি। আমরা ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। আমাদের দরকার গালাগাল দেবার সময়।

না, না, সত্যি তোমার কথাই ভাবছিলাম বিন্নুর মা।

কেন গো, দিদিমণি?

মাথাটা বড্ড ধরেছে। তাই ভাবছিলাম, বিন্নুর মাকে বললে এখনি কড়া এক কাপ চা করে এনে দিতে পারে। এক চুমুকেই সেরে যাবে মাথার ব্যথা।

তবু ভাল, আমি ভাবলাম বুঝি চোখ বুজে হবু বরের ধ্যান করছ।

হবু বর? তিনি আবার কোথায়? রমলা একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। জয়ন্ত এ বাড়িতে প্রায় আসে বটে, মাঝে মাঝে রমলাও বেরিয়ে যায় তার সঙ্গে, কিন্তু তাকে নিয়ে বিন্নুর মা কোন ঠাট্টা-তামাশা কখনও করে নি। বরং বলেছে, ওই বাচ্ছা ছেলেটা ঘুরঘুর করে আসে কেন? ওটা তো মেলেচ্ছ। মা তো মেম। সাহেব-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করলেই পারে।

বিন্নুর মা একগাল হাসল, কোথায় আবার। বায়ুরথে এসে একেবারে বাড়িতে এসে অধিষ্ঠান হয়েছেন।

শান্তনুবাবু! ফিসফিস করে রমলা বলল।

ওই আজকালকার মেয়েদের বড্ড দোষ দিদিমণি। হুট করে নামটা উচ্চাচরণ করে ফেলো। একবার আমি আড়ালে বিন্নুর

বাপের নামটা বলে ফেলেছিলাম, সে কি কাণ্ড! গোবর খেয়ে তবে প্রাচিত্তিব করতে হল।

তোমাকে কে বললে এসব বাজে কথা? রমলা যেন একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

এ কি আজকের কথা। কবে থেকে ঠিক করা। তোমার বাপের সঙ্গে আর ওই শান্তনুব বাপের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক। তোমার পিসিই সব বলেছিলেন আমাকে।

পিছনে পায়েব শব্দ হতেই বিনুর মা মুখ ফিরিয়ে দেখেই জিভ কাটল। তাবপব দ্রুতপায়ে সেখান থেকে সবে গেল।

শান্তনু এসে দাঁড়িয়েছে। হাবেভাবে মনে হচ্ছে কিছু যেন বলবে।

রমলাই জিজ্ঞাসা কবল, কিছু বলবেন?

না, হ্যাঁ, বলবার কিছু নয়। শুনেছিলাম কাব যেন শরীর খাবাপ হয়েছে, আপনাব কি?

বমলা বিব্রত হল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, না, শরীর খাবাপ ঠিক নয়। আমাব একটু মাথাটা ধরেছিল। এখন ভালই আছি। আপনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন বুঝি?

বেড়াতে ঠিক নয়। বাবাব একটা চিঠি পোস্ট করতে গিয়েছিলাম।

একটু কি ভাবল বমলা, তাবপর বলল, চিঠি পোস্ট করার জন্য আপনি কষ্ট কবলেন কেন? বাড়ির কোন চাকর-বাকরকে দিলেই হত। ফেলে দিয়ে আসত।

নিজের কাজ নিজের হাতে করা উচিত। সামান্য ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী হওয়ার কোন মানে হয় না।

ভাগ্য রমলার। শান্তনু বেতের চেয়ার টেনে বসে পড়ল। অবশ্য রমলার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।

আপনার জার্মানীর কথা একটু বলুন শুনি।

বিন্নুর মা নতুন কথা বলার পর থেকে শান্তনুকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শুরু করেছে রমলা। তাকে জয়ন্তর পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে যাচাই। রং দুজনেরই গৌর। কিন্তু শান্তনুর দীপ্তিতে যেন যজ্ঞাগ্নির স্পর্শ, আর জয়ন্ত এ যুগের বহ্নিমান নিওন আলো। শান্তনু ধীর, সংযত ; জয়ন্ত চঞ্চল, প্রাণবন্ত।

এ হয় না। রমলা মনে মনে মাথা নাড়ল। জয়ন্তকে ছেড়ে শান্তনুকে বরণ করা যায় না। চালচলনে, পোশাকে, আভিজাত্যে এ যুগে অচল। উচ্চশিক্ষা সত্ত্বেও।

আমার জার্মানী নয়। জার্মানীতে আমি গিয়েছিলাম হাতে-কলমে কাজ শিখতে। কয়েকটা বছর পণ্ডশ্রম করে এসেছি।

পণ্ডশ্রম! সে কি?

তা ছাড়া আর কি। যে কাজ শিখে এসেছি, সেটা এদেশের যে-কোন কারখানাতেই শেখা চলত। তার জন্য সাগরপারে যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে একটা কথা। সে কাজ এদেশে করলে লোকে মিস্ত্রী বলত। কথা বলত না। বড়লোকের বাড়িতে ডেকে বসাত না।

শান্তনুর শেষ কথাটায় শ্লেষের হুল ছিল, কিন্তু রমলা সেটা গায়ে মাখল না। শুধু বলল, আপনি বলতে চান, এদেশে dignity of labour বলে কিছু নেই?

কথাটার ইংরাজী করলে তাই দাঁড়ায় বটে।

চেয়ার ঠেলে শান্তনু উঠে পড়ল।

একি, উঠছেন যে?

কিছু পড়া বাকি রয়েছে। একটা বইয়ের অর্ধেকটা পড়েছি, বাকিটা আজ রাত্রেই শেষ করতে হবে। তা ছাড়া আপনারও তো পড়াশোনা আছে।

একটা দিন না পড়লে আর কি হয়?

অনেক কিছু হয়, গম্ভীর শান্তনুর গলা, অভ্যাস খারাপ হয়।

ফাঁকি জিনিসটাও একটা নেশার মতন। ছোট ফাঁকি বিস্তৃত হতে হতে বড় ফাঁকিতে দাঁড়ায়। ছোট লোকসান থেকে বড় লোকসান। যখন চেতনা হয়, তখন জীবনের খাতা জুড়ে কেবল ফাঁকির অঙ্কটাই জ্বলজ্বল করতে থাকে।

নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ফিরে এল। রমলার দিকে চেয়ে বলল, একটা কথা। হয়তো আমার আরো আগেই বলা উচিত ছিল। আজ রাতে আমি কিছু খাব না।

কেন, শরীর খারাপ?

না, আজ পূর্ণিমার রাতে আমি কিছু খাই না।

রমলাকে সম্পূর্ণ অবাক হবার অবকাশ না দিয়েই শান্তনু ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

রমলা আকাশের দিকে চোখ ফেরাল। আজ পূর্ণিমা। গাছে পাতায় রুপোর রং ছড়িয়ে চাঁদ বিরাট একটা ফানুষের মতন আকাশের বুকে ঝুলছে। কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই, অস্বচ্ছ আবরণ নয়।

এই আলোর বন্যায় জয়ন্তর সঙ্গে কোথাও গিয়ে বসলে হত। আউটরাম ঘাটের বুকে কিংবা চৌরঙ্গির ময়দানে। চুপচাপ পাশা-পাশি। পৃথিবীর অসীম সৌন্দর্য নিঃশব্দে শুধু অঙ্গে মেখে নেওয়া। যে লোকটা ঘরে বসে নির্জলা পূর্ণিমাপালন করবে তার পরিচর্যার জন্য এভাবে বসে থাকার কোন মানে হয় না।

লোকটা শুধু একটা কর্তব্যের পিণ্ড। উপদেশের উৎস।

রমলা উঠে পড়ল। নিজের ঘরে যেতে যেতে আড়চোখে একবার শান্তনুর ঘরের দিকে চোখ ফেরাল।

টেবিল ল্যাম্পের সামনে বই রেখে একমনে পড়ছে। বাইরের অবারিত জ্যোৎস্না মনে কোন রেখাপাত করেছে এমন মনে হল না। পূর্তবিদ্যার জাঁদরেল এক বইয়ের আড়ালে মানুষটা নিশ্চিহ্ন।

বেয়ারাকে ডেকে রমলা নির্দেশও দিয়ে দিল। নতুন বাবু রাত্রে কিছু খাবে না।

ভোর হচ্ছে। একটু একটু করে জাগছে কয়েদখানা। আর একটা দিন মুছে গেল রমলার জীবন থেকে। কয়েক মুহূর্তের পরমায়ুর অবসান।

রমলা দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসল। সামনের নিমগাছের ডালে একজোড়া কাক কর্কশকণ্ঠে ডেকে চলেছে। বাসা বাঁধবে তারই খোঁজ করছে। ডালপালা দিয়ে অপরিচ্ছন্ন এক নীড়। আশ্চর্য, সারা শহরে আর বুঝি কোথাও স্থান খুঁজে পেল না। বেছে বেছে বন্দীশালায় এসে জুটল।

হাই তুলে রমলা উঠে দাঁড়াল। এলো চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়ল সারা পিঠে। পিঙ্গল চুলের রাশ। কত দিন তেল পড়ে নি। জট বেঁধে গিয়েছে। হাসি পেল রমলার। তার নিবিড় কালো কেশদামের প্রশংসায় বহুলোক পঞ্চমুখ ছিল। কবি কবিতাও লিখেছিল। সাহিত্যিকের ভাষা চুরি করে জয়ন্ত বলত, চুলের অরণ্য।

আজ আর কেউ একথা বলবে না। কেউ কাছে আসবে না। আজ যারা আসে, তারা সেদিনের ভিড় করে দাঁড়ানো লোকদের কেউ নয়।

শান্তনু দিন তিনেক ছিল। তার মধ্যে রমলার সঙ্গে খুব বেশী কথা হয় নি। শান্তনু যেটুকু সময় বাড়িতে থাকত, নিজের ঘরের মধ্যেই কাটাত। রাজীব রায় ব্যস্ত লোক। অতিথির দিকে খুব নজর দিতে পারতেন না।

একদিন কলেজ থেকে বাড়িতে ফিরেই রমলা অবাক। বিল্টুর মা-ই খবর দিল। বাবু চলে গেলেন।

টেবিলের ওপর হাতের বইগুলো রাখতে রাখতে রমলা জিজ্ঞাসা করল, কোন্ বাবু?

শান্তনুবাবু।

রমলা ঘুরে দাঁড়াল, চলে গেলেন ? হঠাৎ ?

খাওয়াদাওয়া সেরে নিজে বেরিয়ে ট্যাক্সি ডেকে আনলেন। জিনিসপত্রগুলো নিজেই টেনে টেনে নামাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি রামলগনকে ডেকে তাকে দিয়ে নামালাম।

আশ্চর্য, একবার বলে যাওয়াও প্রয়োজন মনে করলেন না !

আমি সে কথা বলেছিলাম দিদিমণি। বললেন, হঠাৎ একটা জরুরী কাজে চলে যেতে হচ্ছে। যাবার মুখে কোর্টে সায়েবের সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

আর কোন কথা বলল না রমলা। বলবারই কিই বা থাকতে পারে। জরুরী প্রয়োজনে চলে যেতে হয়েছে। যাবার সময় গৃহস্বামীকে বলেও গেছে। কর্তব্যের তো কোথাও ত্রুটি হয় নি।

আজই বিকেলে জয়ন্ত দেখা করতে বলেছিল, রমলা বলেছিল পরে খবর দেবে। ভেবেছিল সন্ধ্যা হলেই বাবা নীচের ঘরে মক্কেলকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শান্তনু বেশীরভাগই নিজের ঘরে থাকে। মাঝে মাঝে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। রমলা থাকলে ছু'একটা কথা হয়। একেবারে মামুলী কথা। তবে শান্তনুর সব কিছু প্রয়োজনের দিকে রমলাকে চোখ রাখতে হয়। বাপের নির্দেশ। নয়তো শান্তনু কোনদিনই চাকর বেয়ারাকে ডেকে হুকুম করবে না। হাজার অসুবিধা হলেও মুখ বুজে থাকবে।

শুধু নিছক ভদ্রতা। তার বেশী কিছু নয়। নিজের অন্তরকে রমলা বার বার জিজ্ঞাসা করেছে। সৌজন্য ছাড়া আর কিছু নয়। মনে রং লাগবার মত কোন কারণ ঘটে নি। মনে রং লাগাবার মতন মানুষও নয় শান্তনু।

তার জন্য তো জয়ন্ত রয়েছে।

রমলা টেলিফোনটা তুলে ধরল। ডায়াল করে কান পেতে রইল।

জয়ন্ত নেই। ফোন ধরেছেন জয়ন্তর মা।

অন্য সময় জয়ন্তর মা ভাঙা ভাঙা বাংলা বলেন কিন্তু ফোনে ইংরাজী আরম্ভ করলেন। রমলা কথা বলছে জেনেও।

জয়ন্ত কোথায় গিয়েছে তা তিনি জানেন না। জয়ন্ত তাঁর অত্যন্ত অবাধ্য হয়েছে আজকাল। কোথায় যায় কিছু বলে যায় না। পড়াশুনা একেবারে করছে না। অথচ পরীক্ষার বিশেষ দেরি নেই।

এতগুলো কথার জন্য রমলা তৈরী ছিল না। জয়ন্ত অবশ্য তাকে বলেছিল, ফিরতে একটু দেরি হবে। কলেজে ছাত্র ইউ-নিয়নের কি একটা মিটিং আছে।

আমি রমলা, চিনতে পারছেন আমাকে? রমলা খাঁটি বাংলায় বলল।

রমলা রমলা, চিবিয়ে চিবিয়ে জয়ন্তর মা বারকয়েক উচ্চারণ করলেন, তারপর বললেন, ব্যারিস্টার রাজীব রায়ের মেয়ে? গত-বার কলেজের ফাংশনে যে দেবযানী সেজেছিল? গীটারে রবীন্দ্র সংগীত বাজিয়েছিল?

কথাগুলো অবশ্য ইংরাজীতেই বললেন, কিন্তু রমলা আশ্চর্য হল তাঁর স্মরণক্ষমতা দেখে। সেই কবে দেখা হয়েছে, ঠিক মনে করে রেখেছেন।

জয়ন্তর সঙ্গে রমলা এদিক ওদিক ঘুরেছে কিন্তু কখনও তার বাড়িতে যায় নি। যাওয়ার প্রয়োজন হয় নি। জয়ন্ত রমলার বাড়িতে এসেছে। তার বাপের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। জয়ন্তর বাবাকে রাজীব রায় চিনতে পারেন নি। চিনতে পারেন নি কারণ ডাক্তার হিসাবে জয়ন্তর বাবা খুব সার্থক নন। প্রচুর পড়া-শোনা। সময় পেলেই হাসপাতালে গিয়ে অস্টিয়োলজীর কেস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। হাড়ের অপূর্ব রহস্য, তার বিভিন্ন রোগ, নিদান। রোগী দরজা থেকে ফিরে যায়, জ্ঞান নেই। প্রথমদিকে

যেটুকু ভিড় ছিল, আস্তে আস্তে কমে গেল। এমন অস্থিরচিত্ত, দায়িত্বজ্ঞানহীন ডাক্তারের কাছে রোগ সারার প্রত্যাশা করা বাতুলতা।

শহরে ইদানিং অস্টিয়োলজিস্টের অভাব নেই। যাদের বিদ্যার চেয়ে ভড়ং বেশী। জ্ঞানের চেয়েও আড়ম্বর। কি করে রোগীর মন ভোলাতে হয়, তা তাদের জানা। কাজেই যত বড় হবার কথা, জয়ন্তর বাপ এত বছরেও তত বড় হতে পারেন নি।

জয়ন্তর মা-ই জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলতে হবে জয়ন্তকে?

শুধু বলবেন আমি ফোন করেছিলাম। শুকনো গলায় কথা-গুলো বলে রমলা রিসিভার নামিয়ে রাখল।

জয়ন্তর মার গলায় কেমন যেন অপ্রসন্নতার সুর। কিছু ভাল নয়, কেউ ভাল নয়, পৃথিবী একটা নীরস, বিস্বাদ গ্রহ। নিজের জীবনের বিষণ্ণতা সব কিছুতে ছায়াপাত করেছে। দাম্পত্যজীবনে সুখী নন, নিজের বাছাই করা মানুষটাও মনোমত হয় নি। এই ক্ষোভ ফুটে উঠেছে কথাবার্তায়।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হতেই রমলা বেরিয়ে এল। রাজীব রায় কোর্ট থেকে ফিরছেন।

এই সময়টা রমলা বাপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাঁর কোট, টাই খুলে দেয়। চা জলখাবার খায় একসঙ্গে।

মোজা খুলতে খুলতে রাজীব রায় বললেন, শান্তনু চলে গেল।

হ্যাঁ, বাপী। একেবারে হঠাৎ। আমি কলেজ থেকে ফিরে দেখলাম, চলে গেছেন।

হঠাৎ ঠিক নয়। চিঠি এসেছে নীরদের খুব অসুখ। শান্তনু আমাকে চিঠি দেখিয়ে গেল।

কি অসুখ বাবা?

তা কিছু লেখে নি। চিঠি লিখেছে ওর সম্পর্কের এক কাকা। আমি বলেছি, পৌঁছে যেন আমাদের একটা চিঠি দেয়।

আমরা খুব উদ্বিগ্ন থাকব। নিরদের অসুখের খবরে আমার মনটাও খুব খারাপ হয়ে গেছে। আজ বিকেলে একটা কনসাল-টেশন ছিল, শরীর খারাপের অজুহাতে পালিয়ে এসেছি।

রমলা কোন উত্তর দিল না। বেয়ারার হাত থেকে নিয়ে চায়ের কাপগুলো বেতের টেবিলের ওপর সাজাতে আরম্ভ করল।

তুই আজ কোথাও বেরোস নি রমি?

যাব বাবা। একটু পরে বেরোব। একটু মার্কেটে যাবার দরকার আছে।

তা হলে তুলসীকে বলে দে না গাড়িটা যেন গ্যারেজে না তোলে। আমি তো আর কোথাও বেরোব না।

না বাবা, গাড়ির দরকার নেই। ট্রামে বাসেই যাব। তেমন ভিড় দেখি তো একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিলেই হবে।

রাজীব রায় চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলেন। রমলাও চায়ের কাপ তুলে ধরেছিল, হঠাৎ পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল।

একবার দেখে আসি বাবা। আমার একটা ফোন আসবার কথা আছে।

ফোনের ওপারে জয়ন্তর গলা, আমি জয়ন্ত।

এই, একটু আগে তোমাকে ফোন করেছিলাম।

কোথায়? বাড়িতে?

হ্যাঁ, আর কোথায় করব?

আমি কিন্তু বাড়ি থেকে ফোন করছি না। একটা দোকান থেকে করছি। পার্ক স্ট্রীটের সেই দোকান।

রমলা আস্তে বলল, তোমার মা ফোন ধরেছিলেন।

মা! কি বললেন?

উঃ, গলাটা যেন বরফের মতন ঠাণ্ডা। বললেন, তুমি পড়া-শোনা কিছু করছ না। কেবল হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছ।

তাবের ও প্রান্ত থেকে হাসির তরঙ্গ ভেসে এল।

কি, হাসছ যে?

মা আমায় কি বলে জান? বলে, আমি নাকি Daddy's child. মায়ের কেউ নই। বড় হলে জীবনেও নাকি বাবার মতনই unpractical একটা মানুষ হয়ে উঠব। নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার দিকে একটু যত্ন নেই, ভালমন্দ বোঝার বুদ্ধি নেই, অস্থিরচিত্ত এক নিষ্কমা পুরুষ।

জয়ন্ত সুর বদলাল। গম্ভীব গলায় বলল, যাক, আজ দেখা করার কি হবে?

বল কোথায় যাব?

তুমি নিউ মার্কেটে চলে এস। লিণ্ডসে স্ট্রীটের গেটের কাছে আমি থাকব। আসছ তো?

নিশ্চয়ই—আধঘণ্টার মধ্যে গিয়ে পৌঁছাচ্ছি।

বমলা ফোন বেখে রাজীব রায়ের কাছে ফিরে এল।

বাপী, আমি তা হলে বেরোচ্ছি একটু।

এস। বেশী বাত কব না কিন্তু। বাজীব রায় পাইপ ধরাতে ধবাতে বললেন।

চোখ তুলে দেখেই রমলা বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকাল। এই এক অস্বস্তি। প্রত্যেকদিন। জেলার আসেন। সঙ্গে ডাক্তার। প্রত্যেকদিন বমলাকে পরীক্ষা করেন। বক্তের চাপ, হার্টের অবস্থা, নাড়ীর গতি।

আশ্চর্য ব্যবস্থা। আর ক'দিন পরেই যে মানুষটা নিঃশেষে মুছে যাবে পৃথিবী থেকে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তার শরীরের এত তবিবত কবার কি অর্থ হতে পারে। তা ছাড়া ওই যন্ত্র দিয়ে মানুষেব রোগেব কতটুকু আর ধরা যায়। হার্টের স্পন্দন দেখে কি বোঝা যায় হৃদয়ের উত্তাল উন্মাদনা! যে ঝড় চলেছে সারা

হৃদয় মন্থন করে, তার কতটুকু ধরা পড়বে ওই যন্ত্রে! অলীক একটা সান্ত্বনা, অর্থহীন নিয়মতান্ত্রিক শুষ্ক রীতি।

কেমন আছেন? ডাক্তার মুখে হাসি আনার চেষ্টা করলেন।

ছুটো হাতে মাথা চেপে রমলা বসেছিল। মুখ না তুলেই বলল, ভাল, খুব ভাল। মিছামিছি কেন আপনারা সময় নষ্ট কবতে আসেন বলুন তো?

এ প্রশ্নে ডাক্তার বিচলিত হলেন না। কোটের পকেট থেকে স্টেথস্‌কোপ বের করতে করতে বললেন, সময় নষ্ট আর কি। এই তো আমাদের কাজ।

এবার জেলার কথা বললেন, পিনাকীবাবু বলছিলেন সতীনাথ তর্কভূষণের ভাগবতপাঠ আপনি শোনেন নি। তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেন, এসব কি আপনার ভাল লাগে না? সৎগ্রন্থ পাঠ, সৎ আলোচনা?

বমলা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে জেলারের দিকে চেয়ে রইল। উদাস, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। জেলাবকে নয়, আরো দূরের যেন কিছু দেখছে। জেলের পাঁচিল, দূরান্তের গাছপালা সব পার হয়ে।

কি ভাবছেন? জেলার আর একবার মনে করিয়ে দিলেন।

ভাবছি না কিছু, রমলা মাথা নাড়ল, সব ভাবনাচিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। এ পৃথিবী খুব ভাল লেগেছিল। সব কিছুতে নতুন অর্থ খুঁজে পেতাম, কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি, পৃথিবী আমায় ঠকিয়েছে। যা দেখেছি, সেটা পৃথিবীর ছদ্মবেশ। তার আসল রূপ দেখলে চমকে উঠতে হয়।

তাইতো বলছি, এখন এমন কিছু শোনা দরকার যা পৃথিবীর কলুষতার, আবিলতার উর্ধ্বে। মনকে উন্নীত করে কামনা বাসনার পারে। জেলার কিছু পরিমাণে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

রমলা হাসল, কথাগুলো একসময়ে শুনতে খুব ভাল লাগত। দর্শনের প্রফেসর অনেক ভাল ভাল কথা বলতেন, কিন্তু সেগুলো

শিখে শুধু পরীক্ষায় পাস করা যেত, জীবনে প্রয়োগ করা যেত না। জীবনে এথিক্স্এর স্থান নেই। বিবেক শুধু আত্মতৃপ্তির দোহাই, সত্যভাষণ একটা দুর্বলতা।

ডাক্তার এগিয়ে গেলেন, দাঁড়ান, পরীক্ষাটা করে নিই আগে।

জেলার সরে এসে বাইবে পায়চাবি করতে লাগলেন। নতুন কিছু নয়। ফাঁসির এমন আসামীও তিনি দেখেছেন। যত দিন এগিয়ে আসে, ভেঙে পড়ার বদলে ক্ষেপে ওঠে। কেউ নরম কথা বললে, সহানুভূতি দেখালে চীৎকার করতে থাকে। মনে করে সাবাটা পৃথিবীব লোক তাকে ব্যঙ্গ কবছে, কিংবা কৃপা করছে তার অসহায় অবস্থাব।

ডাক্তার ফিবে এসে দাঁড়াতে জেলার জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখলেন ?

এমনি ভাল, তবে খুব দুর্বল। শুনলাম খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, আমিও সে খবর পেয়েছি। বলাও হয়েছে অনেক কিন্তু কয়েদী কোন কথায় কান দেয় না।

ডাক্তার মাথা নাড়লেন, সমস্ত ব্যাপারটাই ভারি unfortunate.

দুজনে বেরিয়ে যেতে রমলা স্নান করতে গেল। দু'পাশে প্রহরী। ছিটকে পালিয়ে যাবে রমলা, সেজন্য নয়, কি জানি যদি কলে মাথা ঠোকে কিংবা রাস্তার ওপর থেকে ইঁট কুড়িয়ে নিয়ে নিজেকে শেষ কবার চেষ্টা করে। তা হলে বিচারকের হুকুমের খেলাপ হবে। মোমমাখানো দড়ির আলিঙ্গন ব্যর্থ হবে।

স্নানপর্ব শেষ হল। জাঁদরেল এক জমাদারনী গা মুছিয়ে দিল। চুল ঝেড়ে দিল।

রমলা নিজের সেলে ফিরে এল।

সেদিন ঠিক সময়ে রমলা গিয়েছিল। নিউ মার্কেটের সামনে জয়ন্ত দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে গোলাপের তোড়া।

জয়ন্ত কিছু বলার আগেই রমলা হাত বাড়িয়ে গোলাপের তোড়া নিজের হাতে নিল। বলল, কি চমৎকার ফুলগুলো! তুমি কি করে জানলে সাদা রং আমার পছন্দ?

তোমার নিষ্কলঙ্ক হৃদয় দেখে। জয়ন্ত হাসল।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ডাকলে নাকি?

উঁহু, চল ময়দানে গিয়ে বসি।

দূরে দূবে আলোর সার। পিছনে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের আবছা কাঠামো। রমলা আব জয়ন্ত এক গাছের নীচে বসল।

তোমাকে যেন একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে জয়ন্ত!

অন্যমনস্ক? কই না তো!

হুঁ, তোমার নীলচোখে কিসের ছায়া?

বোধ হয় তোমাকে হারাবার।

আহা, সত্যি বল না।

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। হাত দিয়ে ঘাস ছিঁড়ল, তারপর অন্যদিকে চেয়ে বলল, বাড়ির আবহাওয়াটা ভাল লাগছে না।

বাড়ীর আবহাওয়া?

হাঁ, আমাদের বাড়ির। মার অত্যাচার প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে।

বমলা কোন কথা বলল না। একদৃষ্টে চেয়ে রইল জয়ন্তর দিকে।

রোজ রাত্রে বাবা বাড়ি ফিরলেই মার চীৎকার শুরু হয়। বাবা জীবনে কিছু কবতে পারলেন না, সেই আপসোস। কিছু করতে পারা মানে প্রচুর অর্থ আনা। রোগীকে নিংড়ে। অন্ততঃ তা হলেও মাব আয়ার্ল্যাণ্ড ছেড়ে আসার কিছু ক্ষতিপূরণ হবে।

বিদ্রোহী ভারত দেখার স্বপ্ন মার নিভে গেছে, এখন মা চান নবাবী ভারত দেখতে। যে ভারতে মহার্ঘ রত্ন ধুলোয় গড়াগড়ি যায়। যে ভারতের ঐশ্বর্যের পরিসীমা নেই, অন্ততঃ বিদেশীদের চোখে। জন্মভূমিই যদি ছাড়লেন, প্রায় ধর্মচ্যুতই যখন হলেন, তখন কিন্তু একটা খেসারত তাঁর চাই। বাবাকে দু'হাতে রোজগার করতে হবে, থাকতে হবে মোগল প্রিন্সের মতন। এ জীবনধারার এক রতি কম হলেই মা অসন্তুষ্ট হবেন। আজ সকালেও বাড়িতে বিশ্রী একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। গোলমাল দেখে জুতোজোড়া হাতে নিয়ে আমি আস্তে আস্তে পালিয়ে এসেছি।

টেলিফোনে আমার মায়ের গলাব আওয়াজও তাই খুব গম্ভীর ঠেকল।

খুব আস্তে প্রায় স্বগতোক্তিব মতন রমলা বলল।

মাব গলার আওয়াজ সব সময়েই গম্ভীর।' মা সুখী নন। বাবা নাকি প্রতাবণা কবে মাকে বিয়ে কবেছেন। অথচ আমি জানি বাবা প্রতারণা কববাব মানুষ নন। মার আকাশচুম্বী কল্পনা বাবাব মধ্যে রূপ নেয় নি, তাই মায়ের আক্ষেপ।

তা হলে কি হবে? খুব ভয়ে ভয়ে রমলা জিজ্ঞাসা করল।

কিছু হবে না। বাবা যদি তর্ক করতেন, প্রশ্ন করতেন, আপত্তি জানাতেন, তা হলে এই ফাটল বাডত। গোটা দাম্পত্য-সৌধ একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে যেত, কিন্তু বাবা বোঝেন মার এ অশান্তির উৎস কোথায়, তাই তিনি একটি কথাও বলেন না।

খুব আশা করে আজ রমলা জয়ন্তর কাছে এসেছিল। অনেক কথা বলবে, অনেক কথা শুনবে। যৌবনের বহুবিচিত্র পাখনায় ভর করে পৃথিবী ছাডিয়ে উড়ে যাবে মেঘলোকে। অনেক উঁচুতে যেখান থেকে পৃথিবীর দুঃখ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা কিছু দেখা যায় না ভাল করে। কেবল নবনীশুভ্র মেঘের ভার, সুখ আর পরিতৃপ্তির প্রতীক।

কিন্তু জয়ন্তর মা আর বাপের দাম্পত্য কাহিনীতে অনাগত দিনের ভয়ের বীজ বুঝি লুকানো আছে। অমঙ্গলের কালো একটা আস্তরণ। কে জানে সেই কালো ছায়াটা পরিব্যাপ্ত হয়ে ওদের আকাশও অন্ধকার করে তুলবে কি না।

অন্য কথা বল জয়, অন্য কথা বল!

জয়ন্ত কিছুক্ষণ রমলার আবেগদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, বল কি কথা তুমি শুনতে চাও?

তোমার কথা। আমার কথা। আমাদের কথা।

আমি তো মন ঠিক করে ফেলেছি। বি. এ.-টা পাস করলেই একটা চাকরি জুটিয়ে নেবো, তারপর ছিটকে বেরিয়ে আসব সংসার থেকে। মার আওতা থেকে।

তারপর?

তারপর তোমাকে নেব। হয়তো তোমার একটু কষ্ট হবে। নিজেকে গুটিয়ে ছোট করে নিতে হবে আমার সংসারে। হাজার অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে কিন্তু এসবের ক্ষতিপূরণ আমি করব আমার ভালবাসা দিয়ে। আমার অর্থকৃচ্ছ্রতা ঢাকব আমার হৃদয়ের উত্তাপে।

জয়! একটা হাত বাড়িয়ে রমলা জয়ন্তর একটা হাত চেপে ধরল।

রমলা নিজেকে সামলে নিল। হাত বাড়িয়ে টেবিলের একটা পায়া চেপে ধরেছিল। কঠিন, নিষ্প্রাণ কাঠের টুকরো। আবেগ নেই, উত্তাপ নেই, স্পন্দন নেই। রমলাব আজকের জীবনের মতনই নীরস।

ঢেউয়ের ধাক্কায় রমলা সরে সরে এসেছে। এক কূল থেকে আর এক কূল। প্রাণের শিকড় দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরার আগেই ঝড়ের বেগে আবার স্থানচ্যুত হয়েছে। আশ্রয়হীনতার একটানা কাহিনী। কাছের মানুষ সব সরে সরে গেছে। দূরের

বিদ্রোহী ভারত দেখার স্বপ্ন মার নিভে গেছে, এখন মা চান নবাবী ভারত দেখতে। যে ভারতে মহার্ঘ রত্ন ধুলোয় গড়াগড়ি যায়। যে ভারতের ঐশ্বর্যের পরিসীমা নেই, অন্ততঃ বিদেশীদের চোখে। জন্মভূমিই যদি ছাড়লেন, প্রায় ধর্মচ্যুতই যখন হলেন, তখন কিন্তু একটা খেসারত তাঁর চাই। বাবাকে দু'হাতে রোজগার করতে হবে, থাকতে হবে মোগল প্রিন্সের মতন। এ জীবনধারার এক রতি কম হলেই মা অসন্তুষ্ট হবেন। আজ সকালেও বাড়িতে বিশ্রী একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। গোলমাল দেখে জুতোজোড়া হাতে নিয়ে আমি আস্তে আস্তে পালিয়ে এসেছি।

টেলিফোনে তোমার মায়ের গলার আওয়াজও তাই খুব গম্ভীর ঠেকল।

খুব আস্তে প্রায় স্বগতোক্তির মতন রমলা বলল।

মার গলার আওয়াজ সব সময়েই গম্ভীর।' মা সুখী নন। বাবা নাকি প্রতারণা করে মাকে বিয়ে করেছেন। অথচ আমি জানি বাবা প্রতারণা করবার মানুষ নন। মার আকাশচুম্বী কল্পনা বাবার মধ্যে রূপ নেয় নি, তাই মায়ের আক্ষেপ।

তা হলে কি হবে? খুব ভয়ে ভয়ে রমলা জিজ্ঞাসা করল।

কিছু হবে না। বাবা যদি তর্ক করতেন, প্রশ্ন করতেন, আপত্তি জানাতেন, তা হলে এই ফাটল বাড়ত। গোটা দাম্পত্য-সৌধ একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে যেত, কিন্তু বাবা বোঝেন মার এ অশান্তির উৎস কোথায়, তাই তিনি একটি কথাও বলেন না।

খুব আশা করে আজ রমলা জয়ন্তর কাছে এসেছিল। অনেক কথা বলবে, অনেক কথা শুনবে। যৌবনের বহুবিচিত্র পাখনায় ভর করে পৃথিবী ছাড়িয়ে উড়ে যাবে মেঘলোকে। অনেক উঁচুতে যেখান থেকে পৃথিবীর দুঃখ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা কিছু দেখা যায় না ভাল করে। কেবল নবনীশুভ্র মেঘের ভার, সুখ আর পরিতৃপ্তির প্রতীক।

কিন্তু জয়ন্তর মা আর বাপের দাম্পত্য কাহিনীতে অনাগত দিনের ভয়ের বীজ বুঝি লুকানো আছে। অমঙ্গলের কালো একটা আস্তরণ। কে জানে সেই কালো ছায়াটা পরিব্যাপ্ত হয়ে ওদের আকাশও অন্ধকার করে তুলবে কি না।

অন্য কথা বল জয়, অন্য কথা বল!

জয়ন্ত কিছুক্ষণ রমলার আবেগদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, বল কি কথা তুমি শুনতে চাও?

তোমার কথা। আমার কথা। আমাদের কথা।

আমি তো মন ঠিক করে ফেলেছি। বি. এ.-টা পাস করলেই একটা চাকরি জুটিয়ে নেবো, তারপর ছিটকে বেরিয়ে আসব সংসার থেকে। মার আওতা থেকে।

তারপর?

তারপর তোমাকে নেব। হয়তো তোমার একটু কষ্ট হবে। নিজেকে গুটিয়ে ছোট কবে নিতে হবে আমার সংসারে। হাজার অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে কিন্তু এসবের ক্ষতিপূরণ আমি করব আমার ভালবাসা দিয়ে। আমার অর্থকৃস্ছ্রতা ঢাকব আমার হৃদয়ের উত্তাপে।

জয়! একটা হাত বাড়িয়ে রমলা জয়ন্তর একটা হাত চেপে ধরল।

রমলা নিজেকে সামলে নিল। হাত বাড়িয়ে টেবিলের একটা পায়া চেপে ধরেছিল। কঠিন, নিষ্প্রাণ কাঠের টুকরো। আবেগ নেই, উত্তাপ নেই, স্পন্দন নেই। রমলার আজকের জীবনের মতনই নীরস।

ঢেউয়ের ধাক্কায় রমলা সরে সরে এসেছে। এক কূল থেকে আর এক কূল। প্রাণের শিকড় দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরার আগেই ঝড়ের বেগে আবার স্থানচ্যুত হয়েছে। আশ্রয়হীনতার একটানা কাহিনী। কাছের মানুষ সব সরে সরে গেছে। দূরের

মানুষ, যাদের রমলা কোনদিন দেখে নি, দেখার আশাও করে নি, তারা ভিড় করে চারপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মাংসলোভী কুকুরের দলের মতন। রমলার অনুনয়, কাকুতি সব ভস্মীভূত হয়েছে তাদের কামনার আগুনে। মানবতার নির্মোক খুলে ফেলে তারা দানব হয়ে উঠেছে।

জমাট অন্ধকাব দিনগুলোর কথা মনে হলে আজও রমলা শিউরে ওঠে। মৃত্যু কি তার চেয়েও অন্ধকার! আরও সর্বগ্রাসী!

শুধু বি. এ. পাস কবলে হবে না জয়। হাজার গ্র্যাজুয়েট এই শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমাকে কিছু একটা হতে হবে। কোন্ বিশেষ একটা লাইনে যেতে হবে। রমলা বোঝাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু কি লাইনে আমি যেতে পারি? জয়ন্ত ভাবতে শুরু করল, তারপরই বলল, আমি উকিল হতে পারি কিংবা ব্যারিস্টার? তোমাব বাবার মতন?

হ্যাঁ, পাবো। তাই তোমাকে হতে হবে। বাপীর বয়স হয়েছে আমার কোন ভাই নেই, কাজেই বাপীর প্র্যাকটিশও তুমি পেয়ে যাবে।

কিন্তু জয়ন্ত সন্দেহ প্রকাশ করল, তুমি? তুমি কি করবে?

আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য। যতদিন তুমি না ফেরো দু'চোখে প্রত্যাশাব প্রদীপ জ্বালিয়ে তোমার প্রতীক্ষায় থাকব।

একটা হাত বাড়িয়ে রমলাকে জয়ন্ত কাছে টেনে নিল।

প্রতীক্ষায় থাকব। তোমার প্রতীক্ষায়। যতদিন তুমি না ফেবো।

সেদিনের ময়দানের ঘন অন্ধকারে অদৃষ্টদেবতা খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। দুজনের কেউ বুঝতে পারে নি। মনে করেছিল আচমকা বাতাসে বুঝি কেঁপে উঠেছিল কৃষ্ণচূড়া আর পিপুলের অজস্র পাতা।

পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে সে রাতে রমলা ফিরেছিল। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করেছিল। পাছে ঘুমিয়ে পড়লে সুখের রেশটুকু ছিঁড়ে যায়। কিন্তু যায় নি। জাগরণের চেয়েও নিদ্রা আরও মধুর আবেশ উপহার দিয়েছিল। স্বপ্নে জয়ন্ত এসেছিল। নিষিদ্ধ প্রার্থনা নিয়ে। তাকে ফেরাতে পারে নি রমলা। নিজেকে নিঃশেষে তার কাছে সমর্পণ করেছিল।

হৈ চৈ চীৎকারে রমলার দিবাস্বপ্নের ঘোর কেটে গেল।

বাইরে কুৎসিত গালিগালাজের ফোয়ারা ছুটেছে। মেয়ে কয়েদীর দল একজনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। মেট আর জমাদারও ছুটে আসছে।

প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সপ্তাহে ছু'একদিন তো লেগেই আছে।

ঝুমরু আর বুলাকিবিবি। একই অঞ্চলের বাসিন্দা। একই দলের। চোলাই মদ আর জাল নোটের কারবার। এরা করত না। করত এদের মরদেরা। জিনিসপত্র থাকত এদের হেফাজতে। দলের কে একজন টাকা খেয়ে পুলিসকে অলিগলি বাতলে দিল। এক রাত্রে জাল ছড়িয়ে পুলিস দলকে দল পাকড়াও করল। কেবল বুলাকিবিবির মরদ উধাও। তাকে পুলিস ধরতে পারল না। বুলাকিকে হাজার নির্যাতন করেও নয়।

ছুজনেরই জেল। এক বছর করে। শাস্তি হল, কিন্তু ঝগড়া শেষ হল না।

ঝুমরু বলে, তোর মরদ চুকলি খেয়েছে। চুপিচুপি খবর দিয়েছে লালপাগড়িকে। বেশরম আওরত কাঁহাকা! জেল থেকে বেরিয়ে তোর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব। রশিদকে দিয়ে খতম করে দেব তোকে।

প্রথম প্রথম বুলাকি অভিযোগ কানে তুলত না। নেহাত

অসহ্য হলে খিঁচিয়ে উঠত, থাম কসবি! সে পুলিসের কাছে চুকলি খেলে পুলিস তাকে এমনই করে খুঁজে বেড়াত?

ওসব লোকদেখানো। ও ঢং আমরা বুঝি। তোর পেয়ারের লোক কোথায় আছে তুই ঠিক জানিস। এতো এতো পয়সা পেয়েছিস পুলিসের কাছ থেকে। জেল থেকে বেরিয়ে মজাসে থাকবি।

এরপর আর সহ্য করতে পারে নি বুলাকি। খুরপি দিয়ে ঘাস নিড়োচ্ছিল, সেটাই ঝুমরুব কপাল লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল। বরাত ভাল ঝুমরুর। কপালে লাগে নি, লাগল গালে। দরদব করে রক্ত পড়তে শুরু করল।

যত না লেগেছিল, তার চেয়ে বেশী আর্তনাদ করে উঠল ঝুমরু।

ওরে বাবা রে, শয়তানী জানে মেরে ফেললে রে! আর একটু হলে চোখটা কানা হয়ে যেত!

সবাই ভিড় করে দাঁড়াল। ঝুমরুকে পাঠাল হাসপাতালে আর বুলাকিবিবিকে জেলারের সামনে।

দুজনকে দু'জায়গায় কাজ দিয়ে দেখেছে। দু'রকমের কাজ। কিন্তু ঠিক কি করে দুজনে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। মেটের কড়া পাহাবাকে ফাঁকি দিয়ে। তারপর কেজিয়া শুরু করে দিয়েছে।

এরা এদিকে ভাল। মনের যা কিছু তাপ, যত কিছু জ্বালা নির্বিচারে প্রকাশ করে। কে কি ভাবল, কে কি বলবে, তার পরোয়া করে না। দরকার হলে পরস্পরের চুলের ঝুঁটি আঁকড়ে ধরে মনের ক্ষোভ মেটায়।

কিন্তু অবরুদ্ধ একটা দাহ রমলার প্রতিটি লোমকূপ পুড়িয়ে দেয়। ফেটে পড়তে পারে না বলেই, অন্তরে অন্তরে গুমরে মরে। নিরুদ্ধ লাভাস্রোত মজ্জায় মজ্জায় বন্দী করে প্রাণান্তকর এক জীবনযাত্রা।

কবে আসবে সেই অনন্ত বিস্মৃতির দিন। সব যন্ত্রণার অবসান হবে। একটা অস্বস্তির ইতি। ময়ূরী যেমন আকাশের দিকে তৃষিত দু'চোখ মেলে চেয়ে থাকে মেঘের স্তবকের প্রত্যাশায়, রমলার সমস্ত সত্তা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে সেই বাঞ্ছিত দিনটির।

দিন দশেক পরেই রাজীব রায় কোর্ট থেকে ফিরে মেয়েকে ডেকে পাঠালেন।

রমলা সবে বই নিয়ে বসেছিল, বাপের ডাকে উঠে এল।

কি বাপী?

আজ কোর্টে শান্তনু এসেছিল দেখা করতে।

শান্তনুবাবুর বাবা কেমন আছেন বাপী?

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে রাজীব রায় হেসে উঠলেন, ভাল আছে, খুব ভাল আছে নীরদ।

তবে ওঁর অসুখের খবর পেয়ে শান্তনুবাবু যে দেশে গেলেন?

মিথ্যা খবর। নীরদ লেখে নি, লিখেছিল শান্তনুর গ্রামসম্পর্কে এক কাকা।

এ রকম মিথ্যা খবর দেওয়ার মানে?

আসল খবর দিলে যদি শান্তনু না যায়।

রাজীব রায় যেন ক্রমেই হেঁয়ালী হয়ে উঠছেন। বোঝা দুষ্কর। ভ্রূ কুঁচকে রমলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আর সে কোন প্রশ্ন করবে না। যদি বলতে হয় তো বাপীই বলুক।

তাই হল। রাজীব রায়ই বললেন।

শান্তনুকে ডেকে পাঠিয়েছিল একটি মেয়ে দেখবার জন্য। সে কথা লিখলে পাছে সে না যায়, তাই বাপের অসুখের খবর দিয়েছিল।

আশ্চর্য তো।

কি আশ্চর্য ?

তোমার বন্ধুর ছেলের বিয়েতে তুমি একটা নিমন্ত্রণ-পত্রও পেলে না ?

বিয়ে হয়েছে তোকে কে বলল ? শান্তনু বলে গেল, ও রকম অশিক্ষিতা গ্রামের মেয়েকে সে বিয়ে করবে না।

কেন বাপী, শান্তনুবাবু যে রকম জপতপ করেন, অমাবস্যা পূর্ণিমা পালন করেন, তাতে গ্রামের মেয়েই তো তাঁর পক্ষে ভাল ছিল।

গ্রামের মেয়েতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু সে শিক্ষিতা মেয়ে চায়। সত্যিকারের শিক্ষিতা। সে কথাও আলোচনা করলাম তার সঙ্গে। শিক্ষিতা মানে কলেজের ডিগ্রি পাওয়া নয়, এ দেশের ঐতিহ্য আর কৃষ্টিতে বিশ্বাসী। অবশ্য শান্তনু স্পষ্টই বলল, এখন সে বিয়ে করার কথা মোটেই ভাবছে না। চাকরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে সে বিয়ে করবে না।

রমলা কোন কথা বলল না। শান্তনুর রুচি অভিরুচিব ব্যাপারে তার বলারই বা কি থাকতে পারে। সম্ভবতঃ, শান্তনুবাবু ভারতবর্ষের অতীত সংস্কৃতিতে মহীয়ান কোন রমণী চান। খোঁজার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁর নিজের, কাজেই এসব ব্যাপারে রমলার কিছু বলার প্রশ্নই ওঠে না।

কাল বিকেলে আসতে বলেছি শান্তনুকে।

আমাদের এখানে ?

হ্যাঁ। সে কোথায় দুটো ঘর নিয়ে রয়েছে। বললাম আমাদের বাড়িতে থাকতে, তাতে সে রাজী নয়। অগত্যা, কাল বিকেলে তাকে নিমন্ত্রণ করে এলাম।

দু'দিন জয়ন্ত কলেজে আসছে না। রমলা ভেবেছিল, ফোন করে একবার খবর নেবে, কিন্তু জয়ন্তর মার তুহিন-শীতল কণ্ঠস্বরের কথা মনে কবে আর সাহস পায় নি। অমন নিস্তরঙ্গ, নির্বেগ

গলা শুনলে ভয় হয় রমলার। মনে হয়, ওদের জীবনেও অমনই বিক্ষুব্ধ সুরের স্পর্শ লাগবে।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসেই রমলা অবাক। বাড়ির সামনে শান্তনু পায়চারি করছে।

একি আপনি বাইরে কেন? শান্তনুর আপাদমস্তক দেখতে দেখতে রমলা জিজ্ঞাসা করল।

বাইরে, মানে, বাড়িতে এ সময় তো কারো থাকার কথা নয়, তাই এখানে অপেক্ষা করছি।

তা বলে, এই রোদে? আসুন, আসুন।

রমলার পিছন পিছন শান্তনু ভিতরে ঢুকল।

আজ শান্তনু ধুতি পাঞ্জাবি পরেছে। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। মনে হয়, অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করছে, কারণ মুখ চোখ আরক্ত হয়ে উঠেছে।

বেতের চেয়ারে বসিয়ে রমলা পাখার সুইচ পুরোদমে খুলে দিল। বইয়ের গোছা রেখে আসবার সময় একটু হালকা প্রসাধন সেরে এল। তারপর শান্তনুর উল্‌টোদিকের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, আপনি অফিস যান নি?

না, অফিসে এখনও জয়েন করি নি। সামনের মাসের পয়লা তারিখ থেকে করবার কথা।

বাবা বলছিলেন আপনি কোথায় আলাদা একটা বাসা করেছেন!

বাসা? হ্যাঁ, ভবানীপুরে একটি ছোট বাড়ি নিয়েছি। খানদুয়েক ঘর। অবশ্য তাতেই আমার চলে যাবে। বাবা হয়তো মাঝে মাঝে এসে থাকবেন।

কথাটা রমলার মনে পড়ে গেল। অনেক কষ্টে হাসি চেপে বলল, আপনার বাবার অসুখ শুনেই তো হঠাৎ আপনি চলে গিয়েছিলেন।

শান্তনু চেয়ারটা ঘুরিয়ে একেবারে রমলার মুখোমুখি বসল, আপনার বাবার কাছে কিছু শোনেন নি আপনি? বাবার শরীর ভালই ছিল। চিঠি লিখেছিলেন গ্রামের অন্য একজন।

আপনার বাবার অসুখ, এই কথা লিখে? রমলা নিপুণ অভিনেত্রীর স্বরে বিস্ময়ের প্রলেপ মাখাল।

এ ছাড়া বোধ হয় তাঁর আর উপায় ছিল না। এ দেশে কন্যাদায় কি মারাত্মক সমস্যা আপনারা বুঝবেন না।

কেন, আমরা বুঝব না কেন?

কারণ আপনাদের যথেষ্ট আছে। সমাজের মুখে হাত চাপা দেওয়াব মতন পর্যাপ্ত অর্থ। আপনারা অনেকদিন অবিবাহিতা থাকলে যেমন কোন অসুবিধা নেই, তেমনি মনোমত পাত্র কেনবার মতন যথেষ্ট অর্থও আপনাদের আছে। কিন্তু এদেশে আপনাদের মতন ভাগ্যবানেব সংখ্যা খুব বেশী নয়। তারা ছল, বল, কৌশলের আশ্রয় নেয়।

কথাটা কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পাবছেন না? শুনুন তা হলে, ভদ্রলোকের একটি বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে। ভদ্রলোকের ধারণা আমি পাত্র হিসাবে ভাল, তাই বাবার কাছে কথাটা পেড়েছিলেন। বাবা বলেছিলেন, ছেলে যদি রাজী থাকে তা হলে আমার কোন আপত্তি নেই। ভদ্রলোকের কেমন সন্দেহ হয়েছিল, কথাটা সোজাসুজি আমাকে জানালে হয়তো আমি নাও যেতে পারি, তাই তিনি ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। পৃথিবীতে কতকগুলো permissible অপরাধ আছে, এটা তার একটি।

মেয়ে দেখলেন?

হ্যাঁ দেখলাম। স্টেশনে নেমে যখন শুনলাম বাবার কিছু হয় নি, তাঁর শরীর ভালই আছে, তখন ভদ্রলোককে বললাম, একেবাবে তাঁর মেয়েটিকে দেখে বাড়ি ফিরব।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রমলা কষ্টে হাসি চাপল। বলল, কেমন দেখলেন মেয়েটিকে ?

ভালই। বেশ ভাল। সঙ্গে সঙ্গে শান্তনু উত্তর দিল।

তা হলে শীঘ্র একটা নিমন্ত্রণ আমরা পাচ্ছি ?

নিমন্ত্রণ ? কিসের নিমন্ত্রণ ?

বা, বেশ ভাল দেখতে মেয়ে যখন, তখন শুভদিন দেখে কাজটা হয়ে যাক। আমরা সেজেগুজে গিয়ে লুচি মিষ্টি খেয়ে আসি।

শান্তনু গম্ভীর হয়ে গেল।

একটা মেয়ে ভাল দেখতে, তাকে আজীবন সঙ্গী করার পক্ষে এটাই কি একমাত্র গুণ ? আর কিছুর প্রয়োজন নেই ?

যেমন ? রমলার খুব ভাল লাগছে শান্তনুর সঙ্গে এমন কথা-কাটাকাটির খেলা খেলতে।

তার মেজাজ দেখতে হবে। শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা-ভব্যতা—

না, আপনার অদৃষ্টে দুঃখ আছে।

দুঃখ ? কেন ?

এমন মেয়ে এ দেশে পাবেন কোথায় ? আপনার উচিত ছিল জার্মানী থেকে বিয়ে করে আসা।

জার্মান মেয়ে ?

হ্যাঁ, রূপে, গুণে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, স্বাস্থ্যে অতুলনীয়া হত। ঠিক যেমনটি আপনি খুঁজছেন।

আপনি ভুল করছেন। জার্মান মেয়ের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে আমাদের শিক্ষাদীক্ষার মিল কোথায় ? রূপ গুণের মাপকাঠিও দু'জাতের এক নয়। সেই জন্যই দেখা যায় বিদেশী মেয়েদের সঙ্গিনী করলে জীবন সুখের হয় না।

জীবন সুখের হয় না ? আমার জানা কতকগুলো দম্পতি তো বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছেন।

খোঁজ নিয়ে দেখুন, তাঁদের একজনকে আত্মবিসর্জন দিতে

হয়েছে। আমিও দেখেছি অনেক বিদেশী মহিলা শাঁখা শাড়ি সিঁদুর পরে এদেশী সেজেছেন, কিংবা বাড়ির কর্তা হ্যাট, কোট, বুট পরে ওদেশী সাজার চেষ্টা করেছেন। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে দুজনের পক্ষে চলা সম্ভব হয় নি। যেখানেই তাঁরা নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য রাখতে গিয়েছেন, সেখানেই সংঘাত বেঁধেছে।

তর্ক করতে গিয়েই রমলা থেমে গেল। মনে পড়ে গেল জয়ন্তর মা বাপের কথা। তাদের জীবনের সংঘাতের কারণও কি এই? জয়ন্ত বলেছে তার মা ভারতবর্ষের মধ্যে বিক্ষুব্ধ আয়া-র্ল্যাণ্ডের ছবি দেখেছিলেন। পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধা বেদানা-জর্জর দুটি আত্মা। এক শাসকের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ। একই আগ্নেয় পথে তাদের অভিযাত্রা।

গাড়ির শব্দ হতেই রমলা উঠে বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়াল, তারপর শান্তনুর কাছে ফিরে এসে বলল, বাপী এসেছে।

বাপী? বিস্ময়ে শান্তনু দুটো চোখ বিস্ফারিত করিল।

মানে, বাবাকে আমি বাপী বলি।

অপ্রস্তুত কণ্ঠে কথাগুলো বলেই রমলা ছুটে চলে গেল।

রাজীব রায় কোর্টের পোশাক ছেড়ে শান্তনুর কাছে এসে দাঁড়ালেন, কতক্ষণ এসেছ?

শান্তনু দাঁড়িয়ে উঠে রাজীব রায়ের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে বলল, অনেকক্ষণ এসেছি। একটু বোধ হয় আগেই এসে পড়েছি।

আগে আর কি, তোমার যখন ইচ্ছা এখানে আসতে পার। তুমি নীরদের ছেলে, তোমার সঙ্গে কোন ফর্মালিটি নেই। নীরদ আর আমি কি রকম বন্ধু ছিলাম, বাবার কাছে শুনেছ তো। তোমাকে তো বললাম, তুমি অনায়াসেই এখানে চলে আসতে পার। বাড়তি ঘর যখন রয়েছে, কোন অসুবিধা হবে না।

একটু দূরেই রমলা দাঁড়িয়েছিল। বিকেলের চা জলখাবার সে

বাপীর সঙ্গেই খায়। শান্তনু কি খাবে, সেটা জিজ্ঞাসা করতে সে অপেক্ষা করছিল।

রাজীব রায়ের কথা শেষ হতেই সে এগিয়ে এসে বলল, বাপী!

কিরে?

উনি তো চা খান না। ওঁর জন্য দুধ আনতে বলি, না শরবত?

রাজীব রায় শান্তনুর দিকে চোখ ফেরাতেই শান্তনু বলে উঠল, দুধ নয়, আমার জন্য বরং শরবতই আনতে বলুন। আসার সময় আমি দুধ খেয়ে বেরিয়েছি।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার মুখেই রমলার, সঙ্গে বিনুর মার দেখা হয়ে গেল। শোন, শান্তনুবাবুর জন্য চা নয়, জলখাবার আর শরবত পাঠিয়ে দাও।

বিনুর মা চোখ মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে হাসল, এসেছেন? আসতেই হবে। ফুল ফুটলে ভোমরা ভনভন করবেই।

বিনুর মার কথায় রমলার আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। বিনুর মার কাছেই শোনা। রমলার বাবা আর শান্তনুর বাবা দুজনে বুঝি ঠিক করেছিলেন শান্তনু আর রমলার জীবন একসূত্রে বাঁধবেন। তাই যদি হয়, তা হলে শান্তনুর বাবা এভাবে অন্য মেয়ে দেখতে দিচ্ছেন কেন শান্তনুকে, রমলার বাবাই বা কোন কথা পাড়ছেন না কেন?

অবশ্য শান্তনুকে মন থেকে গ্রহণ করার কোন ইচ্ছা নেই রমলার। জয়ন্ত ছাড়া তার জীবনে আর কারও স্থান নেই। তবুও বিনুর মার কথাগুলোর সত্যতা যাচাই করতে চায় রমলা। এমন একটা কথা বিনুর মা বলবার সাহসই বা পেল কোথা থেকে!

রমলা আর কথা বাড়াল না। আবার ফিরে এল বারান্দায়। তখন শান্তনু একমনে রাজীব রায়কে নিজের চাকরির কথা বলছে।

হেড অফিস কলকাতায়, কিন্তু মাঝে মাঝে শান্তনুকে বাইরে যেতে হবে। ভারতের নানা জায়গায় কোম্পানির কাজ হচ্ছে। সেতু-নির্মাণ, হাইড্রলিক পাওয়ারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা, বয়লার আর ইকনমাইজার স্থাপন।

রমলা কোণের চেয়ারে চুপচাপ বসল। দুটো হাত কোলের ওপর রেখে।

শান্তনুর কথা শুনে মনে হল জয়ন্ত ভুল করেছে। আজকাল আর্টস পড়ে বিশেষ লাভ নেই। বেশী পথ খোলা থাকে না। হয় প্রফেসারী, নয় আইন। প্রফেসারীতে আর কি এমন পয়সা। আর ব্যারিস্টারী যথেষ্ট শ্রমসাধ্য জীবিকা। জয়ন্তর মতন চঞ্চল, পরিশ্রমবিমুখ ছেলের পক্ষে এ লাইনে উন্নতি করা বেশ কষ্টকর।

অথচ জীবনে জয়ন্ত প্রতিষ্ঠিত না হতে পারলে কি অবস্থা হবে রমলার। শুধু ভালবাসা দিয়ে মনের মানুষকে আঁকড়ে রাখা যায় না। প্রেমের সৌধের প্রতিটি ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে অর্থের পলেস্তারার প্রয়োজন। তা না হলেই অভাব অভিযোগের ঝাপটায় সৌধ ভেঙে মাটিতে গুঁড়িয়ে পড়বে।

শরবত, জলখাবার এল। পরিবেশন করল রমলা।

সন্ধ্যা হতেই রাজীব রায় উঠে পড়লেন। সেসন কোর্টে তাঁর একটা কেস চলছে। মক্কেলরা আসবার আগে কাগজপত্রগুলো একবার ভাল করে দেখে নেওয়া দরকার।

বারান্দায় রমলা আর শান্তনু বসে রইল।

আপনি পড়তে যাবেন না? অন্ধকারে শান্তনুর গলাটা বেশ ভারী শোনাল।

আপনি এভাবে একলা বসে থাকবেন?

আমার কোন অসুবিধা হবে না। আপনি বরং পড়তে যান। কেবল যদি অসুবিধা না হয়, আমার ঘরে একটা আসন পেতে দিয়ে যান।

আপনি রোজ সন্ধ্যায় পূজা করেন বুঝি?

পূজা আর কি। মা বাপের চরণবন্দনা করি। তাঁদের পাদপদ্ম ধ্যান করি। এতে তাঁদের কিছু হয় না, কিন্তু আমি চিত্তে শান্তি পাই।

রমলা কিছু বলল না। উঠে পাশের ঘরে গিয়ে একটা হরিণের চামড়ার আসন মেঝেতে পেতে দিল, তারপর শান্তনুর কাছে গিয়ে বলল, আপনার আসন দেওয়া হয়েছে।

শান্তনু উঠতে রমলা পিছন পিছন এসে বলল, আপনি কি ফটোগুলো সব সময়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখেন?

চলতে চলতে শান্তনু থমকে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে রমলাকে দেখল। বোধ হয় তার প্রশ্নের অর্থ খুঁজল, তারপর খুব আস্তে বলল, না, ফটো সব সময় সঙ্গে রাখার প্রয়োজন হয় না, আর তা সম্ভবও নয়। আমি চোখ বুজলেই তাঁদের দেখতে পাই।

কথাটা রমলা বলতে চায় নি, কিন্তু আচমকা তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আমিও আমার মাকে খুব অল্প বয়সে হারিয়েছি।

মন সংযত করে তাঁর কথা ভাববার চেষ্টা করবেন, শান্তি পাবেন। অবশ্য আপনাদের কাছে এ শান্তির দাম কতটুকু জানি না।

কেন, এ কথা বলছেন কেন?

যে শান্ত জীবনযাত্রা ধ্যানের অনুপন্থী সে জীবন আপনাদের নয়।

কথাটা রমলা ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু দু'চোখের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ান, তা হলেই আমার কথাটা বুঝতে পারবেন। যে উগ্র জীবনযাত্রার চিহ্ন আপনার চোখের কাজলে, গালের রুজে, ঠোঁটের লালিমায়, সেগুলো নিঃশেষে না মুছলে চিত্তকে অন্তর্মুখী করা যায় না।

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই শান্তনু ঘরের মধ্যে ঢুকে আসনের ওপর গিয়ে বসল।

মাথা নীচু করে রমলা পড়ার ঘরে এসে বসল। সামনে খোলা বইয়ের পাতা বাতাসে উড়ছে। রমলার মন নেই। বইয়ের একটি অক্ষরও মাথায় ঢুকল না। হুটো চোখ জ্বালা করছে। সারা দুপুর প্রখর রোদে ঘুবে ঘুবে বেড়ালে সারা মুখ যেমন আরক্ত হয়ে ওঠে, তেমনি হয়েছে অবস্থা।

এমন একটা কথা শান্তনু বলবে এটা রমলা আশাই করে নি। সাধারণ একটা লোক বললে রমলা গায়েই মাখত না। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত আধুনিক এক ভদ্রলোকের মুখে এ ধরনের কথা আশাই করা যায় না।

জোর কবে রমলা পড়ায় মন বসাল। কিন্তু অল্পক্ষণ। বই সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দরজায় খিল দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শোবার ঘরেই রমলা পড়াশোনা করে। চেয়ারে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, বালিশ বুকে চেপে বিছানায় শুয়ে পড়ে। এ তার বহুদিনের অভ্যাস।

আয়নার সামনে বসে রমলা নিজেকে নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক, গালে রুজ। এ ছাড়াও প্রসাধন রয়েছে। পাউডারের প্রলেপ। চুলে শ্যাম্পু। শিফন শাড়ির ফাঁকে মূল্যবান অন্তর্বাস। সমস্ত শরীর ঘিরে নিজেকে সাজাবার প্রচেষ্টা প্রকট।

কিন্তু ভালই তো দেখাচ্ছে। রমলা সুন্দরী। পথে-ঘাটে পরিচিত অপরিচিত লোকের চোখের দৃষ্টিতে এ পরিচয় সে পেয়েছে। সহপাঠীদের মুগ্ধ কটাক্ষ তো আছেই।

ভুল করেছে শান্তনু। এ যুগটা তার মত মানুষের রুচি-নির্ভর নয়। তার বিপরীত দিকে চাকা ঘোরানোর এ চেষ্টা অর্থহীন।

উঠে দাঁড়িয়ে বুকের আঁচল ঠিক করে নিয়ে রমলা দরজার কাছে এগিয়ে এল। দরজা খুলেই দেখতে পেল শান্তনু বেরিয়ে যাচ্ছে সামনে দিয়ে।

রমলা একবার ভাবল ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু প্রবৃত্তি হল না। এখনই হয়তো আধুনিক যুগের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে একটানা বক্তৃতা দেবে।

রমলা ফিরে এসে পড়ার টেবিলে বসল। ইতিহাসের পাতা খুলে ট্যুডর ডেসপটিজ্‌ম-এর অধ্যায়ে মন দিল।

কিন্তু না, অসম্ভব। কয়েক লাইন পড়ার পরেই মন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কালো কালো অক্ষরের ফাঁকে একটা মানুষের দৃঢ় বাচনভঙ্গী ভেসে এল, সুগৌর বর্ণ, প্রজ্বলিত দুটি চোখ।

হবে না। এ মানুষটা বাড়ি থেকে না বেরোলে কোন কিছুতে রমলার মন বসবে না। বইটা বুকের সামনে তুলে ধরে রমলা ঝুঁকে পড়ল। একবার ভাবল, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ছোট ছেলেমেয়ের মতন পড়বে, কিন্তু লজ্জা করল। পারল না। কি জানি, শান্তনুর কানে গেলে সে কি ভাববে।

বই রেখে রমলা উঠে পড়ল। পাশের ঘরে ঢুকে আসনটা তুলে রাখল। বাইরে বেরিয়ে দেখল কাপ ডিশগুলো তখনও টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে।

রমলা চেঁচিয়ে বেয়ারাকে ডাকল।

বেয়ারা এসে কাপ ডিশগুলো নিয়ে যেতে রমলা আবার পড়ার ঘরে ঢুকতে গেল, কিন্তু ঢোকা আর হল না।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হতে রমলা ঘুরে দাঁড়াল।

রাজীব রায় ওপরে উঠছেন।

রমলা ছুটে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তুমি এত তাড়াতাড়ি উঠে এলে বাপী? মক্কেলরা ছাড়ল?

রাজীব রায় হেসে রমলার পিঠে একটা হাত রাখলেন, শান্তনুকে

খেতে বলেছি তাই একটু তাড়াতাড়ি চলে এলাম। মক্কেলদের কাল ভোরে আসতে বলেছি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে রাজীব রায় এগিয়ে চললেন। বারান্দায় খালি চেয়ারের দিকে নজর পড়তেই রমলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শান্তনু কোথায় গেল? তাকে কি তোর ঘরে বসিয়েছিস?

না বাপী। তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বেরিয়ে গেল? কোথায়?

কি জানি তা তো কিছু বলে যান নি। আমার পড়াশোনার ক্ষতি যাতে না হয়, সেইজন্য আমাকে পড়তে বলে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু কোথায়? রাজীব রায় কপালের মাঝখানে আঁচড় ফেললেন।

বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও গেছেন। এখনই আসবেন।

কোন কথা না বলে রাজীব রায় বারান্দায় পাতা একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। রমলা বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

শান্তনুকে তোর কেমন লাগে রে রমি?

রমলা মাথা হেঁট করে বেতের চেয়ারে আঙুল বোলাতে লাগল। মাথাও তুলল না, কথাও বলল না।

রাজীব রায় আবার প্রশ্ন করলেন, কিরে, চুপ করে আছিস কেন?

খুব মৃদুকণ্ঠে রমলা বলল, বড্ড মাস্টারমশাই মাস্টারমশাই মনে হয় বাপী।

রাজীব রায় হেসে উঠলেন, কেন রে?

হ্যাঁ বাপী, কেবল উপদেশ আর উপদেশ। হালকা কথা ভদ্র-লোক বলেনই না।

হালকা কথা হালকা লোকেরাই বলে রমি।

বা, তা বলে কেবল জ্ঞানের কথা?

কি ব্যাপার বল তো? তোর কিসে মেজাজ খারাপ হল? পড়তে বলেছে বলে বুঝি?

তাই বা বলবে কেন বাপী? আমাদের সঙ্গে পরিচয় এমন কিছু বেশী দিনের নয়। এই কটা দিনের আলাপে পড়াশোনা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াটা কি উচিত?

রাজীব রায় হেসে কি একটা বলতে গিয়েই থেমে গেলেন। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। শান্তনুই বুঝি ফিরে আসছে।

ঠিকই তাই। সিঁড়ি দিয়ে শান্তনু উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

একি, কোথায় পালিয়েছিলে শান্তনু?

আজ্ঞে পালাই নি তো। মোড়ের পার্কে গিয়ে একটু বসেছিলাম।

মোড়ের পার্কে, কেন?

এমনই। কোন কারণ নেই। দেখলাম আপনি মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত। রমলা দেবীরও পড়াশোনা করা দরকার, তাই ভাবলাম একটু বেরিয়ে যাই, ঠিক সময়ে ফিরে আসব।

বেশ মনে আছে রমলার। সে রাত্রে নামটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রমলার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। লজ্জার ভারে আনত দুটি চোখের পাতা। চেয়ারের একটা হাতল ধরে রমলা টাল সামলেছিল।

কেন এমন হল! কেন এমন হয়! পুরুষের কণ্ঠে ওর নাম উচ্চারণ এই প্রথম নয়। জয়ন্ত বহুবার ডেকেছে। আবেগতরল কণ্ঠে। অসূর্যম্পশ্যা নয় রমলা। কলেজের বহু সহপাঠীর সঙ্গে মিশেছে। হয়তো অন্তরঙ্গভাবে নয়, কিন্তু তার নাম ধরে তারা বহুবার ডেকেছে।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে শান্তনু বসে পড়ল। রমলা বসল একেবারে কোণের দিকে।

আর দেরি করে লাভ কি? রাজীব রায় রমলার দিকে ফিরল, শান্তনুকে আবার অনেকটা পথ ফিরতে হবে।

রমলা উঠে দাঁড়াল। যাবার মুখে শান্তনুর দিকে ফিরে বলল, আপনার জন্য সব নিরামিষ করা হয়েছে কিন্তু।

ঠিক আছে। মাছ মাংস আমি খাই না।

রমলা চলে গেল।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে শান্তনুর যাবার মুখে রাজীব রায় বললেন, তুমি বরং গাড়িটা নিয়ে যাও শান্তনু। তুলসীকে বলে দিচ্ছি তোমায় রেখে আসবে।

শান্তনু রাজী হয় নি। বলেছে, এমন কিছু রাত হয় নি। ট্রাম বাস দুইই পাব। চলি।

হেঁট হয়ে রাজীব রায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে শান্তনু দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। রমলা বাপের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু যাবার সময় শান্তনু বিদায় নেওয়া দূরে থাক একটি কথাও বলল না।

অনুভবে রমলা বুঝতে পারল সারা মুখ আতপ্ত হয়ে উঠেছে। দুটি চোখে আবার সেই জ্বালা।

একবার চোখ তুলে দেখবার যোগ্যও কি রমলা নয়! এত তেজ, এত অবহেলা! এমন নয় যে শান্তনু কাছে এগিয়ে এলেই রমলা ধরা দেবে। তার মন অন্যত্র বাঁধা। জয়ন্ত ছাড়া আর কারো সান্নিধ্য সে কামনা করে না। কিন্তু তবু কোন্ তরুণী চায় যে কোন যুবক তার প্রতি আকৃষ্ট না হোক। রমলা এগোবে না। জ্বলন্ত শিখার মতন তার রূপ, তার দেহ আমন্ত্রণ জানাবে। ছুটে আসবে পতঙ্গকুল। সব কিছু বিস্মৃত হয়ে লেলিহান শিখায় আত্মাহুতি দেবে। পাখা বাঁচিয়ে শান্তনু এড়িয়ে যাবে শিখার আকর্ষণ, এটাই রমলার পক্ষে সবচেয়ে ক্ষোভের।

শান্তনু গেট পার হয়ে যেতে রাজীব রায় পথের দিকে চেয়ে

অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, অদ্ভুত ছেলে। এ যুগে এমন ছেলে দেখা যায় না রমি।

রমলাও পথের দিকে চেয়ে ছিল। রাজীব রায়ের কথায় বাপের দিকে চেয়ে বলল, বন্ধুপুত্রের ওপর তোমার একটা প্রচ্ছন্ন-দুর্বলতা আছে বাপী।

হয়তো আছে, কিন্তু তবু বলছি রমি ঠিক এ ধরনের ছেলে বেশী দেখা যায় না।

দেখা যে যায় না সেটা সমাজের পক্ষে হিতকর, বাপী।

হিতকর?

তা নয় তো কি। শুধু কিছু লেখাপড়া, সুদর্শন চেহারা এটুকু মূলধন করে সবাই যদি সমাজে প্রবেশ করার অবাধ অধিকার পায়, তা হলে সমাজের মর্যাদার খুব বেশী কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

তুই কি বলতে চাস বল তো? রাজীব রায় মেয়ের খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। সস্নেহে হাত বোলাতে লাগলেন রমলার চুলে।

আমি পর্দার অন্তরালে মানুষ হই নি বাপী। ছেলেদের কলেজে পড়ি। তাদের সঙ্গে মেলামেশাও করি। শিক্ষিত ছেলেদের ব্যবহার মেয়েদের প্রতি কেমন হয়, কেমন হওয়া উচিত, তা আমার জানা। শান্তনুবাবু মনে করেন আমি একজন খুকী। আমার সঙ্গে তিনি সেই রকম আচরণই করেন। আমাকে পড়ার উপদেশ দেন, যাবার সময় একটা কথা পর্যন্ত বলা প্রয়োজন মনে করেন না।

শেষদিকে রমলার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল।

রাজীব রায় চীৎকার করে হেসে উঠলেন। রমলাকে খুব কাছে টেনে নিয়ে বললেন, এবার তোমার অভিমানের কারণটা বুঝতে পেরেছি রমি। ঠিক আছে, এবার শান্তনু এলে, তাকে

আমি এ বিষয়ে অবহিত করে দেব। বলব থার্ড ইয়ারের একটি ভদ্রমহিলা তোমার কাছ থেকে যথাযোগ্য সম্মান প্রত্যাশা করে।

তারপর অনেকদিন শান্তনু বাড়িতে আসে নি। তার কোন খোঁজই রাখে নি রমলা। খোঁজ রাখার ইচ্ছাও হয় নি।

জয়ন্তর সঙ্গে মেলামেশাও কমিয়ে দিয়েছে। আর কোন কারণ নয়। পরীক্ষা সামনে। রমলাই তাকে বলেছে। যেমন করে হোক পাস করতেই হবে। বি. এ পাস করার পরে বি. এল. পড়তে হবে। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তবে তো সুখী হবে ভবিষ্যৎ জীবন। নয়তো অভাবের সংসারে যেই পাশে এসে দাঁড়াবে তাকেই বিস্বাদ ঠেকবে।

জয়ন্ত স্বীকার করেছে। পরীক্ষায় পাস তাকে করতেই হবে। নিজের সংসারের যে চেহারা দেখেছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। এ সংসারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে তার বিনাশ সুনিশ্চিত। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এ সংসার থেকে সরে যেতেই হবে তাকে। শক্ত খুঁটি দিয়ে নিজের আস্তানা তৈরি করতে হবে। ভাল করে তার চাল ছাইতে হবে। রোদে তাপ না আসে। বর্ষায় জল। গৃহ ঠিক হলে তবে ডাকতে পারবে অর্ধাঙ্গিনীকে।

এসব কথা জয়ন্তই বলেছে রমলাকে। গঙ্গার কুলে পাশাপাশি বসে।

তা ছাড়া নিজেরও পড়াশোনা রয়েছে। প্রফেসর বসাককে কয়েক মাসের জন্য বাড়িতে রাখা হয়েছে। ইংরাজী আর ফিলসফি পড়ান। কড়া লোক। রমলাকে ঠিক সময় হাজিরা দিতে হয়।

কিন্তু তবু দেখা হয়ে গেল। এক বান্ধবীর জন্মদিন। রমলা নিউ মার্কেটে উপহারের জিনিস কিনে বাইরে আসতেই চোখ পড়ে গেল। সামনের বইয়ের দোকানে শান্তনু। নিবিষ্টমনে বই

বাচ্ছে। প্রথমে রমলা ভাবল এগিয়ে গিয়ে দেখা করার দরকার কি। পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। কিন্তু পারল না। রাস্তা পার হতে হতেই দেখতে পেল শান্তনু তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

রমলা হাসল। নিছক ভদ্রতার হাসি। কেতাদুরস্ত।

তাতেই শান্তনু উৎসাহিত হয়ে উঠল। ফুটপাতের কাছ-বরাবর এসে বলল, এদিকে কোথায় এসেছিলেন? মার্কেটিংয়ে বুঝি?

হ্যাঁ, একটি বান্ধবীর জন্মদিন কাল, তাই কিছু কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

'বান্ধবী' কথাটার ওপর রমলা খুব জোর দিল।

ও। আরও এগিয়ে এল শান্তনু। ইতিমধ্যে রমলাও ফুটপাথে এসে উঠেছে।

আপনার বাবা কেমন আছেন?

ভাল। আপনি তো বহুদিন যান নি আমাদের বাড়ি।

হ্যাঁ, অফিসের কাজে বড্ড ব্যস্ত রয়েছি। যাব একদিন। আপনি চললেন নাকি?

খুব কষ্টে রমলা হাসি সামলাল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। পরীক্ষা সামনে, তা ছাড়া প্রফেসর বসে থাকবেন।

মুহূর্তে শান্তনুর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। ম্লান, নিস্তেজ কণ্ঠে বলল, ও, আপনার পরীক্ষা সামনে?

হুঁ, চলি, নমস্কার।

রমলা চলন্ত একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ল। খানিকটা গিয়ে পিছন ফিরে দেখল শান্তনু একভাবে এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়ি ফিরে রমলা নিজের মনে অনেকক্ষণ ধরে হাসল। রাজীব রায় বারান্দায় পায়চারি করছিলেন, মেয়ের হাসির শব্দ

শুনে ঘরে উঁকি দিয়ে বললেন, কি ব্যাপার, এত হাসি কিসের রে ?

রমলা বই তুলে নিজেকে আড়াল দিল। যে কথা মনে পড়ায় সে হাসছে সে কথাটা বাবাকে বলা সমীচীন হবে কি না, সেটাও ভাবল। হাসিটা কমলে বলল, আজ শান্তনুবাবুর সঙ্গে দেখা হল বাপী।

কোথায় ?

নিউ মার্কেটের সামনে একটা বইয়ের দোকানে।

তোকে দেখতে পেয়েছিল ?

হ্যাঁ, এগিয়ে এসে কথা বললেন।

রাজীব রায় ঠোঁট মুচকে হেসে বললেন, তোকে যথোচিত সম্মান দেখিয়েছে তো ?

রমলা লজ্জা পেল। মাথা নীচু করে বলল, কি যে বল বাপী তার ঠিক নেই।

একদিন আসতে বললি না কেন ?

বলেছিলাম বাপী। বললেন, অফিসের কাজে খুব ব্যস্ত রয়েছেন, পরে একদিন আসবেন। আমিও বললাম, আমার পরীক্ষা সামনে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।

প্রফেসর বসাক এসে পড়ায় কথাবার্তা আর এগোল না। রাজীব রায় নীচে নেমে গেলেন। রমলা বই খুলে বসল।

খাওয়াদাওয়ার পরে বিছানায় শুয়ে সে রাতে অনেকক্ষণ রমলা এপাশ-ওপাশ করল। ঘুম এল না।

শান্তনু ধুতি পাঞ্জাবি পরেছিল। আগের মত অতটা যেন জবুথবু নয়। আজ তো বেশ সপ্রতিভভাবেই কথা বলল। বলা যায় না, যদি ময়দানে গিয়ে বসবার প্রস্তাব করত রমলা, তাতেও বোধ হয় রাজী হয়ে যেত। সেদিনের সে স্বাতন্ত্র্য-বোধটুকু বেশ শিথিল। রমলাকে অবহেলা করার চোখ-দুটো তার প্রতি কৌতূহলে উজ্জ্বল মনে হল।

এইটুকুই রমলা চেয়েছিল। এইটুকুর জন্যই তার অভিমান ছিল। নেহাত পাশ কাটিয়ে যাবার মতন মেয়ে যে সে নয়, এটুকু অন্ততঃ স্বীকৃত হোক। শুধু শান্তনু কেন, প্রৌঢ় প্রফেসর বসাকও যে মাঝে মাঝে বেসামাল হয়ে পড়েন, সেটুকু রমলার দৃষ্টি এড়ায় নি।

কি হল কি আপনার? থালি উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি নিন।

চীৎকারে রমলার চমক ভাঙল। কখন খাবার রেখে গেছে সামনে। রমলা খেয়াল করে নি।

সানকিতে ভাত, কলাইকরা মগে ডাল, ভাতের পাশে কি একটা তরকারিও রয়েছে। পাশে লোটায় জল।

কাল সকালে রমলা খায় নি। বিকেলে শুধু একটুকরো রুটি। সেইজন্য সকাল থেকে শরীরটা দুর্বল লাগছে। মাথাটাও একটু ঘুরছে।

এই শরীর। কত তরিবত, কত যত্ন করে গড়ে তোলা হয়েছে। সামান্য মাথা ধরলে স্মেলিং সল্টের শিশি এসেছে, সারিডনের বড়ি। একটু জ্বর হলে মাঝারি পসারের ডাক্তার এসে বসেছে বিছানার পাশে। বাড়ির সবাই শুকনো মুখে ঘোরাফেরা করেছে। রাজীব রায় তো প্রায় আহারনিদ্রা ত্যাগ করেছেন।

সেই শরীরকে যতটা সম্ভব অযত্ন করে চলেছে রমলা। শরীর এখন একটা বোঝা। ক্লান্ত পথের শেষে এ বোঝা যেন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। পথের পাশে ফেলে দিতে পারলেই যেন রমলা বাঁচে।

শরীর মনের আধার। মন যদি বিগ্রহ, শরীর মন্দির।

সেদিনের সে মন আর নেই রমলার। এখন পূতিগন্ধময় আবিল এক চেতনাপ্রবাহ বহন করে চলেছে। ভগবান শয়তানে

রূপান্তরিত, তাই মন্দিরেও জরা নেমেছে। হাজার ফাটলে ভরে গেছে দেহ। জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে গেছে। ইটের ফাঁকে ফাঁকে মাথা তুলেছে বট অশথের চারা। জীর্ণ বিগ্রহহীন মন্দিরের কোন মূল্য নেই ভক্তের কাছে। তাই এ দেহ পরিত্যাগ করতে পারলেই রমলার মুক্তি।

তারপর? যে তারপরের কথা বুঝি কেউ জানে না, তার কথা ভেবে রমলা শিউরে উঠল।

অন্তহীন, নিরন্ধ্র অন্ধকার। কালহীন, সীমাহীন কালো তরঙ্গের প্রসার। চৈতন্যের চির অবলুপ্তি।

এ জীবনের পরেও কি জীবন থাকে? মৃত্যুর পরে আর এক জন্মলগ্ন? বাসাংসি জীর্ণানি। হিন্দু দর্শনমতে মৃত্যু শুধু বেশ পরিবর্তন। সাময়িক একটু অন্ধকার, তারপর আবার জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনে গাঁথা আর এক বিষণ্ণ কাহিনী। তাই. কি। আবার কোথাও রমলা জন্মাবে। বাংলাদেশের মেয়ে হয়ে অভিশপ্ত জীবনের খেলা নতুন করে শুরু। আর রমলা ভুল করবে না। পূর্বজীবনের চেতনার কণামাত্রও যদি অবশিষ্ট থাকে তো সাবধান হবে। মেপে মেপে পা ফেলবে। সব দিক বজায় রেখে।

রমলা সানকিটা নিজের দিকে টেনে নিল।

তার পরেও শান্তনুর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

একদিনের কথা রমলা জীবনে ভুলবে না। ভুলতে পারে না।

থিয়েটার দেখে হল থেকে রমলা বের হচ্ছিল। পাশে জয়ন্ত। প্রচুর ভিড়। কোনরকমে লোক কাটিয়ে কাটিয়ে দুজনে এগোচ্ছিল। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে রমলা মুখ মুছতে গিয়েই চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল।

রাস্তার ধারেই শান্তনু। থিয়েটার হল থেকে বেরিয়ে অপেক্ষা করছে।

শান্তনুর পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। আগের মতই ছোট করে ছাঁটা চুল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ দিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। রমলার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে এগিয়ে এল।

একি আপনি থিয়েটার দেখতে এসেছিলেন? রমলার কণ্ঠে ব্যঙ্গের রেশ।

একটু বুঝি অপ্রস্তুত হল শান্তনু। আড়চোখে এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, কথাটা আর কারও কানে গেছে কি না, তারপর বলল, কেন, অন্যায় করেছি?

না, অন্যায় না। তবে আমার ধারণা ছিল, আপনার মতন নীতিবাদী লোকেরা থিয়েটার সিনেমা দেখাকে সময়ের অপব্যয় বলে মনে করে।

না, না, তা কেন, শান্তনু ঘাড় নাড়ল, A nation is known by its stage. একটা জাতের সভ্যতার মানদণ্ড তার মঞ্চ। মানুষের আর যুগের রুচি আর নীতির প্রতিফলন হয় এইখানে। একে অবজ্ঞা করব, এমন মূঢ় আমি নই।

কথা বলতে বলতেই শান্তনুর চোখ পড়ল জয়ন্তর দিকে। ভিড়ের চাপে জয়ন্ত একটু পিছিয়ে গিয়েছিল, এতক্ষণ পরে সে রমলার পাশে এসে দাঁড়াল।

রমলা শান্তনুর জিজ্ঞাসুদৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারল। জয়ন্তর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, আমাদের কলেজের জয়ন্ত ঘোষাল। এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। আর এঁর কথা তো তোমায় বলেছি জয়ন্ত। ইনি শান্তনুবাবু, আমার বাবার এক বন্ধুর ছেলে।

জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে করমর্দন করতে গিয়ে কি ভেবে হাত গুটিয়ে নমস্কার করল। রমলার দিকে ফিরে বলল, ইনিই জার্মানী থেকে ফিরেছেন ইঞ্জিনীয়ার হয়ে?

কথার শেষে জয়ন্ত যেন একটু কষ্টে হাসি চাপল। বোধ হয়

শান্তনুর সম্বন্ধে রমলা যা বলেছিল, সেই কথাগুলো তার মনে পড়ে গেল।

শান্তনু সম্ভবতঃ এসব লক্ষ্য করে নি, কিন্তু তার দৃষ্টির ভাবান্তর রমলার চোখ এড়াল না। এটুকু সে বুঝতে পারল, এভাবে জয়ন্তর সঙ্গে একলা রমলার এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানোটা হয়তো তার খুব মনঃপূত নয়। সেই ইটার্নাল জেলাসী। আদিম যুগ থেকে পুরুষকে যা উন্মত্ত করেছে, উত্তেজিতও। তাকে নতুন কিছু গড়ার প্রেরণা দিয়েছে, পুরানো সব কিছু ভাঙবার স্পর্ধা।

শান্তনু নিজেকে সামলে নিল। রমলার দিকে চেয়ে বলল, আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে কি?

না, গাড়ি আনি নি। পথ থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে নেব।

যদি আপত্তি না থাকে, আমার গাড়িতে আসতে পারেন। আপনাদের নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে শান্তনু ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল। একটু দূরেই ছাইরঙা একটা রোভার।

শান্তনুর অঙ্গুলিনির্দেশে মোটর এদিকে এসে দাঁড়াল।

শান্তনু নীচু হয়ে দরজা খুলে দিল। প্রথমে রমলা, তারপর জয়ন্ত পিছনের সীটে গিয়ে বসল। শান্তনু বসল ড্রাইভারের। পাশে।

মোটর চলতে রমলাই প্রথম কথা বলল, এ কি আপনার অফিসের গাড়ি?

শান্তনু ভ্রূ কোঁচকাল। মুখে সামান্য অপ্রসন্নতার রেশ। একটু কঠিন গলায় বলল, অফিসের গাড়ি নিয়ে ছুটির দিন থিয়েটারে আসতাম না। এটা আমি কিনেছি।

তারপর গলাটা একটু মোলায়েম করে বলল, অবশ্য কিনেছি, অফিস থেকে টাকা ধার করে। মাসে মাসে মাইনে থেকে কেটে নিচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কেউ কোন কথা বলল না। চৌরঙ্গীর কাছবরাবর এসে শান্তনু ঘাড় ফেরাল, আপনাকে কি বাড়িতে নামিয়ে দেব?

কথাটা শান্তনু রমলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কিন্তু উত্তর দিল জয়ন্ত, অনুগ্রহ করে আমাকে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে নামিয়ে দেবেন। আমি একটু ওষুধের দোকানে যাব।

ওষুধের দোকানে? রমলার সকৌতূহল প্রশ্ন।

হ্যাঁ, বাবার শরীরটা খুব ভাল যাচ্ছে না। ডাক্তার একটা প্রেসক্রপশন দিয়েছেন। যাবার সময় দোকানে দিয়ে গিয়েছিলাম. এখন নিয়ে যাব।

শান্তনু কোন কথা বলল না। শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল জয়ন্তর মুখের ওপর। সে দৃষ্টি বাক্যের চেয়েও বাঙ্ময়।

এবার রমলার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, আপনি?

আমি বাড়ি যাব। রমলা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে মোটর থামল। জয়ন্ত নেমে গেল। ড্রাইভার গাড়ির দরজা বন্ধ করে স্টার্ট দিল, আবার ছুটে চলল রোভার।

কিছুতেই কিন্তু কথাটা রমলা বলতে পারল না। ভেবেছিল, জয়ন্ত নেমে গেলে শান্তনুকে ভিতরে এসে বসতে বলবে। সাধারণ ভদ্রতা, কিন্তু পারল না। মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণও করেছিল, কিন্তু বলতে পারল না। অকারণ একটা সংকোচ, অহেতুক একটা বাধা।

রমলা চেয়ে চেয়ে শান্তনুকে দেখল। জার্মানী যা পারে নি, কলকাতা তা পেরেছে। শান্তনুকে অনেক মার্জিত, অনেক কেতাদুরস্ত করে তুলেছে। পোশাক-পরিচ্ছদে অনেক শৌখিন।

মনে হল শান্তনুও যেন কি একটা ভাবছে। একটা হাত থুতনিতে রেখে চুপচাপ বসে আছে। প্রস্তরমূর্তির মতন।

আচমকা মোটর থেমে গেল। আর একটু হলে রমলা ছিটকে শান্তনুর গায়ের ওপর গিয়ে পড়ত। স্ট্র্যাপটা ধরে সামলে নিল।

সামনে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। একটা ঠেলাগাড়ির চাকা খুলে সব জিনিস রাস্তার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। পিছনের সব গাড়ি বন্ধ।

এই সুযোগে রমলা সাহস করে কথাটা বলে ফেলল।

শান্তনুবাবু, আপনি ভিতরে এসে বসুন না।

শান্তনু বুঝি এই অনুরোধটুকুর প্রত্যাশাতেই ছিল। রমলার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে ভিতরে এসে বসল।

রমলা নিজের মনকে বোঝাল। এ তো নিছক ভদ্রতা। এতে শান্তনুর নিশ্চয় কিছু মনে করা উচিত নয়। তার গাড়ি, সে এভাবে ড্রাইভারের পাশে বসে যাবে, পিছনে জায়গা থাকা সত্ত্বেও, এটা দৃষ্টিকটু। কাজেই রমলা পাশে বসতে বলে এমন কিছু অন্যায় করে নি।

শান্তনু পাশে বসল বটে, কিন্তু যথেষ্ট ব্যবধান রেখে। নিজেকে গুটিয়ে প্রায় জানলার কাছে নিয়ে গেল।

একটু পরে মোটর চলল। রমলা আড়চোখে শান্তনুর দিকে চেয়ে দেখল। না, অন্য যে কোন ভদ্রলোক পাশে বসলে যা করত, শান্তনু তা করছে না। একভাবে চেয়ে রয়েছে সামনের দিকে। শাড়ির খসখসানি বা চুড়ির কিংকিণী তাকে একটু বিচলিত করছে না।

রমলাই কথা বলল, আপনার বাবা ভাল আছেন?

শান্তনু বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিল, চমকে উঠে বলল, কিছু বললেন আমাকে?

রমলা প্রশ্নটা আবার করল।

হ্যাঁ, ভালই আছেন, এ বয়সে যতটা ভাল থাকা উচিত। বাবা উপস্থিত কাশীতে আছেন।

শেষজীবনে অনেকেই কাশীতে থাকতে চান। কিছু না ভেবেই রমলা কথাটা বলল।

ঠিক সে জন্য নয়, খুব আস্তে আস্তে শান্তনু বলল।

রমলা কোন কথা বলল না। বেশ কৌতূহলী হওয়া হয়তো সমীচীন হবে না।

শান্তনুই বলল, একটু পরে।

আমার ওপর অভিমান করেই বাবা কাশীবাসী হয়েছেন।

অভিমান করে?

তা ছাড়া আর কি। ওই যে আমি বিয়ে করতে রাজী হচ্ছি না।

রমলার হঠাৎই বিনুর মার কথাটা মনে পড়ে গেল। অনেক আগের একটা কথা। শান্তনুর বাবা নীরদবাবুর সঙ্গে রমলার বাপের যে একটা চুক্তি হয়েছিল। শান্তনু আর রমলাকে একসূত্রে বাঁধবার। সেই ধরনের কিছু একটা ইঙ্গিতই হয়তো দিয়েছিলেন নীরদবাবু, শান্তনু রাজী হয় নি।

ঠিক এ ধরনের উগ্র আধুনিকা মেয়ে তার কাম্য নয়। যে মেয়ে একলা একলা পরপুরুষের সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

তাই কি! শান্তনুর চোখের দৃষ্টি কিন্তু অন্য কথা বলে। রমলার সান্নিধ্যে এলে এই কঠিন, ঋজু মানুষটা ইদানিং কেমন যেন স্তিমিত হয়ে পড়ে। রমলার পাশে অন্য পুরুষ দেখলে শান্তনুর দৃষ্টিতে যে আভা বিচ্ছুরিত হয়, তা অন্ততঃ নিস্পৃহতার শান্ত আভা নয়, সেটুকু বুঝতে রমলার কোন অসুবিধা হয় না।

রমলা গলায় হালকা সুর আনল।

কিন্তু আপনি বিয়ে করতে রাজীই বা হচ্ছেন না কেন? ভাল চাকরি করেন, এমন চমৎকার গাড়ি কিনেছেন, শরীর দেখেও মনে হয় না স্বাস্থ্য খুব খারাপ, তবে আপত্তিটা কোথায় আপনার?

এতক্ষণ পরে শান্তনু রমলার দিকে চোখ ফেরাল। পলকের

জন্য। তারপরই বাইরের দিকে চেয়ে বলল, বিয়ে করব না এমন কথা তো আমি কোনদিনই বলি নি।

শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে রমলা হাসি আটকাল। বলল, তবে ?

বিয়েটা একটা ছেলেখেলা আমি মনে করি না। অন্ততঃ ও দেশে যা দেখেছি। অত্যন্ত পরিতাপের কথা যে এ দেশেও ও দেশের ছায়া পড়ছে, বিশেষ করে এ মেয়ে বাছাই করার ব্যাপারে। নারী ভগবতীর অংশ। তাঁদের সঙ্গে দু'দিন বেড়িয়ে, হোটেল রেস্তর্াঁয় খেয়ে তাঁদের স্বরূপ চেনার চেষ্টা যারা করে তারা মহামূর্খ। আমি বিশ্বাস করি বিবাহ জন্মজন্মান্তরের বন্ধন। কে আমার স্ত্রী হবে তা বহু আগে থেকেই ঠিক করা। সময় হলে সে ঠিক ধরা দেবে। সে জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

শহর কলকাতার বুকের ওপর, আধুনিক যুগে, কোন উচ্চ-শিক্ষিত যুবকের মুখ থেকে এমন একটা কথা কোনদিন শুনতে হবে, এ যেন বমলার কল্পনারও অতীত ছিল।

পাশাপাশি আর একটা কথাও রমলার মনে হল। এমন তো নয়, জয়ন্ত আর রমলার অবাধ মেলামেশার ব্যাপারটাই ইঙ্গিত করছেন। সেটাও সম্ভব। সেই জন্যই বোধ হয় রমলার পাশা-পাশি জয়ন্তকে দেখে শান্তনুর দুটো চোখ জ্বলে উঠেছিল।

রমলা কিছু বলল না। স্থির যখন কিছু জানা যাচ্ছে না, তখন তাকে কেন্দ্র করে কোন কথা বলা সমীচীন হবে না। সম্ভবতঃ রমলারই মনের ভুল। শান্তনু নিজের কথাই বলছে। এ যুগের মানুষ হয়েও মনটা তার বাঁধা বিগত যুগের শৃঙ্খলে। চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গীও প্রাচীন। এ পরিচয় রমলা অনেক আগেই পেয়েছে।

তাই সে হেসেই বলল, যদি সারাটা জীবন অপেক্ষা করতে হয় আপনার উমার জন্য ?

উমা ? শান্তনু দৃশ্যতঃ চমকে উঠল।

উমা মানে মহেশ্বর আর উমার কথা বলছিলাম। আপনি যুগযুগান্তরের বন্ধনের কথা বললেন কিনা।

ও। শান্তনু বাইরের দিকে চেয়ে রইল, তারপর একসময়ে আস্তে আস্তে বলল, এটা আপনারা ঠিক বুঝবেন না। হয়তো হাসাহাসি করবেন।

হাসাহাসি করব ? কেন বলুন তো ?

কারণ, এ চিন্তাধারার সঙ্গে আপনাদের মনের মিল নেই। সব কিছু ব্যাপারেই আপনারা পাশ্চাত্ত্যের নকল করে চলেছেন। কিন্তু আপনারা ভুলে যান প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্য দেশ শুধু আবহাওয়ার ব্যাপারেই নয়, সংস্কৃতি, আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী সব কিছুতেই একেবারে ভিন্ন। আমাদের সঙ্গে মিল খুঁজতে যাওয়া বোকামির নামান্তর।

তা বলে, ওদের ভাল জিনিসের নকল করা নিশ্চয় দোষের নয়।

কোন্‌টা ওদের ভাল জিনিস ? বিয়ের আগে কোর্টসিপ প্রথা ? আপনি বোধ হয় জানেন এই একটা ব্যাপারে গোটা পাশ্চাত্ত্য দেশ একেবারে দেউলে। এ প্রথার অবলোপ করতে পারলে ওরা বাঁচে। এতে ওদের ঘর ভাঙছে, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে, সমস্ত দাম্পত্য-জীবনটা একটা ছন্নছাড়া রূপ নিচ্ছে।

আরো অনেকক্ষণ হয়তো শান্তনু বলে চলত কিন্তু রমলা বাধা দিল। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে বলল, এই যে বাঁদিকের গলি। প্রথম বাড়িটার গেটের সামনে গাড়ি রাখতে হবে।

মোটর থামল।

শান্তনু নেমে দরজা খুলে দাঁড়াল রমলার যাবার পথ করে দিয়ে।

রাস্তায় নেমে রমলা বলল, একবার বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না ? আপনি তো বহুদিন আসেন নি আমাদের বাড়ি।

শান্তনু হাতজোড় করল, আজ নয়। আজ একটি ভদ্রলোকের

আমার কাছে আসার কথা আছে। আর একদিন আসব। সামনের সপ্তাহে।

শান্তনু চলে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রমলা একবার নীচের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল। কোন মক্কেল নেই। রাজীব রায় একলা বসে একটা আইনের বই পড়ছেন।

রমলা নেমে এসে পর্দার পাশে দাঁড়াল।

আসব বাপী ?

রাজীব রায় বই থেকে মুখ তুললেন। চশমা পালটালেন, তারপর বললেন, এস, এস, ঘরে কেউ নেই।

রমলা ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসল।

রাজীব রায় স্নেহসিক্তকণ্ঠে বললেন, তারপর কেমন দেখলে ড্রামা বল ?

ভাল। জানো বাপী কে আমাকে গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে গেলেন ?

কে ? রাজীব রায় বিস্মিত হওয়ার ভান করলেন।

শান্তনুবাবু। শান্তনুবাবু নতুন একটা রোভার কিনেছেন। অফিসের নয়, নিজের।

গাড়ি কিনেছে শান্তনু ? বাঃ, তবে যে তুই বলতিস একটু old-fashioned, আদবকায়দা জানে না।

পয়সা থাকলেই গাড়ি কেনা যায় বাপী, তার জন্য আদব-কায়দা জানতে হয় না।

কিন্তু রোভার না কিনে একটা ঘোড়ার গাড়িও তো সে কিনতে পারত।

রাজীব রায় উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়লেন।

তা অবশ্য পারতেন। সেটাই ঠিক হত, কারণ মনের দিক থেকে তিনি ছ্যাকড়া গাড়ির যুগেই রয়ে গেছেন।

রাজীব রায় একদৃষ্টে কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আজ আবার শান্তনু কি করল? তোমার সম্মান প্রদর্শনের কোন ত্রুটি হয়েছে নাকি?

রমলা মুচকি হাসল, না বাপী, আজ এটিকেটে শান্তনুবাবু একেবারে পুরো নম্বর পেয়েছেন। নামিয়ে দেবার সময় নিজে নেমে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলেন।

একবার আসতে বললি না কেন?

বলেছিলাম বাপী। বললেন, একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে। সামনের সপ্তাহে আসবেন।

আমাদেরই ভুল হয়ে গেছে। ছেলেটা একলা রয়েছে। আমাদের উচিত ছিল মাঝে মাঝে এখানে খেতে বলা। তুই বরং একটা কাজ কর।

কি বাপী? ,

কাল কিংবা পরশু ওর অফিসে ফোন করে দে, অফিস-ফেরত এখানে চলে আসুক। একেবারে খাওয়াদাওয়া সেরে যাবে।

উঠতে গিয়েও রমলা উঠল না। বলল, আর একটা কি ব্যাপার হয়েছে জানো বাপী?

আবার কি হল?

শান্তনুবাবুর বাবা রাগ করে কাশী চলে গেছেন।

রাগ করে? কার ওপর রাগ করে?

ছেলের ওপর।

দূর, কে বললে তোকে?

কেন, ছেলেই বললেন।

কি বললে?

বললেন যে তিনি বিয়ে করতে রাজী হচ্ছেন না বলে তাঁর বাবা রাগ করে কাশীবাসী হয়েছেন।

রমলা ভেবেছিল কথাটা শুনে রাজীব রায় হেসে উঠবেন,

কিন্তু তিনি হাসলেন না। বরং একটু গম্ভীরই হয়ে গেলেন। হাত দিয়ে মাথার চুল টানতে টানতে বললেন, আসুক শান্তনু, তার কাছ থেকে নীরদের কাশীর ঠিকানাটা নিতে হবে। অনেকদিন চিঠিপত্র লিখি নি। একটা খবর নিতে হবে।

একটু বসে থেকে রমলা উঠে পড়ল। রাজীব রায় আবার আইনের বই খুলে বসলেন।

পরের দিন শান্তনুকে ফোন করতে গিয়ে রমলার মনে পড়ল যে শান্তনুর অফিসের নাম তার জানা নেই। কাজেই ফোন নম্বরও নয়।

রাজীব রায় নিজের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, রমলা তাঁর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করল। সাতসকালে শান্তনুর ফোন নম্বরের খোঁজ করতে গেলে বাপী কি মনে করবেন। ভাববেন, মেয়েটা বোধ হয় সারা রাত ঘুমোয় নি। শান্তনুর কথা ভেবেছে। তাই ভোরে উঠেই শান্তনুকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

অথচ ঈশ্বর জানেন রাতের মধ্যে এক পলকের জন্যও রমলার শান্তনুর কথা মনে হয় নি। শুতে যাবার মুখে জয়ন্তর কথা ভেবেছে। জয়ন্ত বি. এ. পাস করলে ব্যারিস্টারী পড়তে বাইরে চলে যাবে। অনেকগুলো বছর তাকে ছেড়ে থাকতে হবে। কিন্তু এ বিচ্ছেদ অসহনীয় হবে না রমলার কাছে। পরে জয়ন্তও কৃতী হয়ে ফিরে আসবে। রমলার পাশে এসে দাঁড়াবে। তখন, নিজের কথা, নিজেদের কথা রমলা বাপীকে বলবে।

এ কথা রমলা বেশ জানে। এখন বাপীকে জয়ন্তর কথা বললে তিনি হেসে উঠবেন। অনিশ্চিত নদীর চরে যেমন নৌকা বাঁধা বোকামি, তেমনি সাধারণ এক গ্র্যাজুয়েটের হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়াও সমান মূর্খতা। একটি গ্র্যাজুয়েট শুধু একটি কাদার

তাল। তার পরিণতির কথা বোঝা তুষ্কর। শিব কিংবা বানর কি হবে কিছুই বোঝা যায় না।

কিন্তু সে হিসাবে ব্যারিস্টার পাত্র অনেক লোভনীয়। উপার্জন করার তকমা তার রয়েছে। মেজে ঘষে শাণিত করে নেওয়া চলে। তা ছাড়া প্রয়োজন হলে ব্যারিস্টার রাজীব রায় রয়েছেন। নিজের পক্ষপুটে জামাইকে আশ্রয় দেবেন।

কে ? রাজীব রায় কাগজ থেকে মুখ তুলে চাইলেন।

শাড়ির একটু খসখস শব্দ হয়েছিল, তাতেই রাজীব রায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হল।

আমি বাপী। রমলা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

কি ব্যাপার ? দিন আর কাটছে না বুঝি ? রাজীব রায় মেয়ের পিঠে হাত রাখলেন।

সত্যি বাপী। যখন কলেজ খোলা ছিল, তখন ভাবতাম কলেজ বন্ধ হলে কি মজা। আর এখন পরীক্ষার পরে কলেজ বন্ধ, মনে হচ্ছে কলেজ খুললে বাঁচি।

ভাবছি কোর্টটা বন্ধ হলে একটু বাইরে কোথাও ঘুরে আসব। আমার পরিশ্রম বড্ড বেশী হচ্ছে।

হাতের কাগজটা রাজীব রায় একপাশে সরিয়ে রাখলেন।

সত্যি বাপী তুমি বড্ড বেশী খাটো। বিশ্রাম বলে তোমার কিচ্ছু নেই।

বিশ্রাম ! রাজীব রায় হাসলেন। ম্লান, নিস্তেজ হাসি। এ ছাড়া আমি আর কি করতে পারি বল ? চুপ করে বসে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।

রমলা বাপের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। চোখাচোখি হল তুজনের। এতদিন এ কথাটা রমলার একেবারেই মনে হয় নি। নিজের হৃদয় নিয়েই ব্যস্ত ছিল। নিজেকে নিয়ে উন্মত্ত। সত্যি, বাপীর কথাটা একবার ভেবেও দেখে নি। পিসির কাছেই শুনেছে, খুব

ভাব ছিল তুজনের মধ্যে। রমলার মা আর বাপী। মায়ের অসুখের সময় বাপী ঘরের মধ্যে ঢুকতেন না, ঢুকতে পারতেন না, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে বসে থাকতেন। ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। অন্য পরিজনদের মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন।

মা চলে যাবার পর তিন দিন তিন রাত বাপী নিজের ঘর থেকে বেরোন নি। বালিশে মুখ ঢেকে শিশুর মতন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। তাই বুঝি কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। নিশ্চিন্ত অবসরে, কর্মহীন মুহূর্তে হয়তো পুরোনো কথার রাশ মনের মধ্যে কিলবিলিয়ে ওঠে। আর একটা মানুষের মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের স্মৃতি পাগল করে তোলে। তাই রাজীব রায় নিজেকে অবিশ্রান্ত ছুটিয়ে চলেছেন কাজের চাবুক মেরে মেরে। এই পরিশ্রমই তাঁর বিশ্রাম। মারাত্মক চিন্তা থেকে, সর্বনাশা অতীত থেকে বাঁচবার আশ্রয়।

দার্জিলিং গেলে হয়! রাজীব রায় শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেন।

রমলা বাপের আরও কাছে সরে এল। এক হাত দিয়ে তাঁর চুলের মধ্যে বিলি কাটতে কাটতে বলল, তাই চল বাপী। সেই খুব ছোটবেলায় একবার দার্জিলিং গিয়েছিলাম, ভাল করে কিছু আমার মনেই নেই। তিব্বতী গুম্ফায় গম্ভীর শব্দে কি রকম ঘণ্টা বাজত বাপী! সেই ঘণ্টার আওয়াজ মাঝে মাঝে যেন শুনতে পাই। ছেলেবেলায় যে শব্দ শুনে ভীষণ ভয় পেতাম। ছোটবেলায় কি ভীতু ছিলাম, না বাপী?

রাজীব রায় আবার হাসলেন, বললেন, সে শব্দে আমি এখনও ভয় পাই রমি।

এখনও ভয় পাও? রমলার কণ্ঠে কৌতুকের রেশ।

হুঁ। ও শব্দ যেন ওপার থেকে আসে। মানুষকে সাবধান করে দেয়। এপারে ক্ষণ-অবস্থানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মানুষের মোহ, দম্ভ, তেজ সব মুছে দেয়। বিরাট হিমালয় আর বুককাঁপানো ওই ঘণ্টার রেশ, দুটোই যেন অতীন্দ্রিয় কিছু। এপারের স্পর্শ, স্বাদ, ঘ্রাণের অতীত।

রাজীব রায় অনেকক্ষণ একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। রমলার উপস্থিতি ভুলে।

রমলা আরও সরে এল বাপের কাছে। গম্ভীর গলায় বলল, দার্জিলিং যাবো না বাপী।

কেন রে? রাজীব রায় চোখ ফেরালেন। মেয়ের দিকে নয়। হাওয়ায় ওড়া ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলোর ওপর।

ওখানে গেলে হিমালয় চোখে পড়লে আর গুম্ফার ঘণ্টার শব্দ কানে গেলে তুমি এমনিই গম্ভীর হয়ে যাবে। আমাব সঙ্গে কথা বলবে না। আমার কথা মনেই পড়বে না তোমার।

রাজীব রায় সশব্দে হেসে উঠলেন। তারপরই সামলে নিয়ে বললেন, ভাল কথা, রমি, শান্তনুকে মনে করে একবার ফোনটা করে দিস।

কিন্তু আমি তো শান্তনুবাবুর ফোন নম্বর জানি না বাপী।

দেখ তো টেবিলের ওপর আমার কালো ডায়েরী রয়েছে। ওর মধ্যেই অফিসের ঠিকানা আর ফোনের নম্বর দুটোই আছে।

রমলা টেবিলের ওপর থেকে ডায়েরীটা তুলে নিয়ে ওলটাতে লাগল। বেশীদূব যেতে হল না। কয়েকটা পাতা পরেই শান্তনুর নামের পাশে তার অফিসের ঠিকানা আর ফোন নম্বর রয়েছে।

পেয়েছি বাপী। তুমিই ফোনটা করে দাও না। আমি বললে আবার কি মনে করবেন।

কিছু মনে করবে না। কিন্তু এখন ফোন করে কি হবে। দশটার পরে করিস। শান্তনু অফিসে এলে।

রাজীব রায় কোর্টে বেরিয়ে যাবার পর রমলা ফোন তুলল।

নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করল। এত আগ্রহ কেন ফোন করার! এত উৎসাহ!

রমলা সবেগে মাথা নাড়ল। না, না, সে সব কিছু নয়। সে সব কিছু হতে পারে না। শুধু নিছক কৌতূহল। শান্তনু বিচিত্র এক জীব। ওদের সমাজে বেমানান। আধুনিক খোলসের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক রুচি, স্থবির চিন্তাধারা। তাই তার সঙ্গে আলাপ করতে, তাকে উদ্দীপ্ত করতে রমলার ভাল লাগে।

তারের ও প্রান্তে নারীকণ্ঠ। কাকে চাই সে কথাই জিজ্ঞাসা করল। একটু থেমে রমলা শান্তনুর পুরো নামটা বলল।

একটু ধরুন। কয়েক সেকেণ্ড, তারপরই গম্ভীর গলার আওয়াজ।

শান্তনু বোস কথা বলছি।

গলার স্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে রমলা বলল, আমি রমলা।

রমলা! শান্তনুর কণ্ঠে যেন চেষ্টাকৃত বিস্ময়।

ব্যারিস্টার রাজীব রায়ের মেয়ে। রমলা পরিচয়টা আরো সহজ করার প্রয়াস করল।

ও রমলা দেবী, কি খবর?

আজ বিকেলে ফ্রি আছেন আপনি?

আজ বিকেলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন কাজ নেই। অফিসের পরে একেবারে ফ্রি।

বাপী বিশেষ করে বলে দিয়েছেন আপনাকে বিকেলে আমাদের বাড়ি আসবার জন্য। রাত্রে খেয়েদেয়ে বাড়ি যাবেন।

বাপী? বাপী কে?

রমলা লজ্জিত হল। কুণ্ঠাজড়ানো গলায় বলল, বাবাকে আমি বাপী বলি।

কিন্তু কি ব্যাপার? হঠাৎ?

ব্যাপার কিছু নয়। আপনি একলা থাকেন, তাই বাপী, মানে বাবা বলছিলেন আমাদের একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার।

বেশ তো খোঁজখবর নেবেন, কিন্তু খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কেন?

বিরাট কিছু নয়, খুব সামান্য আয়োজন। আপনি আসবেন দয়া করে।

বেশ। শান্তনু টেলিফোন ছেড়ে দিল।

রমলা আস্তে আস্তে বেরিয়ে বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিল। এত বড় চাকরি করে, বিদেশী ডিগ্রী করায়ত্ত, আধুনিক যুবকের যে স্বর্গরাজ্য কাম্য তা শান্তনুর কবলিত। কিন্তু আচারে আচরণে পোশাকে পরিচ্ছদে কেমন একটা দৈন্য ফুটে ওঠে। এমন কি কিছুটা কথাবার্তাতেও। আরও আশ্চর্যের বিষয়, এই সংস্কৃতিহীনতা সম্বন্ধে শান্তনু যেন বেশ সচেতন। ইচ্ছা করেই সে এসব করে। সভ্য সমাজ দেখুক আমি কত অ-সভ্য, অমার্জিত।

শান্তনুর পাশাপাশি রমলার মনে আরও একজনের মুখ ভেসে উঠল। সে মুখ জয়ন্তর। এমন একটা লোভনীয় চাকরির অধিকারী যদি জয়ন্ত হত, তা হলে কোন দিক থেকে কোন বাধার প্রশ্ন উঠত না। রাজীব রায় খুশী হতেন, রমলার তো কথাই নেই।

বুক কাঁপিয়ে রমলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এইটুকুই বুঝি দুনিয়ার খেলা। যার প্রাসাদে থাকা উচিত সে আস্তানা বাঁধে বস্তিতে। আবার বস্তিবাসী প্রাসাদে বাস করার মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মায়।

এলোমেলো চিন্তা করতে করতেই রমলা ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙল বিনুর মার ডাকে।

ও দিদিমণি, তোমার ফোন এসেছে। ওঠ একটু।

ধড়মড় করে রমলা উঠে পড়ল। কার ফোন! শান্তনু বুঝি ফোন করে জানাবে যে সে আসতে পারবে না। শান্তনুর অসাধ্য কিছুই নেই। হয়ত অফিসের কাজ করতে করতে খেয়াল হয়েছে, বড়লোকদের বাড়ি ঘনঘন নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়া অনুচিত। কিংবা

গৃহস্বামীর বদলে তাঁর কন্যা আমন্ত্রণ জানালে, সে আমন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য কি না তাই নিয়ে মনে সন্দেহের ঢেউ উঠেছে।

শাড়ি গুছিয়ে নিয়ে রমলা ফোন তুলে ধরল, কে?

আমি জয়। তারের ওপারে ভীরু একটা কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে উঠল।

কি খবর?

তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

বেশ তো, চলে এস। আমি বাড়িতেই আছি।

না, না, বাড়িতে নয়। বাইরে কোথাও দেখা করতে পারবে? ভীষণ প্রয়োজন।

কি ব্যাপার বল তো? খারাপ খবর কিছু নয় তো? তোমার শরীর কেমন আছে?

এতগুলো প্রশ্নের জয়ন্ত কোন উত্তর দিল না। শুধু বলল, গান্ধীজীর স্ট্যাচুর সামনে আমি অপেক্ষা করছি। লক্ষ্মীটি, তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস।

কথাটা বলেই জয়ন্ত ফোন ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণ রমলা দু'গালে দু'হাত রেখে কৌচের ওপর চুপচাপ বসে রইল।

কি হয়েছে জয়ন্তর! কি হতে পারে! এমন কি দুর্ঘটনা যা জয়ন্তর কণ্ঠস্বরকে এমন নিস্তেজ করে দিতে পারে! এমন নিরুত্তাপ!

বিনুর মাকে বাড়তি লোকের খাবার সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে রমলা দ্রুত পোশাক বদলে নিল। এত উৎকণ্ঠা নিয়ে কোনদিন জয়ন্ত তাকে ডাকে নি।

রাস্তায় নেমে রমলা একটা ট্যাক্সি ডেকে নিল।

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে যখন এল, তখন জয়ন্ত বোধ হয় অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢেকে।

রমলা ট্যাক্সি থেকে নেমে নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়াল।

জয়।

জয়ন্ত চমকে মুখ তুলল। দুটি চোখ লাল। মাথার চুল উস্কখুস্ক।

কি হয়েছে?

জয়ন্ত কোন কথা বলল না। উঠে ময়দানের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বিচলিত, বিস্মিত রমলা তার পিছন পিছন হাঁটতে লাগল।

গুলমোহর আর পাকুড় গাছের ভিড়। বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে ছায়ার আঁচড়।

জয়ন্ত একটা গাছের তলায় বসল। রমলা তার পাশে।

কি হয়েছে তোমার?

আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি রম।

কি বিপদ, লক্ষ্মীটি সব খুলে বল আমায়।

মা কাল রাতে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

সেকি, কোথায়?

জানি না। আজ সকাল থেকে আমাদের জানাশোনা সব বাড়িতে খোঁজ করেছি, কোথাও নেই।

কিন্তু হঠাৎ বাড়ি ছাড়লেন কেন?

হঠাৎ নয়। প্রত্যেক রাত্রে বাবা চেম্বার থেকে ফিরলেই মা চেঁচামেচি শুরু করতেন। বাবাকে বিয়ে করে তার জীবন কি রকম বিষময় হয়ে গেছে, তার ফিরিস্তি দিতেন। বাবা একটি কথাও বলতেন না। চুপচাপ পোশাক ছাড়তেন। ডিনার খেয়ে যেতেন। কাল রাত্রে মা বললেন, একটা প্রতারণার ওপর ভিত্তি করে যে মিলনের চেষ্টা তার অবসান হওয়াই উচিত।

খুব আস্তে বাবা শুধু একটা কথা বললেন, আইরিন, আমাদের বিয়ে প্রতারণার ওপর ভিত্তি করে হয় নি! অন্ততঃ আমার দিক থেকে কোন প্রতারণা ছিল না।

আলবৎ ছিল! একশবার ছিল! মা চীৎকার করে উঠলেন, এভাবে মধ্যবিত্ত জীবন যাপন করার মোহ আমার কোনকালে ছিল না। তুমি আমার কাছে ভারতবর্ষের যে ছবি এঁকেছিলে, সে তোমার মনগড়া এক দেশ। বাস্তবে তার সঙ্গে এ দেশের কোন মিল নেই। তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝে, আমার মনের রং দিয়ে সেই ভারতবর্ষের ছবি এঁকেছিলে। তুমি জানতে তাতে আমার মন ভুলবে। এটা প্রতারণা নয়?

বিশ্রী একটা ঝড়ের মেঘকে বাবা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, কি ছেলেমানুষের মতন কথা বলছ আইরিন। এখন আমাদের বয়স হয়েছে। ছেলে সাবালক। আমাদের এভাবে কথা কাটাকাটি করা শোভা পায় না।

মা কিছু শুনলেন না। কিছু বুঝতে চাইলেন না। আগে থেকেই বোধ হয় মন ঠিক করে ফেলেছিলেন। বললেন, এ বিয়ে আমি মানি না। এর বন্ধন আমি স্বীকার করি না। আমি নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাই।

বাবা ডিনার টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চাপা গম্ভীর গলায় শুধু বললেন, আইরিন!

আমায় চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না। আমি তোমার এ দেশের বাঁদী নই। আমি আজই চলে যাব তোমার আশ্রয় ছেড়ে।

কি পাগলামি করছ। জয়ন্ত, জয়ন্ত কি ভাববে বল তো? বাবা থেমে থেমে উচ্চারণ করলেন। মনে হল কথাগুলো বলতে যেন তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি তখন পাশের ঘরে বিছানায় দু'কানে দুটো বালিশ চেপে শুয়ে রয়েছি। যাতে মা আর বাবার একটি কথাও কানে না আসে। কিন্তু বৃথা, দু'কানে প্রত্যেকটি কথা যেন অগ্নিবৃষ্টি করল।

মা ঘৃণায় মুখ বিকৃত করলেন। পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি সব

দেখতে পেলাম। বললেন, ওঃ জয়ন্ত, জয়ন্ত কি ভাববে। ও তো একটা ছোট তুমি। তোমারই মতন প্রবঞ্চনা আর প্রতারণায় ঠাস-বোঝাই। ওর শরীরে একটুও আইরিশ রক্ত নেই। থাকলে দিনের পর দিন এভাবে মার নির্যাতন দেখতে পারত না। তোমার ছেলে তোমারই থাক। ওকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আর একটি মুহূর্ত এ ছাদের তলায় থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে।

বাবা একটি কথাও বললেন না। মাথা নীচু করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

রমলা বুঝল জয়ন্তকে সান্ত্বনা দেওয়া খুব প্রয়োজন। সহানুভূতির প্রলেপ। কিন্তু কি বলবে কিছু ভেবে পেল না।

এদিক ওদিক চেয়ে জয়ন্তর খুব কাছে এসে রমলা তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, পৃথিবীতে আলো যেমন আছে, তেমনই ছায়াও আছে জয়। দয়ামায়ার পাশাপাশি নির্মম দিকটাও রয়েছে। জানি, সমস্ত ব্যাপারটা তোমার কি বিশ্রী লাগছে, কিন্তু সহ্য করা ছাড়া আর কি করতে পারো তুমি!

জয়ন্ত আস্তে আস্তে মাথা তুলল। রমলার দিকে চেয়ে বলল, মার চলে যাওয়াটাতে আমি আঘাত খুব বেশী পাই নি রম। তুমি তো জানো মার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব নিবিড় কোনদিনই ছিল না। মা ঠিকই বলেছেন, I was daddy's child. আমি ভেঙে পড়েছি অন্য একটা ব্যাপারে।

কি জয়?

সারা রাত ঘুমাতে পারি নি। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মতন এসেছিল, হঠাৎ মাথায় হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে জেগে উঠলাম। আবছা অন্ধকার। সবে ভোর হয়েছে, ভাল করে ভোরের আলো ফোটে নি। দেখলাম বাবার দীর্ঘ কাঠামো। আমি চোখ খুলতেই বললেন, জয়ন্ত, তোমার সঙ্গে কথা আছে বাবা।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। বাবা বিছানার ওপর বসলেন। আধো আলো, আধো অন্ধকারে বাবাকে খুব অসহায় ঠেকল।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, কি কথা বাবা?

তোমার মা চলে গেছে হয়তো জান। সম্ভবতঃ সে আর আমার সংসারে ফিরে আসবে না। কোর্ট থেকে ডাইভোর্স নেবার চেষ্টা করবে। আমি এ জিনিসটা এড়াতে চেয়েছিলাম। এতে আমার সামাজিক ক্ষতি যথেষ্ট হবে। কিন্তু তোমার মাকে থামানো যাবে না। আমার ছেলে হিসাবে কিছুটা কাদা হয়তো তোমারও গায়ে লাগবে, কিন্তু ঈশ্বর জানেন আমরা নিরপরাধ। আইরিন যা করছে তার জন্য সে নিজে সম্পূর্ণভাবে দায়ী। এই কথাগুলো তোমাকে জানানো কর্তব্য বঁলে মনে করি জয়ন্ত।

গলার কাছে কান্নার বেগ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল। বাবা গম্ভীর, রাশভারী মানুষ। নিজের প্রফেশনে হয়তো সুনাম অর্জন করতে পারেন নি, কারণ উন্নতি করতে হলে যে হীন চাতুর্য, মিথ্যা আত্মম্ভরিতার প্রয়োজন, সেটার তাঁর অভাব ছিল। কিন্তু তাঁর এভাবে মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে বসা, উত্তেজিত, কম্পিত কণ্ঠস্বর আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না, রম। এ যেন মনুষ্যত্বের পতন।

জয়ন্ত চুপ করল। গড়িয়ে পড়া দুপুরের নিস্তব্ধ পরিবেশে জয়ন্তর কথাগুলো কান্নার রূপ নিল। অমঙ্গলের প্রতীক। কোথায় দূরে ব্রেক টেনে একটা গাড়ি নিশ্চল হল। ব্রেকের শব্দ নয়, যেন কার আর্তরোল। সমাজব্যবস্থা, মানুষের বিবেক, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি সব ভেঙে পড়বে, থমথমে প্রকৃতির বুকে তারই আভাস।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল, আমি চলি রম। বাড়িতে ফিরতে হবে। বাবা আজ চেম্বারে যান নি। চুপচাপ বসে আছেন পড়ার টেবিলে। কথাগুলো তোমাকে জানাবার জন্য ছুটে চলে এসেছি। বাবাকে বেশীক্ষণ একলা থাকতে দিতে আমার সাহস হচ্ছে না।

সব কিছু ভুলে রমলা এগিয়ে এসে জয়ন্তর একটা হাত চেপে ধরল, একটা কথা দাও জয়।

কি ?

তুমি প্রত্যেকদিন ফোন করে রোজকার খবর আমাকে দেবে ? কলেজ ছুটি, আমি বাড়িতেই থাকব।

জয়ন্ত ঘাড় নাড়ল, তারপর দ্রুতপায়ে রাস্তার দিকে চলে গেল।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে রমলা চলে এল। অঞ্জলি ভরে অবসাদ আর শ্রান্তির কালি নিয়ে জয়ন্ত যেন রমলার সারা মুখে মাখিয়ে দিয়ে গেল। বিষণ্ণ হয়ে গেল মনটা। ভেবেছিল জয়ন্তর সঙ্গে দেখা করে নিউ মার্কেটে গিয়ে টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কিনবে। কিন্তু কিছু ভাল লাগল না। কি করে শান্তনুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, কথা বলবে তার সঙ্গে, সেটাই যেন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

একটা ট্যাক্সি ডেকে রমলা উঠে পড়ল। সীটে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইল।

ভালবাসার মানুষকে কি করে লোকে এভাবে ছেড়ে চলে যায় ! যাকে পাবার জন্য দুর্মর তপস্যা করে, দু'হাতে সরিয়ে দেয় প্রিয়-জনকে, সমাজের বিধিনিষেধের কাঁটাতার দু'পায়ে দলে যায়, তাকেই আবার কি ভাবে ঠেলে দেয়, ক্ষতবিক্ষত করে কথার চাবুকে, তা রমলার বুদ্ধিরও অগম্য।

হঠাৎ রমলা সচেতন হয়ে উঠল।

দুটো কাক অনেকক্ষণ ধরে কর্কশকণ্ঠে ডেকে চলেছে। বকুল-গাছের নীচু একটা ডালে। ভাবতেও রমলার হাসি পেল। জেলের মধ্যে একটা বকুলগাছও আছে। শুধু তাই নয়, সে গাছের শাখায় শাখায় ফুলে ভরে যায়। আবার বিছিয়েও থাকে গাছের তলায়। জ্যোৎস্নারাতে মনে হয় থানপরা তন্বী এক তরুণী।

মেট-এর কাছে একবার রমলা শুনেছিল। অনেক বছর আগে

বিখ্যাত ডাকাত কালু খাঁ ছিল এখানে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হবার আগে। সেই সময় কোথা থেকে এক বকুলগাছের চারা যোগাড় করেছিল। সকাল সন্ধ্যা তরিবত করে, জল দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছিল গাছটাকে। যতটুকু সময় পেত, গাছটাকে আগলাত। একটি একটি করে শুকনো পাতা, মরা ডাল বেছে বেছে ফেলে দিত। এদিক ওদিক থেকে ভাল মাটি সংগ্রহ করে গাছের তলায় দিত।

আর সকলে আশ্চর্য হয়ে যেত কালু খাঁর গাছের পরিচর্যা দেখে। দুর্ধর্ষ নরঘাতক, খুন যার পেশা, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যার অপার আনন্দ, তার এ কি খেয়াল!

কিছু বোঝা যায় না। হৃদয়ের ওপর আবরণ থাকে। একটা নয়, একটার পর একটা আবরণ। বাস্তবের সংঘাতে একটা আবরণ ছিন্নভিন্ন হয়, তীব্র আঘাতে হৃদয়তন্ত্রী কেঁপে ওঠে,, কিন্তু আর এক আবরণ উন্মোচিত হয়। নতুন এক রূপ, নতুন এক স্পর্শকাতরতা নিয়ে। মানুষটাও প্রতিভাত হয় নতুন এক চেতনা নিয়ে।

কাকের ডাক বুঝি অমঙ্গলের চিহ্ন। বিনুর মা তাই বলত। বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে কাকের ডাক শোনা গেলে বিনুর মা হাতের কাছে যা পেত, তাই নিয়ে তেড়ে যেত। সেদিন কিন্তু ধারে কাছে কোথাও একটি কাকের শব্দ শোনা যায় নি। জয়ন্ত যেদিন তার মায়ের চলে যাওয়ার কথা রমলাকে বলেছিল। অথচ সেই তো অমঙ্গলের সূচনা। বাদুড়ের প্রেতমূর্তিটা কালো ডানা মেলে এগিয়ে আসছিল, রমলা লক্ষ্যই করে নি।

আজ অবশ্য কাক ডাকছে। একটা নয়, এক জোড়া। আজ আর রমলার অমঙ্গলের কোন ভয় নেই। মঙ্গল অমঙ্গল সব কিছু সে পার হয়ে গিয়েছে। তার জীবনের দাঁড়িপাল্লায় মঙ্গল আর অমঙ্গলের ভার এক।

এই স্তব্ধ দুপুরে কাকের কর্কশ ডাক যেন বাতাসকে চিরে দিয়ে

যাচ্ছে। সেদিন আইরিন আর সৌরীন ঘোষালের বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করে রমলা শিউরে উঠেছিল। কি করে পবিত্র দুশ্ছেদ্য একটা বন্ধন এভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারে অনভিজ্ঞ এক মন তার কোন হদিস পায় নি।

তারপর কিন্তু অনেক ঢল নেমেছে হুগলী নদীতে। বিবাহের বন্ধনকে এত পবিত্র, মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে আর রমলার মনে হয় নি। অনেক কুৎসিত পথ বেয়ে সে হেঁটেছে, দু'পাশে অনেক পঙ্কিল মুখের সার দেখেছে। ধর্ম, নীতি, পবিত্রতা এসব তার কাছে অর্থহীন কথার সমষ্টি মাত্র। তার বেশী কিছু নয়।

হঠাৎই রমলার চোখে পড়ল। কাকগুলো আর ডাকছে না। কোথা থেকে দুটোতে কুটি বয়ে বয়ে নিয়ে আসছে। বাসা বাঁধবে বকুলের ডালে। জেলখানার এই নির্মম আবেষ্টনীর মধ্যে, পাপ, হিংসা, কলুষতার রাজ্যে পরিপাটি এক নীড় গড়ে তুলবে!

পৃথিবীর আদিমতম নেশা। বাসা বাঁধা। যুগে যুগে মানুষ সুরক্ষিত আবাস গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচবার জন্য, আপনজনকে বাঁচাবার জন্য মনোরম এক গৃহ।

খুটখুট শব্দ হতে রমলা চমকে মুখ ফেরাল। সানকিটা নিয়ে ইঁদুরে টানাটানি করছে। ভাতের দানাগুলো নিঃশেষ করে তৃপ্তি হয় নি, তাই আধারসুদ্ধ নিজের বিবরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। মানুষের মতনই লোভী, মানুষের মতন ধূর্ত মূষিক-শাবক। অল্পে সন্তুষ্ট নয়। সব শেষ হয়ে গেলেও কঙ্কালটা নিয়ে টানাটানি করে।

সেদিন রমলা আর নিউ মার্কেটে যায় নি। সোজা বাড়ি ফিরে গেছে। যেতে যেতে মনে মনে কামনা করেছে, শান্তনু যেন না আসে। অফিসের জরুরী কাজে আটকা পড়ে যায়। মনের এ অবস্থায় কপট অভ্যর্থনা, নিরর্থক কথাবার্তা বলতে রমলার ভাল লাগবে না।

শান্তনু এসেছিল। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। তখনও রাজীব রায় কোর্ট থেকে ফেরেন নি। শান্তনুর রোভার গাড়িটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

রমলা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসেছিল। প্রসাধনে মন ছিল না। গাড়ির শব্দ কানে যেতে প্রথমে ভাবল, রাজীব রায় বুঝি ফিরলেন, কিন্তু একটু পরেই বিন্নুর মা এসে দাঁড়াল।

বাবু এসেছেন দিদিমণি।

কে বাবু? গালে রুজের ছোঁয়া দিতে দিতে রমলা প্রশ্ন করল।

ওই যে শান্তনুবাবু। ফর্সা মতন।

রমলা বুঝল। পাফ দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ততক্ষণে শান্তনু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছে।

শান্তনু হাতজোড় করল, নমস্কার, আজও একটু আগে বোধ হয় এসে পড়েছি।

রমলা চেষ্টা করে হাসল, এই তো চা খাবার সময়। ঠিক সময়েই এসেছেন।

শান্তনু গম্ভীর হল, কিন্তু চা তো আমি খাই না।

ও, ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি তো দুধ খান। দুধের অবশ্য কোন টাইম নেই। যখন খুশি খাওয়া চলে।

দুজনে এগিয়ে বারান্দার দিকে গেল। রমলা আগেই চেয়ার টেবিল রাখার বন্দোবস্ত করেছিল। বেতের আসবাব। একটা চেয়ার শান্তনুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, বসুন।

শান্তনু বসল। টাইয়ের ফাঁসটা একটু আলগা করে দিতে দিতে অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বলল, মানে, অন্যদিন পাঁচটার পরে অনেক কাজ জমা থাকে কিন্তু চলে যাব বলে ক'দিন ধরে খেটে হাতের কাজ সব শেষ করে রেখেছি। তাই পাঁচটা বাজতেই উঠে পড়তে পারলাম।

চলে যাবেন, কোথায়?

ব্যাঙ্গালোর। সেখানে কোম্পানির কতকগুলো মেশিন বসছে, সেগুলো ঠিকভাবে বসাবার জন্যে যেতে হবে।

কই সেদিন তো কিছু বললেন না?

সেদিন অবশ্য ঠিক হয় নি, তবে কিছুটা জানতাম। এ আর বলবার মতন এমন কি কথা।

রমলা মুখ নীচু করল। সত্যই তো শান্তনু অফিসের কাজে কখন কোথায় যাচ্ছে, সেটা রমলার জানবার কি অধিকার আছে। এসব কথা শান্তনু তাকে বলবেই বা কেন।

মুখ ফিরিয়ে রমলা বাইরের দিকে দেখল। পশ্চিম আকাশে পেঁজা তুলোর বুকে রক্তের ছোপ। সব কিছু রাঙিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। রক্তবর্ণ মেঘের দিকে দেখতে দেখতে রমলার আর একটা রক্তাক্ত হৃদয়ের কথা মনে হল। জয়ন্তের হৃদয়। বিশ্রী একটা ভাঙন শুরু হয়েছে তার সংসারে। দুটি হৃদয়ই শুধু দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে না, সেই সঙ্গে গোটা সংসার চুরমার করে দিচ্ছে। সেই আসন্ন সর্বনাশের দিকে চেয়েই বুঝি জয়ন্ত শিউরে উঠেছে।

জয়ন্তর মা সম্ভবতঃ স্বদেশে ফিরে যাবেন। সেজন্য জয়ন্তর যে খুব কষ্ট হবে, এমন নয়। মায়ের পক্ষপুট সে বহুদিন ত্যাগ করে এসেছে। তার কষ্ট হবে বাপের দিকে চেয়ে। বিচ্ছেদ নয়, সামাজিক গ্লানি সৌরীন ঘোষালকে পলে পলে দগ্ধ করবে, তার যন্ত্রণা জয়ন্তকেও নিষ্কৃতি দেবে না।

হ্যালো, কতক্ষণ?

বাপের গম্ভীর গলায় রমলার চমক ভাঙল। অতিথিকে সামনে বসিয়ে আবোলতাবোল ভাবনার জাল বুনে চলেছে। খেয়াল নেই।

শান্তনু উঠে দাঁড়িয়ে রাজীব রায়ের পায়ের ধুলো নিল। বলল, অনেকক্ষণ এসেছি কাকাবাবু।

চা-টা খেয়েছ? রাজীব রায় শান্তনুর কাঁধে একটা হাত রাখলেন।

চেয়ার ছেড়ে রমলা দাঁড়িয়ে উঠল।

আমারই দোষ বাপী। কেবল গল্প করেই যাচ্ছি। ওঁকে জলখাবার দেবার কথাটা আর মনে নেই।

দ্রুতপায়ে রমলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

শান্তনু রাত্রে চলে যাবার পর রমলা নিজের ঘরে ঢুকছিল, বাপের ডাকে ফিরে দাঁড়াল।

শোন, কথা আছে।

বাপের পিছন পিছন রমলা রাজীব রায়ের শোবার ঘরে এসে একটা চেয়ারে বসল।

রাজীব রায় তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বিছানার ওপর ছেড়ে দিলেন নিজেকে।

এমনভাবে ডাকাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। অনেকদিন অনেক রাত অবধি বাপ আর মেয়ে গল্প করেছে বসে বসে। রাজীব রায়ের অতীত কাহিনী কিংবা রমলার ভবিষ্যৎ।

সেদিন কিন্তু রাজীব রায় এসব কথা বললেন না।

শান্তনুকে তোর কেমন লাগে রমি?

বয়স্থা মেয়েকে এমন একটা প্রশ্নের একটাই অর্থ হয়। রমলা ইঙ্গিতটা বুঝল। তাই খুব সাবধানে বলল, কি জানি বাপী, আমি শান্তনুবাবুর সঙ্গে ঠিক সেভাবে মিশি নি।

মিশে দেখিস, তোর ভালই লাগবে। একেবারে খাঁটি হীরে। সবে খনি থেকে তোলা, তাই ধার হয়তো নেই, কিন্তু ভার আছে। এ ছেলের দাম অনেক।

নেহাত কিছু একটা বলতে হবে বলেই রমলা বলল, শান্তনুবাবু তো ব্যাঙ্গালোর চলে যাচ্ছেন বাপী।

সে তো বড়জোর মাস ছয়েকের জন্য। কতকগুলো মেশিনারী installation-এর ব্যাপারে। ওর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। ইতিমধ্যেই শুনলাম অফিসে বেশ নাম করেছে।

রাজীব রায়ের সঙ্গে শান্তনুর সব কথাবার্তাই রমলার সামনে হয়েছিল, কিন্তু রমলা এমন অন্যমনস্ক ছিল যে, সে এসব কথা কিছুতেই মনে করতে পারল না। একবার রমলা ভাবল, এই সুযোগ। এই সুযোগে একবার জয়ন্তর কথাটা বললে হয়। জয়ন্তর মা আর বাবার বিচ্ছেদের কাহিনী নয়, জয়ন্ত আর রমলার কথা। কিভাবে দুজনে এগিয়েছে পরস্পরের দিকে। ভাললাগার পথ বেয়ে ভালবাসার মন্দিরে পৌঁছানোর কথা।

জয়ন্তরা ব্রাহ্মণ এমন একটা অবাস্তব বাধার উল্লেখ বাবা নিশ্চয় করবেন না। করবেন না যে, তার পরিচয় রমলা পেয়েছে। রাজীব রায় কতদিন কথায় কথায় বলেছেন, ছেলেটি ভাল হলেই হল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ না শূদ্র এসব চুলচেরা হিসেব করতে গেলে সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না। পুরুষকারই সব। নিজের বুদ্ধিবলে যে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে সে-ই ব্রাহ্মণ। নিজের শৌর্যে-বীর্যে যে যশস্বী হয়, সেই ক্ষত্রিয়। এ যুগে একই মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ দুইই বাস করতে পারে। মূর্খ ব্রাহ্মণের চেয়ে পণ্ডিত শূদ্র পাত্র হিসাবে অনেক শ্রেয়ঃ।

তবু এই মুহূর্তে জয়ন্তর কথা বলতে রমলার মন সরল না। এখন নয়, আরো কিছুদিন পরে। বি. এ-টা পাস করুক জয়ন্ত। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করুক। তারপর সব কথা রমলা রাজীব রায়কে বলবে।

এখন শান্তনু বোসের পাশাপাশি জয়ন্ত ঘোষালকে খুব ফিকে মনে হবে। রমলার মনের রং মাখিয়েও তাকে বেশী উজ্জ্বল করা যাবে না।

রমলা ভাববার চেষ্টা করল। এই ঘটনার এক পক্ষ কাল পরে। কিংবা একটু বুঝি বেশী হবে। এর মধ্যে বারকয়েক রমলা জয়ন্তকে ফোন করেছে। নাগাল পায় নি। বি. এ-র খবর বেরিয়েছে। জয়ন্ত খুব সাধারণভাবে পাস করেছে তাও রমলা

দেখেছে। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা চিঠিও লিখেছিল, কোন উত্তর নেই।

মনে মনে রমলা ঠিক করেছিল একবার তার বাড়িতে যাবে। কোনদিন যায় নি, কিন্তু ঠিকানা মিলিয়ে মিলিয়ে যাওয়ার খুব অসুবিধা হবে না। জয়ন্তর মা নেই, বাবাও সব সময় বাড়িতে থাকেন না। দুপুরের দিকে গেলে হয়তো জয়ন্তকে একান্তে পাওয়া যেতে পারে। মানুষের অসুখবিসুখের কথা কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু যেতে আর হল না। তার আগেই ব্যাপারটা ঘটল।

সন্ধ্যার দিকে বারান্দার কোণে চেয়ারটা টেনে রমলা চুপচাপ বসেছিল, বেয়ারা এসে খবর দিল, জয়ন্তবাবু এসেছেন।

ওপরে নিয়ে আয়।

ওপরে আসতে বলেছিলাম দিদিমণি, কিন্তু তিনি আপনাকে নীচেই ডাকছেন।

কি ব্যাপার! এ বাড়িতে জয়ন্তর তো অবাধ গতি। এত দ্বিধা কেন, কিসের সংকোচ!

রমলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

বাইরের ঘরে নয়, মক্কেল অপেক্ষা কবার যে ছোট কামরা, তার সামনে জয়ন্ত দাঁড়িয়ে।

করিডরের আলোর কিছুটা এসে পড়েছে। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার মধ্যেই জয়ন্তর ম্লান, বিষণ্ণ চেহারাটা রমলার নজর এড়াল না। অবিন্যস্ত চুলের রাশ। ক্লান্ত, নিস্পৃহ দৃষ্টি।

কি ব্যাপার তোমার বল তো জয়? ফোনে পাওয়া যায় না, চিঠির উত্তর নেই।

মেঝের ওপর চোখ রেখে জয়ন্ত মৃদুকণ্ঠে বলল, আমি ছিলাম না এখানে।

ছিলে না? কোথায় গিয়েছিলে?

দিল্লী। আজ ফিরেছি।

দিল্লী? দিল্লী কেন?

বলছি। সব বলব বলেই তোমার কাছে এসেছি।

এস ওপরে এস। এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

না, না, ওপরে নয়, জয়ন্ত সবলে মাথা নাড়ল, আলো আমার ভাল লাগছে না। আলো আমি সহ্য করতে পারছি না। তার চেয়ে সামনের পার্কে যাবে একটু?

পার্কে? রমলা খুব দ্রুত একবার নিজের বেশবাসের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। ঠিক এভাবে সে কোনদিন বাড়ির বাইরে যায়নি। শাড়িটা বদলে নিলে হত। কিন্তু জয়ন্তও তো এভাবে কোনদিন এ বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ায় নি। জয়ন্তর নিশ্চয় কোন বিপদ হয়েছে। জয়ন্তর বিপদ তো তারও বিপদ। এ সময়ে বাইরের সাজ-পোশাকের দিকে দৃষ্টি দিতে যাওয়া অর্থহীন।

রমলা বলল, বেশ, তাই চল।

পার্কের নির্জন কোণে তুজনে বসল। একটা বেঞ্চে। পাশাপাশি।

বল কি বলবে। হাত বাড়িয়ে রমলা জয়ন্তর একটা হাত স্পর্শ করার চেষ্টা করল। নিরুত্তাপ, ঘর্মাক্ত একটা হাতের ছোঁয়ায় শিউরে উঠে হাতটা সরিয়ে নিল।

জয়ন্ত খুব আস্তে, প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় কথা বলার ভঙ্গীতে বলল, দিল্লী গিয়েছিলাম মার কাছে।

রমলা কিছু বলল না। শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করে জয়ন্তর দিকে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ জয়ন্ত কোন কথা বলল না। তার ঘন নিশ্বাসের শব্দ রমলার কানে গেল। সারা দেহ মন্থন করা তীব্র দীর্ঘশ্বাস।

কি হল, থামলে কেন? তারপর? রমলা মনে করিয়ে দিল।

হুঁ, বাবাই আমাকে পাঠিয়েছিলেন। মার সঙ্গে দরদস্তুর করার জন্য।

দরদস্তুর !

হ্যাঁ, মা এটর্নীকে দিয়ে এক চিঠি পাঠিয়েছিলেন, অনেক টাকা দাবি করে। এ টাকা পেলে তিনি নিঃশব্দে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু যে টাকা তিনি দাবি করেছেন, সে টাকা দেওয়া বাবার সাধ্যের অতীত। তাই আমাকে বাবা পাঠিয়েছিলেন যদি দাবির অঙ্ক কিছু কমাতে পারি। আত্মজকে দেখে যদি আইরিশ মহিলার হৃদয় একটু নরম হয়।

কি হল ? রমলা যেন রূপকথার কাহিনী শুনছে। হৃদয় দেওয়া নেওয়ার অতীত এক অধ্যায় এভাবে শুধু টাকা দেওয়া নেওয়ার পর্যায়ে এসে দাড়াবে, এটা ভাবতেও ভাল লাগল না। পৃথিবী কি এত নিষ্করুণ ! জয়ন্তর পাশে বসে, নিজের জীবনের উত্তপ্ত দিন-গুলোর কথা স্মরণ করে প্রেমের এই বিকৃত পরিণতির কথা যেন অবিশ্বাস্য মনে হল।

কিছু হল না। মা আমাদের কোন কথা শুনতে রাজী হলেন না। এমন কি স্পষ্টই আমাকে বললেন ভবিষ্যতে এভাবে তাঁব সঙ্গে দেখা করতে এলে, তিনি আর দেখা করবেন না। এ বিষয়ে কথাবার্তা সব কিছু তাঁর এটর্নীর সঙ্গেই বলতে হবে।

জয়ন্ত চুপ করল। এরপর রমলা তাকে কি বলবে রমলা নিজেই বুঝতে পারল না। তার ভাবতেই আশ্চর্য লাগল আইরিন জয়ন্তর বিমাতা নন, নিজের মা। জয়ন্তকে গর্ভে ধারণ করেছেন, নিজের রক্ত দিয়ে, তৃষিত মাতৃহৃদয় দিয়ে তিলে তিলে পালন করেছেন। নিজের সত্তারই অংশ, প্রাণের শরিক, তার সঙ্গে এই-ভাবে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের কথা বলতে মায়ের হৃদয় একটু কেঁপে উঠল না !

ফিরে এসে বাবাকে সব বললাম। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে চুপ করে বসে তিনি সব শুনলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তার মানে, তুমি আর আমি দুজনে নিঃশেষে মুছে যাব জয়ন্ত।

আমার সমস্ত অ্যাপারেটাস বিক্রি করে ফেলতে হবে। হয়তো কোন হাসপাতালে সামান্য একটা চাকরি নিতে হবে আমাকে। তোমাকেও উচ্চশিক্ষা দেবার কোন সম্বল আমার থাকবে না। তোমাকেও একটা চাকরি খুঁজে নিতে হবে। ঋণশোধ করার ব্যাপারে তোমাকেও সাহায্য করতে হবে। এর মানে কি জানো রম?

কি জয়?

এর মানে তোমাকে হারানো।

নিস্তেজ আর্ত কণ্ঠস্বরে রমলা শুধু বলতে পারল, আমাকে হারানো!

হ্যাঁ, তাই। কল্পনা ছিল, বি এ. পাস করে বাইরে যাব ব্যারিস্টারি পড়তে। নিজেকে তোমার যোগ্য করে তুলব, কিন্তু সে আশা আমার শেষ। সামান্য একজন গ্র্যাজুয়েট এ শহরে কি চাকরি জুটিয়ে. নিতে পারে তা তোমার অজানা নেই। আদৌ জোটাতে পারব কি না, তাতেই আমার সন্দেহ। আর যদি জোটেই, সেটা এত সামান্য, এত ভঙ্গুর হবে যে তার ওপর নির্ভর করে তোমার দিকে হাত বাড়ানো হয়তো সমীচীন হবে না। বল, আমি কি করব?

এ প্রশ্নের হঠাৎ কোন উত্তর দিতে রমলা পারে নি। এ তো নিছক কথার পিঠে কথা সাজিয়ে উত্তরের সৌধ গড়া নয়, এর মধ্যে দুজনের জীবন-মরণের প্রশ্ন নিহিত। এত সহজে, এত অনায়াসে এর উত্তর দেওয়াও যায় না।

কিন্তু জয়ন্ত রমলার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। উত্তর চায়। নিজের হৃদয়কে মেলে ধরেছে রমলার সামনে, জানতে চায় কি করবে রমলা। তার প্রিয়জনকে বাঁচাবার কি ব্যবস্থা।

রমলা প্রায় অস্পষ্টকণ্ঠে বলল, এ হতে পারে না জয়। পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাকে আমাকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

জয়ন্ত হাসল। করুণ, নিষ্প্রভ হাসি। বলল, কিন্তু আশী টাকা মাইনের বেসরকারী এক কেরানীর ঘরে কি করে তোমাকে আবাহন করি! দারিদ্র্যের কলুষ পরিবেশে কেমন করে লক্ষ্মীর আসন পাতব!

কি হল রমলা নিজেই জানে না। মনে হল ওর কণ্ঠ দিয়ে আর একজন কে যেন কথা বলল। নয়তো অত সাহস, অত দৃঢ়তা তার স্বরে কেমন করে এল, বিশেষ করে ওই স্তিমিত পরিবেশে।

তুমি বিলেত যাবার সব ঠিক কর জয়। কোন অসুবিধা হবে না।

জয়ন্ত হাসল, কেন, টাকাটা তুমিই দেবে নাকি?

ধর যদি দিই।

তোমার বাবাকে কি বলবে?

বাবাকে কিছু বলতে হবে না। কিছু টাকা আমার নিজেরই আছে। হয়তো যথেষ্ট নয়, কিন্তু তোমার তাতে কিছুদিন চলে যাবে। তারপর আশা করছি পড়তে পড়তে নিজের চালাবার মতন তুমি কিছু একটা যোগাড় করে নিতে পারবে। কি, চুপ করে রইলে যে?

দিন দুয়েক ভাববার সময় দাও। তারপর তোমাকে জানাব।

এর মধ্যে ভাববার কি আছে? আমাকে অবিশ্বাস হচ্ছে?

না, অবিশ্বাস নয়, তোমার দান গ্রহণ করার যোগ্যতা আমার আছে কি না, সেইটাই ভেবে দেখব। চল, রাত হচ্ছে। বাড়ি ফেরা যাক।

দুজনে উঠে পড়ল। আগে জয়ন্ত, পিছন পিছন রমলা। জয়ন্ত আর রমলাদের বাড়ি পর্যন্ত গেল না। পার্কের গেট থেকেই বিদায় নিল।

সে রাত্রে বাড়ি ফিরে ঘরের দরজা বন্ধ করে রমলা নিজের ব্যাঙ্কের পাসবই বের করল। প্রায় হাজার দশেক টাকা রয়েছে।

অনেক আগে রাজীব রায় তাকে ব্যাঙ্কের আলাদা একটা অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে রমলা নিতান্ত শখ করে টাকা তুলেছিল। সই মেলাবার অছিলায়। আবার টাকাটা জমা দিয়েছে। সুদে আসলে টাকাটা বেশ ভারীই হয়ে উঠেছে।

এই টাকাটা জয়ন্তর হাতে তুলে দেবে। একেবারে নয়, একটু একটু করে। তার প্রয়োজনমত। জয়ন্ত যদি মানুষ হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তা হলে রমলার যে কত বড় নির্ভর তা ভাবতেও এই মুহূর্তে তার খুব ভাল লাগল। অন্ধকার দিনেই যদি তাকে সাহায্য করতে রমলা না পারল, তা হলে এ অর্থ থাকারই বা কি সার্থকতা। যেখানে নিজের জীবন দিতে পেরেছে অসংকোচে, সেখানে কয়েক মুঠো রজতখণ্ডের আর কি দাম!

জয়ন্ত ফোন্ করল দিন পাঁচেক পরে।

একটা হালকা মেয়েদের ফ্যাশন পত্রিকা নিয়ে রমলা বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল, আর ভাবছিল জয়ন্তকে বাড়িতে ফোন করা নিরাপদ কি না, তখনই ফোনটা বেজে উঠল।

রমলা হাতলটা তুলে ধরল, হ্যালো।

আমি জয়ন্ত।

কি খবর তোমার? দু'দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একেবারে পাঁচ দিন ডুব।

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, বাবার সঙ্গে কোর্টে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। বাবার শরীরের এ অবস্থায় তাঁকে একলা ছেড়ে দিতে সাহস হয় নি।

কোর্টে? কোর্টে কেন?

মার এটর্নীর চিঠির নিষ্পত্তি করতে। টাকাটা দিয়ে দেওয়াই বাবা ঠিক করলেন। এর জন্য তাঁকে পথে দাঁড়াতে হবে, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় নেই।

শেষদিকে জয়ন্তর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হল।

রমলা কিছু বলতে পারল না। চুপচাপ ফোনটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে আস্তে আস্তে বলল, তোমার বাইরে যাওয়া কি ঠিক করলে ?

বাবার মনের এ অবস্থায় বাবাকে আব বলি নি কথাটা। তা ছাড়া বাবা কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছেন।

চলে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ, জলপাইগুড়ি। সেখানকার হাসপাতালে একটা চাকরি পেয়েছেন। আমাকে অবশ্য এখানেই থাকতে হবে। চাকরির চেষ্টা করবার জন্য।

তুমি বাইরে যাবার কি ঠিক করলে, বল ?

যাবার ইচ্ছা তো আমার ষোল আনা। কিন্তু তোমার ঋণ শোধ করব কি করে ? কত দিনে ?

পৃথিবীর সব ঋণ কি শোধ করা যায়, কথা বলতে বলতে রমলা উত্তেজিত হয়ে উঠল, মাতৃঋণ শোধ করা যায় না, প্রিয়ার ঋণও নয় ! তা ছাড়া ধরে নাও, টাকা তোমায় যৌতুক দিচ্ছি।

যৌতুক ? জয়ন্ত অবাক গলায় প্রশ্ন কবল।

রমলা নির্লজ্জ হল। সম্পূর্ণ অবাবিত করল নিজেকে। বলল, হ্যাঁ, আমাকে নেওয়ার জন্য। কন্যাপণ কন্যা নিজেই দেবে সেটাই তো সমীচীন।

অস্পষ্ট গলায় জয়ন্ত কি বলল কিছু শোনা গেল না। বোধ হয় ধন্যবাদ দিল রমলাকে, কিংবা ভালবাসার কথা বলল। ঠিক বুঝতে পারল না রমলা।

ঠিক আছে। তোমার দান আমি গ্রহণ করলাম। এবার জয়ন্ত স্পষ্টতর করল নিজের কণ্ঠ, তবে এক শর্তে।

কি শর্ত ?

তুমি এ দানের কথা কখনও কাউকে বলবে না, তা হলে আমার আর লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না।

বেশ, রাজী।

এমন কি তোমার বাবাকেও নয়।

তাঁকে বলার প্রয়োজন হবে না, কারণ টাকাটা আমার নিজস্ব। চেক কেটে আমিই যখন ইচ্ছা তুলতে পারি।

ভাল, আমি যাবার আয়োজন করছি। তার আগে একটা কথা আছে।

বল ?

তোমার সঙ্গে দেখা করতে খুব ইচ্ছা কবছে। কবে দেখা হবে ?

যেদিন তুমি ডাকবে।

আজ, আজ যদি ডাকি !

আজই যাব। বল কোথায় ?

গঙ্গার ধারে। আউটরাম জেটিতে। সাড়ে ছটার সময় আমি থাকব।

রমলা গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ছিল। জেটিতে নয়, গঙ্গার কূল ধরে ধরে দুজনে হাঁটতে শুরু করেছিল। মাঝিমাল্লাদের কোলাহল শুনতে শুনতে, জেলেডিঙির নাচ দেখতে দেখতে, নিজেদের কথা বলতে বলতে। আদরে সোহাগে জয়ন্ত ডুবিয়ে দিয়েছিল রমলাকে। তার কোন ক্ষোভ রাখে নি। জয়ন্ত প্রতিজ্ঞা করেছিল প্রতি মেলে রমলাকে চিঠি দেবে। দীর্ঘ চিঠি। ও দেশের, প্রবাসজীবনের খুঁটিনাটি সব বর্ণনা দিয়ে।

হাতে হাত রেখে দুজনে চুপচাপ বসেছিল ঘাসের ওপর। আকাশের এক চাঁদ হাজার চাঁদ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল প্রতি তরঙ্গভঙ্গে।

সাত হাজার টাকা রমলা জয়ন্তর হাতে তুলে দিয়েছিল। তাকে

সি-অফ করতে স্টেশনে এসেছিল। একগোছা সাদা গোলাপ নিয়ে।

খুব হাসি পেল রমলার। দেয়ালে মাথা রেখে সজোরে হেসে উঠল।

সান্ত্রী এপার থেকে ওপার যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি হল। হাসি কিসের?

রমলা হাসি থামাল। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলল, এমনি হাসছি বাবা। সারাজীবন তো কাঁদলাম, দুঃখের সেবা করলাম, কিছু হল না, কিছু পেলাম না। তোমাদের আশ্রয়ে এসে হাজির হলাম। 'শেষ কটা দিন একটু হাসি। একদিন তো সব কেড়ে নেবে। ক'দিনের জন্য এ হাসিটুকু আর কেড়ে নিও না।

সান্ত্রী কিছু বলল না। ভ্রূ কুঁচকে রমলাকে নিরীক্ষণ করে পায়চারি শুরু করল।

সাত হাজার টাকায় হয় নি। আরো টাকা পাঠাতে হয়েছে রমলাকে। দফায় দফায় অনেক টাকা। নিজের সব কিছু নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মিথ্যা কথা বলে বাপের কাছ থেকে নিয়েছিল। তাতেও কুলোয় নি। শেষের দিকে নিজের অলংকার বাঁধা দিয়েছে।

অপরিমিত ক্ষুধা জয়ন্তর। একবার অসুখের জন্য টাকা পাঠাতে হল। তারপর ছোট ঘর বদল করে বড় কামরা নেবে। অভিজাত পাড়ায়। তার জন্য টাকা। জয়ন্ত একটার পর একটা ছলনার আমদানি করতে লাগল, সেই অনুযায়ী রমলাও নানা পথ বের করতে শুরু করল বাপের কাছ থেকে অর্থ আহরণ করার জন্য।

জয়ন্তর মুখোস খুলে পড়ল অনেক পরে। রমলা যখন সব কিছু জানতে পারল, তখন সে শুধু নিঃস্বম্বলই নয়, একেবারে নিঃসহায়।

যাবার আগে জয়ন্ত একটা কাজ করেছিল। সৌরীন ঘোষালের সঙ্গে রমলার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। রেলস্টেশনে।

আশ্চর্য, সৌরীন ঘোষালকে চোখে দেখার আগে মনে মনে তাঁর একটি মূর্তি রমলা গড়েছিল, বাস্তবের সঙ্গে তার এতটুকু অমিল হল না। কাঁচা পাকায় মেশানো একমাথা কোঁকড়ানো চুল। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল তুটি চোখ, অধুনা বেদনায় অল্প নিষ্প্রভ। প্রশস্ত ললাট। সুগৌর বর্ণ। দীর্ঘ কাঠামো।

জয়ন্ত আর কিছু বলল না। আর কিছুও বলাও যায় না। শুধু বলল, বাবা, এই রমলা। আমরা এক কলেজে পড়তাম। ব্যারিষ্টার রাজীব রায়ের মেয়ে। আমি যেবার ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলাম, রমলা ছিল সেক্রেটারী।

সৌরীন ঘোষাল ছেলের এত কথা শুনলেন না। অর্ধেকের বেশী বোধ হয় তাঁর কানেই যায় নি। নীচু'হয়ে রমলা প্রণাম করছিল, তিনি রমলার পিঠে হাত রেখে বললেন, থাক মা থাক। তোমার হাতে সাদা গোলাপ দেখেই তোমার অন্তরের পরিচয় পেয়েছি।

কথাটার তাৎপর্য রমলা ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু প্রশ্নও করল না। বুঝতে পারল এটা সাধারণ শিষ্টাচারের একটা রীতি মাত্র। তবু মনে একটু সন্দেহ জাগল, জয়ন্ত বাপকে বলে নি তো কিছু ?

সন্দেহের নিরসন সেই দিনই হয়েছিল। বাপকে কামরায় নিজের সীটে বসিয়ে জয়ন্ত আর রমলা প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিল।

জয়ন্তই বলল।

আমি বাবাকে তোমার কোন কথা বলি নি রম! এমন কি তোমার সাহায্যদানের কথাও না। বাবা জানেন, আমি এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে বিলেত যাচ্ছি। সেখানে আমার জন্য একটা চাকরিও অপেক্ষা করছে। বাবা যেন মনে না করেন নিছক ভাল-বাসার বাঁধন ছাড়া আর কোন বাঁধন আমাদের মধ্যে আছে। পরে যখন তোমাকে আমি গ্রহণ করব, বাবা যেন না ভাবেন শুধু

কর্তব্যবোধেই তোমাকে বিয়ে করছি। তোমাকে আমি আপনার করে নেব, এই প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করেই তুমি আমার বিদেশযাত্রার সব ব্যয় বহন করছ।

রমলা কিছু বলল না। মাথা নীচু করে রইল। আসন্ন বিরহের ব্যথায় ভারাক্রান্ত মন অন্য কিছু চিন্তা করতে চাইল না। তা· ছাড়া জয়ন্ত বার বার ঋণের কথা উল্লেখ করায় সে বিব্রতই হচ্ছিল।

ট্রেনের রক্তবর্ণ পুচ্ছবিন্দু অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত রমলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। যখন খেয়াল হল, প্ল্যাটফর্ম প্রায় খালি। পাশে সৌরীন ঘোষাল দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

চল, বাড়ি চল'। গাঢ় গলা শুনে মনে হল পুত্রের বিচ্ছেদের শোক বাপের মনেও বেশ লেগেছে।

চলুন। রমলা সৌরীন ঘোষালের পাশাপাশি এগোতে শুরু করল।

স্টেশনের বাইরে এসে সৌরীন ঘোষাল বললেন, তুমি কোন্ দিকে যাবে মা? একটা ট্যাক্সি ডাকব?

না, না, ট্যাক্সি ডাকতে হবে না। আমার গাড়ি রয়েছে। আসুন, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।

সৌরীন ঘোষাল আর দ্বিরুক্তি করলেন না। ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল, নিঃশব্দে মোটরে উঠলেন। কথা বললেন অনেক পরে।

গাড়ি যখন ময়দানের পাশ দিয়ে ছুটেছে, তখন আড়চোখে রমলার দিকে চেয়ে বললেন, জয়ন্তর সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ মা?

মনে মনে হিসাব করার চেষ্টা করে রমলা উত্তর দিল, বছর দুয়েকের একটু বেশী।

হুঁ, জয়ন্ত আমার আশা আর আশ্বাস ছিল। খুব ইচ্ছা ছিল

ওকে মনের মতন করে গড়ে তুলব। কিন্তু অদৃশ্য শক্তির আকস্মিক এক আঘাতে আমি গুঁড়িয়ে গেছি মা। আমার মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। এখন নিজের পথ জয়ন্তকে নিজেই করে নিতে হবে। আমি বোধ হয় কোন সাহায্যই ওকে করতে পারব না।

খুব মৃদুগলায় রমলা বলল, আমি আপনার সব কথাই শুনেছি।

সৌরীন ঘোষাল টান হয়ে বসলেন। পলকের জন্য দুটো চোখ জ্বলে উঠল।

শুনেছ? শুনেছ সব কথা? জয়ন্ত বলেছে নিশ্চয়।

রমলা মাথা নাড়ল।

আমি পারলাম না, এ সর্বনাশ এড়াতে আমি পারলাম না।

সৌরীন ঘোষালের গলা কান্নার মত করুণ মনে হল।

আমি অনেক চেষ্টা করেছি। বহু আগে থেকেই আমি যেন বুঝতে পেরেছিলাম, এই ব্যাপার আমার জীবনে ঘটবে, কিন্তু তবু এ বিপদ রোধ করতে আমি পারলাম না। চরে দাঁড়িয়ে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম, আমার বাস্তুভিটা, আমার শেষ সম্বলটুকু বন্যার জলে অতলে তলিয়ে গেল।

রমলা সান্ত্বনা দেবার উপক্রম করতে গিয়েই টের পেল, তার কণ্ঠস্বর নিজের আয়ত্তের মধ্যে নয়। এখনই অশ্রুর স্রোতে দু'গাল ভরে যাবে। আজকে আর কারও সঙ্গে কথা বলতে রমলার ভাল লাগছে না। ঘর অন্ধকার করে কেবল জয়ন্তকে মনে করতে ইচ্ছে করছে।

সৌরীন ঘোষাল নিজেই সংযত হলেন। পরিষ্কার কণ্ঠে রমলাকে বললেন, আমি জলপাইগুড়ি চলে যাচ্ছি, তাও বোধ হয় শুনেছ?

হ্যাঁ, ওখানকার হাসপাতালে এক চাকরি নিয়ে।

খুব সামান্য এক চাকরি, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় নেই। আমার একেবারে কপর্দকহীন অবস্থা।

এ কথার রমলা কোন উত্তর দিল না। চুপচাপ বসে রইল।

সৌরীন ঘোষাল মাঝে মাঝে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে লাগলেন। তাঁরই নির্দেশে একসময়ে গাড়ি থামল। তিনি নেমে যেতে যেতে বললেন, আসি মা। জয়ন্ত গিয়েই চিঠি দেবে বলেছে। তোমাকেও হয়তো দেবে। যদি কখনও আমার চিঠি আসতে দেরি হয়, তোমার কাছে খোঁজ নেব। তোমার ঠিকানা টেলিফোন-ডাইরেক্টরি থেকেই নিয়ে নেব।

সে রাত্রেই রমলা রাজীব রায়কে জানাল।

সৌরীন ঘোষালের সঙ্গে আলাপ হল বাপী।

রাজীব রায় একটা আইনের বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলেন, চোখ তুলে বললেন, সৌরীন ঘোষাল?

জয়ন্তর বাবা।

ও, যিনি ডাক্তার, তাই না? ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে তো ডিভোর্স হয়ে গেছে।

রমলা বিস্মিত হল, তুমি, তুমি কি করে জানলে বাপী?

তোর বাপী যে কোর্টে প্র্যাকটিশ করে সে কথা বুঝি তুই মাঝে মাঝে ভুলে যাস রমি। এটর্নীপাড়ার খবর আগে আমাদের কানে আসবেই। তা ছাড়া আমার বন্ধু সতীশ মিত্রই তো আইরিন ও হারার এটর্নী। সৌরীন ঘোষালকে অনেক টাকা দিতে হয়েছে। প্রায় একজীবনের রোজগার। যাক, তবু এই দুঃসময়ের মধ্যেও বুদ্ধি করে ছেলেটাকে বাইরে পাঠালেন। তবে কোর্টে ব্যারিস্টারের যা ভিড়, খুব ক্ষমতা না থাকলে ঠেলে ওঠাই দুষ্কর।

চেয়ারে হেলান দিয়ে রমলা চুপ করে বসে রইল। রাত্রির আকাশে নক্ষত্রের ছিটে। এমনি নক্ষত্রালোকিত আকাশের তলা দিয়ে উল্কার বেগে ছুটে চলেছে যন্ত্রদানব। হয়তো জানলায় মাথা রেখে তারই কথা ভাবছে জয়ন্ত। ছড়ানো ছিটোনো হাজার কথা।

একদিন জয়ন্ত ফিরে আসবে। গ্রন্থিবন্ধনের প্রত্যাশা নিয়ে। সেই মধুর লগ্নের কথা চিন্তা করেও রমলা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

মনে মনে প্রার্থনা করল, কোনদিন যেন তাদের জীবনে আইরিন ও হারার অভিশাপ না নামে।

প্রথম চিঠি এল অনেক পরে। চিঠির প্রতি ছত্রে ক্ষমা প্রার্থনার সুর। নতুন জায়গায় গিয়ে থাকার বন্দোবস্ত করতে, কলেজে ভরতি হতে দেরি হয়ে গেল। রমলা যেন কিছু মনে না করে।

না, কিছু মনে করবে না রমলা। এমন মিষ্টি চিঠি যে লিখতে পারে তার ওপর রাগ করা যায় না। চিঠিটা হাতে পেয়েই রমলার সব চেয়ে প্রথমে মনে পড়ল সৌরীন ঘোষালের কথা। তাঁকে একবার খবরটা দেওয়া দরকার। সম্ভবতঃ তিনিও চিঠি পেয়েছেন। তবু রমলা ঠিক করল তাঁকে একবার জানাবে।

টেলিফোনের সামনে বসে ডাইরেক্টরিটা ওলটাতে গিয়েই রমলার মনে পড়ে গেল। চেম্বার বন্ধ। টেলিফোন বোধ হয় আর নেই। কিন্তু বাড়িতেও তো ফোন ছিল। সেখানে সৌরীন ঘোষালকে পাওয়া যেতে পারে।

রমলা ডায়াল করল। কোন উত্তর নেই। বোধ হয় কেউ নেই বাড়িতে। বিকেলের দিকে সোজা চলে গেলেই ভাল। অনেকদিন সৌরীন ঘোষালের সঙ্গে দেখাও হয় নি।

চিঠিটা রমলা সঙ্গে নিল, কিন্তু মনে স্থির জানত, এ চিঠি সে কাউকে দেখাতে পারবে না। এ চিঠি কাউকে দেখানো যায় না। এ শুধু ওর চিঠি। সেই জন্যই বুঝি বুকের ঠিক মাঝখানে রেখেছে চিঠিটা।

দরজার কাছে গিয়েই রমলা বুঝতে পারল সৌরীন ঘোষাল এ বাড়িতে নেই। নতুন এক নেমপ্লেট লাগানো। বি. আর. আগর-ওয়ালা।

এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন সৌরীন ঘোষাল। বোধ হয়

ছেলেকে তুলে দেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই নিজে জলপাইগুড়ি রওনা হয়ে গিয়েছেন। স্ত্রী নেই, ছেলেও সরে গেল দূরে, কলকাতার মাটি আঁকড়ে থাকবার কোন আকর্ষণই রইল না।

রমলা ট্যাক্সি করে গিয়েছিল। ট্যাক্সি ছাড়ল না। এমন অপরূপ সন্ধ্যায়, বুকের মধ্যে এ লিপি বহন করে এখনই গৃহ-কোটরে ফিরতে তার ইচ্ছা করল না। গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলে হয়। যেখানে দুজনে সে রাতে বসেছিল।

গঙ্গার ধারে গিয়ে রমলা ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। এদিকে ওদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে। অন্তরীক্ষে অবশ্য তারার দীপালী।

রমলা জেটির ওপর গিয়ে দাঁড়াল।

কিছু লোকের ভিড়। কেউ বসেছে জোড়ায় জোড়ায়। কেউ ঘোরাফেরা করছে। একেবারে জলের ধারে গিয়ে রমলা দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক কথা মনে এল। অর্থহীন কল্পনা। হয়তো এমনি সময়ে জয়ন্তও দাঁড়িয়ে আছে টেম্স্-এর কূলে। গঙ্গা আর টেম্স্-এর জলে তরঙ্গময় অন্তরঙ্গতা। দুটি নদীর মতন দুটি প্রাণও মিশে যাচ্ছে।

কতক্ষণ এভাবে রমলা দাঁড়িয়ে থাকত তার স্থিরতা নেই, হঠাৎ পিছনে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার, রমলা দেবী, আপনি?

রমলা দেবী! সত্যিই রমলার হাসি পেল।

দুটো হাত জোড় করে রমলা কপালে ঠেকাল।

ব্যাঙ্গালোর থেকে কবে ফিরলেন?

শান্তনু সরে এসে রমলার পাশে দাঁড়াল।

ব্যাঙ্গালোর থেকে তো অনেকদিন ফিরেছি।

অনেকদিন ফিরেছেন? এর মধ্যে একবার দেখাও করতে যান নি! রমলা কণ্ঠস্বরে অভিমানের প্রলেপ মাখাল।

এইখানেই রমলা হার মানে। কিছুতেই বুঝতে পারে না নিজেকে। মনের অন্তঃস্থল পর্যন্ত হাতড়ে দেখেছে, কোথাও শান্তনুর চিহ্নমাত্র নেই। থাকতে পারে না। কিন্তু শান্তনুর কাছাকাছি এলে দুর্দম এক বাসনা তাকে গ্রাস করে। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করে। অন্তরঙ্গ হবার কৃত্রিম এক প্রয়াস।

এর উৎস কোথায় তাও রমলা ভেবেছে। শান্তনুর ঔদাসীন্যই তার সম্বন্ধে রমলাকে এত কৌতূহলী করে তোলে। আধুনিক যুগে বিগত যুগের মন নিয়ে এসেছে শান্তনু, তার রীতিনীতি, চিন্তাধারা সবই প্রাচীনপন্থী। তাই বার বার নিস্পৃহতার দেয়ালে সবেগে রমলা আঘাত করতে চায়। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, সেই প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করা।

শান্তনু হাসল, আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি, আপনাদের বাড়িতেও যেতে পারি নি, কিন্তু কাকাবাবুর অফিসে গেছি বারদুয়েক।

কই বাপীও তো কিছু বলে নি।

আমার যাওয়াটা এমন কিছু একটা বিখ্যাত ঘটনা নয়, যে আড়ম্বর করে বলতে হবে। আমি তাঁর কাছে আইনের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলাম।

আইনের পরামর্শ ?

আমার ব্যক্তিগত কিছু নয়, অফিসের ব্যাপারে।

রমলা প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করল।

আপনি যে হঠাৎ গঙ্গার ধারে ?

শান্তনু গঙ্গার ওপারে চোখ ফেরাল। আকাশের পটে কালো কালো চিমনির কাঠামো। দু'একটা থেকে ধোঁয়ার রাশি আঁকা-বাঁকা রেখায় ওপরে উঠছে। ছোট্ট একটা ডিঙি স্টীমারের দোলা থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

চোখ না ফিরিয়েই শান্তনু বলল, এই একটি নদীকে আমি ভালবাসি। সব নদীই পবিত্র, কারণ তারা নিজেকে উৎসর্গ করে

গড়ার কাজে। বহন করে আনে পলিমাটি, দুপাশের নগরীর সমৃদ্ধির পত্তন করে। কিন্তু গঙ্গার দাবি আরো বেশী। আমরা সবাই গাঙ্গেয় সভ্যতার ফল। আমাদের অতীত উপাখ্যানে এই নদীর মহিমা বিধৃত হয়েছে। আমাদের সব কিছু পুণ্যকর্ম গঙ্গার পবিত্র জল ছাড়া সম্ভব হয় না।

রমলা একদৃষ্টে শান্তনুর দিকে চেয়ে রইল। এই শান্তনুকে সে চেনে। একে চিনতে তার কোন অসুবিধা হয় না। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, কিছুটা বুঝি বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক সত্তা।

তাই সময় পেলেই আমি এখানে এসে দাঁড়াই।

রমলা কিছু বলল না। মনে মনে শুধু অস্ফুট মন্ত্রপড়ার ভঙ্গীতে বিড়বিড় করল, এ জায়গাটা আমার কাছেও খুব পবিত্র। যাবার আগে জয়ন্ত আর আমি পাশাপাশি বসেছিলাম। সে ফিরে এলে আবার আমরা বসব। তখন জয়ন্ত আরো কাছের মানুষ হবে। এখান থেকে উঠে দুজনকে আলাদা বাড়িতে যেতে হবে না। দুজনের গৃহ তখন এক হবে।

রমলা কিছুক্ষণ পরে সরে এল জলের ধার থেকে। শান্তনুর দিকে ফিরে বলল, রাত হয়ে যাচ্ছে, এবার আমি বাড়ি যাব।

শান্তনু কিছু বলল না। রমলার সঙ্গে সঙ্গে জেটি পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

রমলা রাস্তা পার হবার চেষ্টা করতেই শান্তনু বাধা দিল, আমার সঙ্গে গাড়ি রয়েছে। আপনাকে নামিয়ে দিতে আমার কোন অসুবিধা হবে না।

গাড়িতে উঠে রমলার মনে হল ভদ্রতার খাতিরে একবার শান্তনুকে তাদের বাড়িতে যেতে বলা উচিত। কিন্তু বলি বলি করেও বলতে পারল না। গঙ্গার ধার থেকে সরে আসতে তার কেবলই মনে হতে লাগল, জয়ন্তর স্মৃতির সান্নিধ্য থেকে ক্রমেই যেন সে দূরে সরে যাচ্ছে। বার বার পিছন ফিরে রমলা সেই

জায়গাটা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না।

এবার তো আপনার ফাইনাল ইয়ার। শান্তনু রমলার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করল।

রমলা মুখ ফেরাল, হ্যাঁ, এবার আমার ফোর্থ ইয়ার।

পাস করার পরে আরো পড়বেন নাকি?

এখন কিছু ভাবি নি। আগে পাসই করি। আপনার কি মত, আরো পড়া উচিত, মানে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার আপনি পক্ষপাতী?

শান্তনু ভ্রূ কোঁচকাল, আমার মতামতের, মূল্য কি বলুন। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তো আমার কোন হাত নেই। তা যদি থাকত।

মাঝপথেই শান্তনু থেমে গেল।

কি, থেমে গেলেন যে?

শান্তনু মাথা নাড়ল, না, সত্য কথা সর্বদা বলা উচিত কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলা নীতি-সম্মত নয়।

আপনি জীবনে বুঝি খুব নীতি মেনে চলেন?

দুর্নীতির অন্ততঃ প্রশ্রয় দিই না।

আপনি শিক্ষামন্ত্রী হলে বোধ হয় মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা আইন করে বন্ধ করে দিতেন?

রমলার কণ্ঠ শাণিত ব্যঙ্গে ঝলসে উঠল।

না, তা করতাম না। তবে পুরুষ আর নারীর জন্য একধরনের শিক্ষাব্যবস্থা রাখতাম না।

তাই নাকি? মেয়েদের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা করতেন?

যে ধরনের ব্যবস্থায় গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, অরুন্ধতীর বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

সেই ধরনের শিক্ষার ধারা এ যুগে কার্যকরী হবে কিনা এমন

একটা কথা বলতে গিয়েই রমলা থেমে গেল। পাশ ফিরতে গিয়েই বুকের মধ্যে খচ করে উঠল। জয়ন্তর চিঠিটা। চিঠি নয়, ওটা যেন জয়ন্তেরই অস্তিত্ব ঘোষণা করল। মনে মনে বলল, আজ এসব বৃথা তর্ক থাক। কোন্ যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ভাল, তাই নিয়ে কথার ফুলঝুরি জ্বালানো। আজ কেবল তুমি আর আমি। দুজনে মুখোমুখি বসব। রাত্রির অন্ধকারে তোমার শয্যাপ্রান্তে এসে বসব। হাত রাখব তোমার একরাশ কাল চুলের ওপর। চোখের ওপর চোখ রেখে অন্তহীন সময় ধরে কেবল ভালবাসার কথা বলব। বাজে কথা, অন্য লোকের কথা আজ নয়।

সত্যি সত্যিই রমলা থেমে গেল। জানলা দিয়ে রাতের কলকাতার দৃশ্য দেখল। এই সময় কলকাতার নটীর রূপ। অভিসার-মত্তা বিলাসিনীর।

মাস ছয়েকের মধ্যে চারখানা চিঠি এল। শেষ চিঠিতেই জয়ন্ত খবরটা দিল।

ফেনচার্চ এভিনিউ থেকে বেরোবার মুখেই দেখা হয়ে গেল। কনকনে ঠাণ্ডা। আকাশের রং শ্লেটের মতন ফ্যাকাশে। ওভার-কোটের পকেটে দু'হাত ডুবিয়ে জয়ন্ত রাস্তা পার হচ্ছিল, একে-বারে মুখোমুখি দেখা। একহাতে শপিং বাস্কেট, অন্য হাতে একটা খবরের কাগজ, বোধ হয় বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, জয়ন্তকে দেখে ছুটে এলেন।

Hallo, my boy, তুমি, তুমি এখানে!

জয়ন্ত একটু চমকে গিয়েছিল। আশা করে নি লণ্ডনের পথে এভাবে আইরিন ও হারার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

Hallo mummy বলতে গিয়েও জয়ন্ত সামলে নিল নিজেকে। শুধু বলল, Hallo, তুমি যে এখানে?

আমি কাজ করি এখানে। পিটারসন কোম্পানিতে। তুমি এখানে কেন তাই বল?

আমি আইন পড়ছি।

আমাকে টাকা দেবার বেলায় বুঝি তোমার বাপের যত কান্নাকাটি। তোমাকে এত দূর দেশে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাবার টাকাটা তো ঠিক বেরোয়। ইণ্ডিয়ানদের চেনা মুশকিল।

জয়ন্ত লিখেছে, আমি আর থাকতে পারলাম না। ইচ্ছা করল সেই মুহূর্তে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করি। তাতেও কিছু সুরাহা হত না। বাবার সম্বন্ধে মিথ্যা একটা ধারণা মার মনে থেকে যাবে, তাই বললাম, বাবার পক্ষে কোন টাকা দেওয়া সম্ভব হয় নি। বাবা চেম্বার তুলে দিয়েছেন, সামান্য একটা চাকরি নিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গিয়েছেন।

আইরিন কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে একপা একপা করে জয়ন্তর দিকে এগিয়ে এলেন। তার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে মৃদুকণ্ঠে বললেন, I am sorry, my child. তা হলে তোমাকে এখানে পাঠানোর খরচ কে দিল?

জয়ন্ত আর থাকতে পারল না। বলল, আমার এক girl friend দিয়েছে।

তোমার গার্ল ফ্রেণ্ড? Indeed? সেই কে একজন ব্যারিস্টারের মেয়ের সঙ্গে তোমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, সেই বুঝি?

হ্যাঁ।

নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, ফিরে গিয়ে তাকে তোমার বিয়ে করতে হবে। আজকাল ভারতীয় মেয়েরা খুব কিন্তু হিসেবী হয়ে গিয়েছে।

এ কথার জয়ন্ত কোন উত্তর দেয় নি। পাশ কাটাতে চেয়েছিল কিন্তু আইরিন ছাড়েন নি।

তুমি এখানে কোথায় আছ?

জয়ন্ত নিজের ঠিকানা দিয়েছিল।

আমার বাসার খুব কাছে। টিউবে মিনিট দশেকের ব্যাপার। এসো না একদিন। আমাকে বরং ফোন করে এসো। এই নাও কার্ড।

শপিং বাস্কেট থেকে আইরিন একটা কার্ড বের করে দিয়েছিলেন।

চিঠিটা হাতে দিয়ে রমলা অনেকক্ষণ বসে রইল। আইরিনকে এড়ানো গেল না। ভারতবর্ষের মাটি থেকে জয়ন্তকে দূরে সরিয়ে দিয়েও নয়।

আইরিন ও হারা রমলার জীবনের শনি। আগে এসব রমলা বিশ্বাস করত না। গ্রহ আর গ্রহশান্তির ব্যাপার। পরীক্ষার সময় মেয়েরা গোমেধ, পলা আর নীলার আংটি পরত। পরীক্ষা-সমুদ্র পার হবার তরণী হিসাবে। অনেক মেয়ে রমলাকেও বলেছে কোন রত্ন ধারণ করতে। কোন জ্যোতিষী বুঝি নির্দেশ দিয়েছেন। রমলা হেসেছে। বলেছে, না ভাই, যদি ডুবি তো এমনই ডুববো, গলায় আর পাথর বাঁধতে পারব না।

কিন্তু আজ পরমায়ুর এই অপরাহ্নে সব কিছু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে। নয়তো ব্যারিস্টার রাজীব রায়ের মেয়ের শেষ জীবন কাটবে কারাকক্ষে, এ কোন্ বিধান। অলক্ষ্যে গ্রহ উপগ্রহের কারসাজি না থাকলে এ কখনও সম্ভব হতে পারে না।

অন্ধকার নামছে চারদিকে। সন্ধ্যার অন্ধকার নয়, আকাশে মেঘের স্তবক জমেছে। কি মাস এটা? মনে মনে রমলা হিসাব করার চেষ্টা করল। আষাঢ় না শ্রাবণ? ধারাবর্ষণের ঋতু।

সেদিনও বোধ হয় এমনই আসন্ন-বর্ষণ এক প্রদোষ। জানলার কাঁচের শার্সি বন্ধ করে রমলা ঘরে বসেছিল। একটু বোধ হয় অন্যমনস্কই ছিল। জয়ন্তর কথা ভাবছিল।

এর মধ্যে জয়ন্তর আর একটা চিঠি এসেছিল। সে চিঠিতেও

আইরিন ও হারার ছায়া। এবার ছায়া আরো গাঢ়। আইরিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন জয়ন্তকে নিজের ফ্ল্যাটে। ল্যাণ্ডলেডির কাছে নিজের ছেলে বলেও পরিচয় দিয়েছিলেন। একান্তে জয়ন্তকে এমন কথাও বলেছিলেন, ভারতীয় মেয়ের সব ঋণ আইরিন শোধ করে দেবেন, শুধু জয়ন্ত এ দেশেই থাকুক। তাঁর সন্তান হয়ে। ইংল্যাণ্ডে অসুবিধা হয়, ছেলেকে নিয়ে আইরিন আয়ার্ল্যাণ্ডে চলে যাবেন। ডাবলিনে তাঁর আত্মীয়ের এক ব্যবসা আছে, তাতে ঢুকিয়ে দেবেন জয়ন্তকে।

জয়ন্ত এ কথাও লিখেছে, আইরিন এসব করবেন নিছক মাতৃ-স্নেহবশতঃ নয়, সৌরীন ঘোষালের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য। তাঁর ধারণা, সৌরীন ঘোষাল এখনও সর্বস্বান্ত হন নি। কৃতী ছেলের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়াবার প্রত্যাশায় দিন গুনছেন। জয়ন্তর ভারতীয় মেয়ের ঋণ দেওয়ার কাহিনী আইরিন বিশ্বাস করেন নি। ছেলে বাপকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। বাপের কাছ থেকে ছেলেকে সরিয়ে নিতে পারলে বাপের ওপর চরম আঘাত হানা হবে। এ শক্তিশেলের তেজ সৌরীন ঘোষাল সহ্য করতে পারবেন না। আরো কিছু অর্থ দিয়ে তিনি ছেলের মুক্তি ক্রয় করবেন।

অনেক, অনেকবার রমলা লাইনগুলো পড়েছে। আইরিন নারী, সেও নারী একথা ভাবতেও তার বুক ঘৃণায় আবিল হয়ে উঠেছে। মাতৃত্ব যা রমণীকে দেবীত্বে রূপান্তরিত করে সে মাতৃত্বও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে এ যেন তার ধারণারও অতীত।

জয়ন্ত আইরিনের কথার কোন উত্তর দেয় নি। মাথাধরার অজুহাতে একটু পরেই পালিয়ে এসেছে। ফিরেই রমলাকে চিঠি লিখতে বসেছে। এই সঙ্গে বাপকেও চিঠি লিখেছে, কিন্তু তাঁর কাছে আইরিনের কোন কথা লেখে নি। লেখা সম্ভব নয়। যদি কোনদিন কোনখানে সৌরীন ঘোষালের সঙ্গে রমলার দেখা হয়ে

যায়, ঘুণাক্ষরেও যেন এ কথা সে তাঁকে না বলে। তাঁর শরীর বহু আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, এ আঘাত তাঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে না।

দরজার কাছে গোলমাল হতে রমলা চমকে উঠে দাঁড়াল। অনেকগুলো লোকের কণ্ঠস্বর। বিনুর মাব গলাও শোনা গেল।

দরজার কাছে গিয়েই রমলা চীৎকার করে উঠল। আঁচলটা মুখে চেপে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তুজন লোক রাজীব রায়কে ধরাধরি করে ওপরে নিয়ে আসছেন। এপাশে ওপাশে আরো কিছু লোক জমেছে। বাড়ির ঝি, বেয়ারা, ঠাকুর তো রয়েইছে।

কি হয়েছে, বাঁপীব কি হয়েছে?

একটি ভদ্রলোক হাত নেড়ে বমলাকে শান্ত হতে বললেন।

রাজীব রায়কে তাঁর শয়নকক্ষে নিয়ে যাওয়া হল।

রমলা ছুটে গিয়ে বাপেব মাথাব কাছে বসল। ঝুঁকে পড়ল তাঁর বুকের ওপর।

আর একটি ভদ্রলোক রমলাব পিঠে হাত রাখলেন। রমলা ফিরে চাইতে হাত নেড়ে ডাকলেন।

রমলা উঠে জানলার ধারে দাঁড়াল।

মিস্টার রায় কোর্টে আর্গুমেন্ট করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তখনই ডাক্তার ডাকা হয়েছিল। ডাক্তার বললেন প্রেসারটা খুব বেশী। অত্যন্ত খাটুনি হচ্ছে। আমাদেরও তাই মত। মিস্টার রায় অত্যধিক পরিশ্রম করেছেন। কিছুদিন আগে সেসন্‌স্‌-এর কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আমরা সবাই বলেছিলাম কিছুদিনের জন্য বাইরে যেতে। তাও তো গেলেন না। ওঁর বিশ্রাম করা বিশেষ প্রয়োজন। তুমি এইটুকুর ভার নাও মা, ওঁকে একেবারে খাটতে দেবে না। রেস্ট, সম্পূর্ণ রেস্ট ছাড়া ও রোগের অন্য কোন ওষুধ নেই।

রমলা একাগ্রচিত্তে শুনে গেল। একটি কথাও না বলে। এমন যে হবে কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি। এ যেন বিরাট এক সৌধের ভিত ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া, বিরাট একটা বনস্পতির নিশ্চিহ্ন হওয়া।

কথাটা মনে হতেই রমলা চোখে আঁচল চাপা দিল। এসব কথা কেন সে ভাবছে! ওই তো বাপী চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আবার উঠবেন। আবার রমলাকে ডাকবেন স্নেহসিক্ত কণ্ঠে। সব ঠিক হয়ে যাবে। অন্ধকার মুছে সূর্যের আলোয় দশদিক ঝলমল করবে।

ভদ্রলোকেরা যাবার সময় রমলাকে উপদেশ দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন তাঁরা মাঝে মাঝে দেখতে আসবেন। কোন ভয় নেই। ঈশ্বর করুণাময়। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সকলে চলে যেতে রমলার যেন নিজেকে বড় অসহায় মনে হল। রাজীব রায় চোখ বন্ধ করে রয়েছেন। দ্রুত নিশ্বাসের ছন্দে দেহ স্পন্দিত হচ্ছে। কতক্ষণ, কতক্ষণ পরে তিনি চোখ মেলবেন কে জানে!

বিনুর মাই প্রথমে কথা বলল, বাড়ির ডাক্তারকে একবার খবর দিলে হত না দিদিমণি? তিনি এসে একবার দেখে গেলে পারতেন।

সত্যি। এ কথাটা রমলার মনেই হয় নি। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বোসকে ফোন করে দিল। ডাক্তার চেম্বারে নেই। কোথায় বেরিয়েছেন। কম্পাউণ্ডার ফোন ধরেছিল। নাম-ধাম সব লিখে নিল। ডাক্তার এলেই আসতে বলবে।

তারপর রমলার কি মনে হল কে জানে। ঘড়ির দিকে একবার চোখ তুলে দেখে আবার টেলিফোন তুলল।

ডায়াল করার পর বলল, একটু শান্তনু বোসকে দেবেন দয়া করে?

একটু পরেই তারের ও প্রান্ত থেকে শান্তনুর গম্ভীর গলা ভেসে এল, হ্যালো।

আমি রমলা, রমলা কথা বলছি।

অনেক চেষ্টা করেও রমলা গলার কম্পন বন্ধ করতে পারল না।

রমলা দেবী, কি খবর ?

আপনি অফিস-ফেরত একবার আসতে পারবেন ?

আজকে ?

হ্যাঁ।

কি ব্যাপার বলুন তো ?

বাবা কোর্টে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। এখনও কথা বলছেন না। কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে রয়েছেন।

সে কি! আমি এখনই আসছি।

শান্তনু টেলিফোন ছেড়ে দিল।

মিনিট চল্লিশের মধ্যে শান্তনু এসে পড়ল। রমলা একভাবে রাজীব রায়ের মাথার কাছে বসে রয়েছে। রাজীব রায়ের দুটি চোখ নিমীলিত।

আসব ? শান্তনু দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

আসুন। রমলা উঠে দাঁড়াল।

শান্তনুর পিছন পিছন আর একটি ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। অনেকটা যেন বাড়তি লোকটির উপস্থিতির কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গীতে শান্তনু বলল, ইনি আমাদের অফিসের ডাক্তাব রাহা। আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

রমলা বলল, ভালই করেছেন। আমি আমাদের বাড়ির ডাক্তারকে ফোন করেছিলাম আসবার জন্য, তিনি 'কল'-এ বাইরে গেছেন।

ডাক্তার রাহা অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। নাড়ি, প্রেসার, চোখের তলা। স্টেথস্কোপ পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, খুব সাবধানে রাখতে হবে রোগীকে। নড়াচড়া একেবারে বন্ধ। বাড়িতে মেয়ে-ছেলে আর কে আছেন ? মানে রোগীর আত্মীয়।

আমি ওঁর মেয়ে। আমিই আছি।

থেমে থেমে, আস্তে আস্তে রমলা বলল।

তা হলে একটা নার্সের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। দুজন হলেই ভাল। দিনে একজন, রাত্রে একজন।

রমলা শান্তনুর দিকে চোখ ফেরাল, আমার কলেজ তো এখন ছুটি। আমিই সেবা করতে পারি। নার্সের কি দরকার?

শান্তনু মাথা নাড়ল, শুনলেন তো পরিচর্যার জন্য সর্বদা একজন দরকার। সারাক্ষণ আপনি থাকবেন কি করে? মিস্টার রাহা, আপনি অন্ততঃ রাত্রের নার্সের একটা বন্দোবস্ত করুন।

একটু পরেই ডাক্তার রাহা বেরিয়ে গেলেন।

রমলা আর শান্তনু রাজীব রায়ের বিছানার দু'পাশে বসল।

খুব মৃদু গলায় রমলা কথা বলল, একটু বসুন শান্তনুবাবু, আমি আপনার জলখাবারটা আনতে বলে দিই।

আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি যা খাবার অফিস থেকেই খেয়ে এসেছি। আপনি বরং রাতের খাওয়ার কথাটা বলে আসুন। আমি এখানে আজ খেয়ে যাব। এভাবে আপনাকে ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

রমলা কৃতজ্ঞচিত্তে একবার শান্তনুর দিকে চেয়েই চোখ নামাল। সত্যি রমলা যে কত অসহায় তা এই মুহূর্তে সে বুঝতে পেরেছে। ঝি-চাকরের সংসার। তাদের কাজের ফরমাশ করা যায় কিন্তু তাদের ওপর নির্ভর করা যায় না।

একজন পুরুষমানুষ থাকলে অনেকটা ভরসা। যতক্ষণ শান্তনু থাকে ততক্ষণই ভাল।

রাজীব রায় কথা বললেন রাত আটটার পর। শান্তনু পুজো সেরে ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় রাজীব রায় চোখ খুলে এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, রমি!

বাপী! রমলা বাপের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

ক্লান্ত একটা হাত দিয়ে রাজীব রায় রমলার একটা হাত ধরলেন। মৃত্নকণ্ঠে বললেন, কোর্টে মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল মা। শরীরটা বড় দুর্বল ঠেকছে।

তুমি আর কথা বল না বাপী। ডাক্তার তোমায় চুপ করে শুয়ে থাকতে বলেছেন।

ডাক্তার, ডাক্তার বোস এসেছিলেন?

না বাপী, ডাক্তার বোসকে পেলাম না। শান্তনুবাবু তাঁর অফিসের ডাক্তারকে সঙ্গে এনেছিলেন।

রাজীব রায় এদিক ওদিক চোখ ফেরালেন। নিস্তেজ গলায় বললেন, শান্তনু,•শান্তনু এসেছিল?

হ্যাঁ, বাপী, আমিই খবর দিয়ে আনিয়েছি। তিনি রয়েছেন এখনও।

শান্তনু আস্তে আস্তে এগিয়ে রাজীব রায়ের বিছানার পাশে দাঁড়াল। রাজীব রায় কোন কথা বললেন না। নিষ্পলকনেত্রে তার দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ বেয়ে অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল।

শান্তনু একটা হাত বাড়িয়ে রাজীব রায়ের একটা হাত চেপে ধরে বলল, আপনি ঘুমাবার চেষ্টা করুন কাকাবাবু। আমি রয়েছি।

রাজীব রায়ের শোবার ঘরের সামনেই শান্তনুর খাবার বন্দোবস্ত করা হল। যাতে রমলা বাপের বিছানায় বসে তদারক করতে পারে।

খুব দ্রুত শান্তনু খাওয়া সেরে নিল। উঠে রমলার কাছে এসে বলল, আপনি আর দেরি করবেন না। খেয়ে নিন। আমি কাকাবাবুর কাছে রয়েছি।

রমলা আপত্তি করল, এত তাড়াতাড়ি আমার খাওয়ার অভ্যাস নেই। আমি না হয় একটু পরেই খাব।

পুরোনো অভ্যাস সব ছেড়ে দিতে হবে। নতুন যে সমস্যার উদ্ভব হল, তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে আপনাকে। আপনার কষ্ট হয়তো হবে কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় নেই।

শান্তনুর গলার স্বরের দৃঢ়তা দেখে রমলা আশ্চর্য হল। এক নিমেষে শান্তনু যেন রমলার অভিভাবক হয়ে উঠল।

তবু এই শাসনের সুরটুকু রমলার ভাল লাগল। এমনই সময়ে, যখন নিজেকে একান্ত অসহায় মনে হয়, তখন এমন একটা অবলম্বনের খুব প্রয়োজন। নির্ভর করার প্রাচীর যত দৃঢ় হয় ততই মঙ্গল।

রমলা খাওয়া শেষ করে বাপের ঘরে ঢুকে দেখল বিছানায় বসে শান্তনু এক মনে রাজীব রায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

ঘরে নীল বাতির আবছা আলো, সেই অস্পষ্ট আলোতে মানুষটার স্বরূপ যেন ফুটে উঠেছে। আধুনিক মেকী সভ্যতার কোন ছোঁয়াচ লাগে নি, এ যুগের মাপকাঠিতে হয়তো অচল, কিন্তু খাঁটি হীরে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজীব রায় ঠিক কথাই বলেছিলেন।

নিছক কর্তব্য করে যাচ্ছে সেবাপরায়ণ এই মূর্তি দেখে কিছুতেই তা মনে হয় না। বরং মনে হয়, কোথাও ছলনার ছিটেফোঁটা নেই। এই সেবার উৎস প্রাণের গভীরে যেখানে কপটতার ছায়া-মাত্র নেই।

কেমন আছেন? জেলার বাইরে থেকে প্রশ্ন করল।

রোজ সকালে বিকেলে রমলাকে এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্নের ধরন দেখেই বোঝা যায়, এর উত্তর কেউ চায় না। শুষ্ক কর্তব্য। জেলের রুটিন-বাঁধা নিয়ম।

উদাস দৃষ্টি মেলে রমলা বসে রইল।

জেলার আরো কাছে এসে দাঁড়াল, কি ভাবছেন?

কি ভাবছে রমলাই কি জানে। এ ভাবনার বুঝি তল নেই, কুলকিনারা নেই। চুপচাপ বসে থাকলেই চিন্তার দৈত্যগুলো চারদিক থেকে ছুটে আসে। দুর্দম বেগে চেপে ধরে শ্বাসনলী। দম বন্ধ হয়ে আসে। চীৎকার করার উপায় থাকে না। যন্ত্রণায় ছটফট করতে হয়। তবু তারা আসে। রমলা একটু নিঃসঙ্গ হলেই ছুটে আসে দল বেঁধে।

এসব বাজে চিন্তা ছেড়ে আসল চিন্তা করুন। হঠাৎ জেলার দার্শনিক হয়ে উঠল।

এইবার রমলার হাসি পেল। আসল চিন্তা মানে ওপারের চিন্তা। যে পারের কোন অস্তিত্ব নেই। অলীক কল্পনার ওপর যার ভিত্তি। স্বর্গরাজ্যের যে বর্ণনা প্রাজ্ঞজনেরা দিয়েছেন তা নিছক মোগল হারেমের ছায়া। চিরযৌবনা অপ্সরা, অশেষ বসন্ত, পারিজাত, সুধাক্ষরা মন্দাকিনী। এসবের স্পর্শ রমলা এপারেই পেয়েছে। ভোগসুখের চরম। তাতে মন ভরে নি, দেহ ক্লান্ত হয়েছে।

স্বর্গরাজ্যে রমলার একটুও লোভ নেই।

সেদিন কিন্তু স্বর্গরাজ্যের একটুকরো ছবি চোখের সামনে দেখেছিল। ভোগের স্বর্গ নয়, ত্যাগ আর তিতিক্ষার স্বর্গ। যে স্বর্গ অনাবিল আনন্দের নিকেতন।

রমলা ঘরে এসে দাঁড়াতেও শান্তনুর খেয়াল হয় নি। একমনে রাজীব রায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে চলেছে।

এবার উঠুন, আমি বসছি।

শান্তনু সরল না। জিজ্ঞাসা করল, কটা বেজেছে দেখুন তো।

রমলা টেবিলের ওপর রাখা ঘড়িটা দেখল, তারপর বলল, নটা বাজে।

তা হলে ওষুধ খাওয়াতে হবে এইবার। লাল ওষুধটা। পারবেন, না আমি উঠব ?

এ কথার রমলা উত্তর দিল না। গ্লাসে ওষুধ ঢেলে বাপের ঠোঁটের কাছে ধরল।

ওষুধ খাওয়ানো শেষ করে রমলা কি একটা বলতে গিয়েই থেমে গেল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ডাক্তার বোসই বোধ হয় এলেন

দিদিমণি। পর্দার পিছন থেকে বিনুর মা ডাকল।

রমলা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, কি ?

ইনি এসেছেন। বিনুর মা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল।

বারান্দার মাঝখানে একটি নার্স। কড়া 'ইস্ত্রির পোশাক। মাথায় সাদা রুমাল। মাঝবয়সী।

রমলার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নার্স দু'হাত জোড় করে নমস্কার করল।

আমাকে ডাক্তার রাহা পাঠিয়েছেন।

ও, আসুন এ ঘরে।

রমলার পিছন পিছন নার্সটি ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। শান্তনুর দিকে চেয়ে রমলা বলল, এঁকে ডাক্তার রাহা পাঠিয়েছেন।

শান্তনু কিছু বলবার আগে নার্সটিই কথা বলল, রাত দশটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত আমাকে থাকতে হবে, এই কথাই ডাক্তার রাহা বলে দিয়েছেন।

শান্তনু কোন কথা বলল না। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পর রমলার দিকে চেয়ে বলল, রাত অনেক হল। আজ আমি উঠি। কাল অফিস যাবার মুখে একবাব দেখে যাব। অফিস-ফেরত প্রত্যেকদিনই আসব। আপনি অযথা চিন্তা করবেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন। কর্তব্য করে যান। এর বেশী আমরা কিছু করতে পারি না। এর বেশী আমাদের কাছে কেউ আশাও করে না।

শান্তনু সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতেই রমলার মনে হল যেন তার সব সাহস, সব শক্তিটুকুও শান্তনু হরণ করে নিয়ে গেল। এই দুঃসময়ে যার কাছে থাকার কথা, সে রইল সপ্তসাগর পারে। শুধু চিঠি ছাড়া তার সঙ্গে যোগাযোগের কোন সূত্র নেই।

রাজীব রায়ের ঘরে ফিরে এসে রমলা দেখল এই অল্প সময়ের মধ্যেই নার্স ওষুধের শিশিগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়েছে। বিছানার পাশে টিপয়ের ওপর ভাঁজকরা তোয়ালে। চেয়ারগুলো কোণের দিকে সরিয়ে দিয়েছে যাতে রোগীর কাছে যাওয়া-আসার সুবিধা হয়।

রমলা ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই নার্স জিজ্ঞাসা করল, ইনি কে আপনার?

বাবা।

বাবা?

হ্যাঁ, ইনি আমার সব। পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।

রমলা আঁচল দিয়ে জলভরা চোখ ঢাকল।

নার্স রমলার দিকে এগিয়ে এল। খুব কাছাকাছি। সান্ত্বনার সুরে বলল, এমনভাবে ভেঙে পড়বেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সে রাত্রে রমলা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। বাপী সেরে উঠেছেন। বাইরের বারান্দায় বসেছেন হাসি হাসি মুখে। সামনে জয়ন্ত আর রমলা। জয়ন্ত ফিরেছে ব্যারিস্টারী সনদ নিয়ে। রাজীব রায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে প্রার্থী হিসাবে। জীবনে প্রবেশ করার পূর্ব-লগ্নে পাশে তার রমলাকে প্রয়োজন। জীবনসঙ্গিনীরূপে।

স্বপ্নে জয়ন্ত এসেছিল, কিন্তু বাস্তবে এল তার চিঠি। টাকার প্রয়োজন। তার ফ্ল্যাটে চুরি হয়ে গেছে। চেস্টারফিল্ডের পকেটে যথাসর্বস্ব ছিল ওয়ালেটে। সব গেছে।

রাজীব রায় একটু ভাল। চলতে ফিরতে পারেন না। চাকা দেওয়া চেয়ারে নার্স তাঁকে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। লিখতে গেলে

হাত কাঁপে। বেশীক্ষণ কথা বললে ক্লান্তি আসে। মক্কেলের দল ওপরে চলে আসে। রাজীব রায়ের সব কেস তাঁর জুনিয়র সতীপ্রসন্নর হাতে। কিছু আবার বড় উকিলদেরও দিতে হয়।

চেক সই করতে পারেন না। সব চেক সই করতে হয় রমলাকে। ব্যাঙ্কের হিসাবের বই, স্টেটমেণ্ট সবই রমলার কাছে। প্রথম প্রথম রমলা সব কিছু বাপীকে দেখিয়ে নিত। প্রত্যেকটি চেক। পরে আর তা করত না। রাজীব রায়ই বারণ করেছিলেন। কতদিন তিনি এভাবে পঙ্গু হয়ে থাকবেন তার ঠিক আছে। হয়তো সারাটা জীবন। তার চেয়ে রমলা সব কিছু নিজেই করুক। সব কিছু শিখে নিক।

সব কিছু রমলা নিজেই করেছিল।

সে রাতের কথা রমলা কখনও ভুলবে না। চেকবই হাতে করে রমলা নিজের শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ওর ধারণা ছিল ও একলা। ধারে কাছে আর কেউ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শয়তান ঘুরছিল সেটা রমলা বোঝে নি, জানতে পারে নি। শুধু ঘোরা নয় শয়তান বজ্রমুষ্টিতে রমলার হাত ধরে চেকটা লিখিয়ে দিয়েছিল।

সেই রমলার প্রথম অন্যায়, প্রথম অপকর্ম কিন্তু সেই শেষ নয়। একবার নয়, বার বার জয়ন্ত লিখেছে। বার বার রমলা পাঠিয়েছে। জয়ন্ত আশ্বাস দিয়েছে প্রতিটি পাইয়ের হিসাব সে রাখছে। দেশে গিয়ে সমস্ত ঋণ শোধ করে দেবে। আর মাস ছয়েক, তার মধ্যে জয়ন্ত ফিরে আসবে।

রমলা জয়ন্তকে সব খুলে লিখেছিল। বাপের শরীরের অবস্থা। রমলা কিভাবে বাপকে না জানিয়ে জয়ন্তকে টাকা পাঠাচ্ছে সব বিবরণ। এ কথাও লিখেছে, খুব আশা করছে, জয়ন্ত এর প্রতিদান দেবে। এ দানের অমর্যাদা করবে না। ঋণশোধ করার জন্য

রমলা ব্যাকুল নয়, রমলা শুধু চায় জয়ন্ত ফিরে আসুক। গ্রহণ করুক রমলাকে।

এর দিন কয়েক পরেই ব্যাপারটা ঘটল।

রাত্রে বাপকে খাইয়ে রমলা বেরিয়ে আসছিল, রাজীব রায় ডাকলেন, রমলা!

কি বাপী?

বস, কথা আছে।

রমলা বাপের বিছানায় বসল। রাতের নার্স আর নেই। তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিনুর মা ঘরের মেঝেয় শোয়। একেবারে পাশের ঘরে রমলা। রাত্রে দরকার হলে বিনুর মা-ই সাহায্য করে।

রাজীব রায় মেয়ের একটা হাত নিজের হাতে টেনে নিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, আমার শরীরের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস রমি। আর কোনদিন উঠে দাঁড়াব, কোর্টে যাব, এমন ভরসা রাখি না। তোর জন্যই আমার ভয়। তোকে কারো হাতে না দিয়ে যেতে পারলে আমার শান্তি নেই।

রমলা মুখ তুলতে পারল না। মুখ তুললেই অশ্রুস্নাত মুখ দেখে রাজীব রায় বিচলিত হয়ে পড়বেন। তা ছাড়া বাপের এ ধরনের নিস্তেজ, ভেঙেপড়া ভাব রমলা সহ্য করতে পারে না। যার কণ্ঠে দীপক রাগিণী শুনতে চায় রমলা, তার গলায় সোহিনীর এ কি করুণ সুর!

কিন্তু তারপরের কথাটা কানে যেতেই রমলা চমকে মুখ তুলল।

শান্তনুর সঙ্গে আজ কথা হল রমি।

নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে রমলা বাপের দিকে চেয়ে রইল। কি জানি কি বলেছেন রাজীব রায়। শান্তনুর কাছে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শান্তনুই কথাটা পাড়ল।

শান্তনু? শান্তনু প্রস্তাব করল? রাজীব রায় প্রথমে কিছু বলেন নি? তা হলে লজ্জা পাবার মতন হয়তো তেমন কিছু ঘটে নি। নয়তো রাজীব রায় যদি বলতেন আব শান্তনু অসম্মত হত, তা হলে রমলার লজ্জা লুকোবার ঠাঁই থাকত না। কিংবা যদি এ রকম হত, বাপী কথাটা শুরু করলেন, শান্তনু রাজী হল, তারপর রমলার পক্ষে রাজী হওয়া সম্ভব হল না, তা হলে ব্যাপারটা আরো বিশ্রী হত। ঘোলাটে জলে সম্মান, মর্যাদা, একটা পরিবারের সুনাম পঙ্কিল হয়ে উঠত।

শান্তনু আমার অনুমতি চাইল। বলল আমার কাছ থেকে কথা পেলে নীরদকে চিঠি লিখবে। তারপর তার বাবা আসবে বাকি কাজটুকু কবতে।

তুমি কি বললে বাপী? অসম্ভব কাঁপছে রমলার কণ্ঠ।

আমি? আমি বললাম, শান্তনু, তুমি একবার রমলার সঙ্গে কথা বলে নাও। সে বড় হয়েছে। তার মন জানা দরকার। পাত্র হিসাবে তুমি সর্বাংশে কাম্য। এমন কি তোমাদের ছেলে-বেলায় তোমার বাবার সঙ্গে এই ধরনের কথাও কিছুটা আমাদের মধ্যে হয়েছিল।

রমলা কিছু বলল না। ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। চোখ নামাল বটে কিন্তু উৎকর্ণ হয়ে রইল। এ কথার পর শান্তনু কি বলল! কি উত্তর দিল!

একটু চুপ করে থেকে রাজীব রায় বললেন, শান্তনু বলল, আপনি তো জানেন কাকাবাবু আমি ঠিক এভাবে মানুষ হই নি। বিয়েটাকে শুধু মনজানাজানির পালা বলে আমি মনে করি না। জন্মজন্মান্তরের একটা সম্পর্ক। এর একটা বিধি আছে। প্রথা আছে। আপনার যেমন মতের প্রয়োজন, তেমনি আমার বাবারও সম্মতির দরকার আছে। অবশ্য আপনার মেয়ে যদি আমাকে তাঁর পাশে দাঁড়াবার যোগ্য বলে মনে না করেন, তা হলে স্বতন্ত্র কথা।

তেমন হলে তো এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। আপনিই বরং রমলা দেবীকে এ বিষয়ে একবার জিজ্ঞাসা করে নেবেন। আমি আপনার কথা শুনে তবে বাবাকে চিঠি লিখব।

কিছুক্ষণ রাজীব রায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। তারপর স্বগতোক্তি করার ভঙ্গীতে বললেন, শান্তনু has queer ideas but he speaks with conviction. আমার তো শান্তনুকে খুব ভাল লাগে। এ রকম brilliant career সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। আমার মনে হয়, ওকে পেলে তুই সুখীই হবি। আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হব।

রমলা আঙুল দিয়ে বিছানার চাদরে আঁকিবুঁকি কাটল। মনে মনে বুঝি সাহস সংগ্রহ করল, তারপর বাইরের বারান্দার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, তোমাকে অনেকদিন ধরে একটা কথা বলব ভাবছি বাপী। কথাটা বোধ হয় আমার অনেক আগেই বলা উচিত ছিল, তা হলে আর তোমাকে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হত না।

রাজীব রায় একটা হাত রাখলেন রমলার পিঠের ওপর। রমলা বুঝতে পারল, সে হাতটা থরথর করে কাঁপছে।

দ্বিধা আর সংকোচের মৃদু একটা শিহরণ রমলার স্নায়ুতে স্নায়ুতে। বলবে কথাটা। রাজীব রায়ের শরীরের এমন অবস্থায় এই মুহূর্তে কি দরকার কথাটা শোনানোর!

কিন্তু উপায় নেই। রাজীব রায়ের জন্য নয়, শান্তনুর জন্য কথাটা বলতেই হবে। তা ছাড়া রমলা যদি চুপ করে থাকে, একটি কথাও না বলে, তা হলে রাজীব রায় এই মৌনতাকে হয়তো সম্মতির লক্ষণ বলেই ধরে নেবেন। তা হলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠবে। আরো মারাত্মক।

রমলা ঠিক করে নিল। জীবন নিয়ে এভাবে লুকোচুরি খেলার কোন মানে হয় না। তাতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী।

আমি, আমি, রমলা কথা খোঁজার চেষ্টা করল। পারল না। একটু থেমে দম নিল, তারপর ভাঙা গলায় বলল, আমি এক জায়গায় কথা দিয়েছি বাপী।

রমলা অনুভবে বুঝতে পারল রাজীব রায়ের সমস্ত শরীরটা যেন দুলে উঠল। দু'চোখে অসহ্য দীপ্তি। তারপর? জীর্ণ, দুর্বল কাঠামো থেকে অসহায় কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কথা দিয়েছ?

হ্যাঁ বাপী। জয়ন্তকে কথা দিয়েছি। ভেবেছিলাম সে বিলেত থেকে ফিরে এলে তোমাকে জানাব, কিন্তু তার আগেই তোমাকে জানাতে হল।

জয়ন্ত, জয়ন্ত, ডক্টর সৌরেন ঘোষালের ছেলে? মাঁনে, জয়ন্ত তো ঘোষাল। ওর মা আইরিশ! জয়ন্ত বিলেতে।

রাজীব রায়ের কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে এল। স্মৃতিমন্থনের দুর্বার চেষ্টায় ক্লান্ত, এলোমেলো কথার টুকরো বেরিয়ে এল।

এবার রমলা সাহস ফিরে পেয়েছে। কথাটা যখন বলেইছে, তখন সব কিছু জানানো দরকার।

তোমার আশীর্বাদ পাবো তো বাপী?

আশীর্বাদ, হ্যাঁ নিশ্চয়, স্খলিত কণ্ঠে কথাটা বলে রাজীব রায় একটা হাত রাখতে গেলেন মেয়ের মাথায়, পারলেন না। হাতটা রমলার কাঁধে গিয়ে পড়ল।

রমলা হাতটা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাজীব রায়ের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, মাথাটা একটু তোল বাপী, তোমায় প্রণাম করব।

রাজীব রায় কষ্টে মাথাটা তুললেন। দু'গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আনন্দাশ্রু যে নয়, সেটা রমলা বুঝতে পেরেছিল অনেক পরে।

সে রাতে রমলা যখন শুতে গেল, তখন তার মনটা অনেক হালকা। অবশ্য তার বিয়েতে রাজীব রায় প্রতিবন্ধক হবেন এমন

কথা সে কোনদিন ভাবে নি। ব্রাহ্মণ কায়স্থ একটা সমস্যাই নয়। তা ছাড়া জয়ন্ত যখন বিলেত গিয়েছে, ব্যারিস্টারী সনদ নিয়ে ফিরবে, তখন কোথাও কোন বাধা নেই। সব অন্তরায় দূর হয়ে গেছে। রাজীব রায়ের শরীরের বর্তমান অবস্থায় তাঁর কেসের তদারক করার জন্য একজন ব্যারিস্টারের খুব প্রয়োজন।

রমলা ঠিক করল পরের দিনই জয়ন্তকে সব কথা লিখে দেবে। কোর্স শেষ করে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক। আর কতকাল রমলা প্রতীক্ষায় থাকবে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে।

পরের দিন সন্ধ্যার ঝোঁকে রাজীব রায়ের ঘরে ঢুকতে গিয়েই রমলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরের মধ্যে শান্তনু বাপীর সঙ্গে কথা বলছে।

সম্ভবতঃ রমলারই কথা। দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছা করলেও রমলার লজ্জা করল। সে ধীরপায়ে নিজের ঘরে ফিরে এল।

শান্তনু ভদ্র, ধীর, স্থির। রাজীব রায় ঠিকই বলেছেন। পাত্র হিসাবে সর্বাংশে কাম্য। কিছু পরিমাণে বিগত শতাব্দীর চিন্তাধারা পোষণ করে, এ যুগের সভ্যতাকে ঘৃণা করে মনে প্রাণে, কিন্তু এ শুধু জলের দাগ। সংসার করতে করতে এসব ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

জয়ন্তর কথা শান্তনুর অজানা নয়, তবে জয়ন্তর সঙ্গে রমলার অন্তরঙ্গতা কত অতলস্পর্শী সেটা জানে না। জয়ন্ত শুধু রমলার কলেজের সহপাঠী, এই পরিচয়টুকুই শান্তনুর জানা আছে।

রমলা আবার বাপের ঘরে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেল। শান্তনু বেরিয়ে আসছে। একেবারে সামনাসামনি।

লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল রমলা। শান্তনু হয়তো কিছু বলবে। বাবার কাছে সবই সে শুনেছে। সম্ভবতঃ সম্বর্ধনা জানাবে শুভমিলনের প্রারম্ভে। মনের মতন সঙ্গী মনোনয়নের জন্য।

শান্তনু বেশ একটু এগিয়ে এল। নীচু গলায় বলল, একটা কথা রমলা দেবী।

রমলা কিছু বলল না। ভীরু দুটি চোখ তুলে চাইল।

আজ কাকাবাবুর শরীরটা যেন একটু খারাপ মনে হচ্ছে। কাল বিকেলে যখন দেখেছিলাম তখন যেন অনেকটা ভালই মনে হয়েছিল। এর মধ্যে কি এমন ঘটতে পারে ?

রমলা পায়ের আঙুল দিয়ে মেঝে খুঁটতে লাগল। কি বলবে। কি হয়েছে রাজীব রায়ের। নিজের মনোনীত পাত্রের গলায় মেয়ে মালা দিতে পারেনি, তাই বুঝি আঘাত পেয়েছেন।

শান্তনু বলল, আপনি কাকাবাবুকে একটু সাবধানে রাখবেন। মাঝে মাঝে আপনাদের বাড়ির ডাক্তারকে দেখানো মন্দ নয়।

বেশ, ডাক্তার বোসকে আজই ফোন করে দেব, যাতে কাল সকালে একবার এসে বাপীকে দেখে যান।

কিছুদূর এগিয়েই শান্তনু থেমে গেল। আবার ফিরে এল রমলার কাছে, আর একটা কথা।

এবার রমলা প্রমাদ গুনল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, শান্তনুর দিকে না চেয়ে।

কাল আমি মাদ্রাজ চলে যাচ্ছি। ফিরতে হয়তো দিন পনরো-কুড়ি হবে।

রমলা নিশ্বাস ফেলল। মুক্তির নিশ্বাস। সে সব কিছু নয়। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথার ধার দিয়েও শান্তনু গেল না।

আপনি আমাদের মস্ত বড় সম্বল ছিলেন, যখন প্রয়োজন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। এতদিন আপনি থাকবেন না !

রমলার গলার করুণ সুরে শান্তনু যেন একটু বিচলিত হল। নরম গলায় বলল, কুড়িটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। চিন্তার কিছু নেই। শুধু কাকাবাবুকে একটু সাবধানে রাখবেন। উত্তেজিত হওয়ার যেন কোন কারণ না ঘটে।

তারপর চরম সর্বনাশ ঘটল। শান্তনু তখনও মাদ্রাজে। রাজীব রায় জয়ন্তর বিষয়ে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নি। কোন আগ্রহ প্রকাশ নয়।

এক বিকেলে ব্যারিস্টার প্রমোদ সরকার এলেন। সঙ্গে তাঁর সন্থ বিলেত প্রত্যাগত ছেলে।

রাজীব রায়ের অসুস্থতার দিন প্রমোদবাবুই সঙ্গে এসেছিলেন। মধ্যে আরো একদিন দেখা করতে এসেছিলেন। তারপর ছেলেকে আনবার জন্য বম্বে গিয়েছিলেন, তাই আর আসতে পারেন নি।

রমলা বাপের পথ্যের নির্দেশ দিতে ব্যস্ত ছিল, যখন ওপরে উঠল, উঁকি দিয়ে দেখল বাপের ঘরে লোক বসে রয়েছে। রাজীব রায় খুব বেশী কথা বলছেন না, প্রমোদবাবুই তাঁর ছেলের গুণ-কীর্তন করে চলেছেন।

একটা বই হাতে রমলা পাশের ঘরে গিয়ে বসল।

হঠাৎ রমলার খেয়াল হল সাড়ে সাতটায় বাবাকে একটা ওধুধ খাওয়ানোর কথা। উঠে বাপের ঘরে যেতে গিয়েই রমলা থেমে গেল।

রাজীব রায় কথা বলছেন, জয়ন্ত, হ্যাঁ জয়ন্ত ঘোষাল।

প্রমোদবাবুর ছেলেটি ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর বলতে হবে না আপনাকে। ডাক্তার সৌরীন ঘোষালের ছেলে তো? সে তো ওখানে একটি আইরিশ মেয়েকে বিয়ে করেছে। জয়ন্ত ব্যারিস্টারী পড়া তো বহুদিন ছেড়ে দিয়েছে। মুরগেটের কাছে একটা কিউরিয়োর দোকান দিয়েছিল, সেও তো উঠে গেছে। ব্যবসা চালাবে কি, নিজেই মোটে স্টেডি নয়। কি বলব আপনাকে, নিজের মা যে ছেলের মুখে মদের গ্লাস ধরতে পারে তা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

উত্তরে রাজীব রায় বিড়বিড় করে কি বললেন রমলার কানে গেল না।

ছেলেটি মাথা নাড়ল, নামটা আমি জানি না। তবে শুনলাম মহিলা জয়ন্তর মা। ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। জয়ন্ত তাঁর কথা খুব শোনে। তিনিই নাকি উদ্যোগী হয়ে জয়ন্তর বিয়ে দিয়েছেন নিজের দেশের মেয়ের সঙ্গে।

গাঢ় অন্ধকারের তরল স্রোত অসংখ্য ঢেউ তুলে রমলাকে আবৃত করে ফেলল। কোথাও তটের সামান্যতম ইশারাটুকুও নেই। ধীরে ধীরে সে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

রমলার মনে হয়েছিল সে চৈতন্য হারিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু আশ্চর্য, এমন একটা আঘাতও তাকে ধরাশায়ী করতে পারল না। প্রাণপণ শক্তিতে পর্দাটা আঁকড়ে ধরে সে টাল সামলাল। বার বার মৃতুকণ্ঠে সে শুধু উচ্চারণ করল, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। যা শুনেছি, যা শুনছি, সব মানুষের মনগড়া কথা। জয়ন্ত এমন হতে পারে না। সে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। হাতে হাত রেখে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে, ফিরে আসবে এ দেশে। আমায় গ্রহণ করবে।

মনকে শক্ত করে রমলা ঘরের মধ্যে ঢুকল। ওষুধ গ্লাসে ঢেলে বাপের মুখের কাছে ধরল। ওষুধ খাওয়ানো শেষ করে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে দিল। সব কিছু করল যন্ত্রচালিতের মতন। কাজ শেষ করে নিজের বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফুলে ফুলে কাঁদল অনেকক্ষণ ধরে। অশ্রুর বন্যায় কিন্তু বুকের পাষাণভার কমল না। ঘুমোবার আগে ঠিক করল পরের দিনই জয়ন্তকে চিঠি লিখবে। খোলাখুলি সব ব্যাপার জানিয়ে। কেন এভাবে কলঙ্কিত হচ্ছে জয়ন্তর নাম। আইরিন ও'-হারার আবিল সান্নিধ্যে কেন এভাবে জয়ন্ত নিজের জীবনকে অপচিত করছে।

সেই রাত্রেই। মাঝরাতে বিন্নুর মা'র হাউমাউ চীৎকারে রমলার ঘুম ভেঙে গেল। আচমকা খেয়াল করতে পারল না কোন্ দিক

থেকে কান্নার শব্দটা আসছে। কোন্ ঘর থেকে। একবার মনে হল বুঝি নিজের জমাটবাঁধা কান্নাই দিকে দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

দেয়াল ধরে সব কিছু ভাবতে চেষ্টা করল। রাজীব রায়ের ঘর থেকে আসছে চীৎকারের রেশ।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সুইচটা টিপল। অসংবৃত বেশবাস ঠিক করে রাজীব রায়ের ঘরের চৌকাঠ পার হয়েই চেঁচিয়ে উঠল।

একটা চেয়ার কাত হয়ে রয়েছে। ঠিক তার পাশে রাজীব রায়ের দীর্ঘ দেহ। নিষ্পন্দ, নিথর।

ততক্ষণে বাড়ির চাকরবাকরদের দল উঠে পড়েছে। বিনুর মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবু হঠাৎ কখন উঠেছেন জানিও না। প্রত্যেকদিন ডাকেন, আজ ডাকেনও নি। শব্দ শুনে আমি ধড়মড় করে উঠে বসেছি।

বিনুর মার কথা শেষ হবার আগেই রমলা ছুটে চলে এল ফোনের কাছে। অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার বোসের সাড়া পেল। ডাক্তার বোস এলেন আরো এক ঘণ্টা পর।

বাপের মাথার কাছে বসে বসে সে রাতে রমলা আকাশপাতাল চিন্তা করল। ডাক্তার আসার আগেই তার ভাগ্যলিপি সে পড়তে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল এক অধ্যায়ের অবসান। সংকটের ভয়াল মূর্তিটা দংষ্ট্রা বের করে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তার কবল থেকে বুঝি উদ্ধার নেই। কোন্ দিকে চাইবে রমলা? কার কাছে সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে? বৃষ্টি, তাপ, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ থেকে বাঁচাবার প্রাচীর আজ অপসারিত। সমুদ্র-পারের লোকটি, প্রতিশ্রুতির ভেলায় ভর দিয়ে যে সরে গেছে, তার দিকে চোখ ফেরানোও আজ অর্থহীন।

দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণার অন্তহীন তরঙ্গ বুকের তটে অমিতবেগে আছড়ে পড়বে, অবশ অচল হয়ে থাকতে হবে রমলাকে, সহিষ্ণুতার প্রতীক।

ডাক্তার বোস শেষ কথাই বললেন। তারপর কোথা দিয়ে কি হল রমলার মনে নেই। কে একজন হাত ধরে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে উঠল। লোকজন, ফুল, আলো, এসবের মধ্যে দিয়ে অর্ধ-চেতন একটা দেহকে টানতে টানতে শ্মশানে নিয়ে গেল। রক্ত-রাঙা আগুনের লেলিহান শিখায় রমলার সব আশা, আকাঙ্ক্ষা, তার অতীত ভস্মীভূত হয়ে গেল।

তবু বাড়িতে ফিরতে ফিরতে রমলা কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করল। অতীত নিশ্চিহ্ন, পিছনের সব কিছু নিঃশেষ, কিন্তু তার ভবিষ্যৎটুকু অক্ষুণ্ণ থাক। যে মধুর প্রত্যাশায় নির্ভর করে বাঁচবে রমলা, ঘর বাঁধবে নতুন খড়কুটো দিয়ে, সেটুকু যেন কেউ কেড়ে না নেয়। নিয়তির কোন করাল হাত।

একটু সামলে উঠেই রমলা জয়ন্তকে চিঠি লিখল। দীর্ঘ চিঠি। লিখতে লিখতে বার বার আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। চিঠির পাতা বদলাল। সে চিঠির কোথাও প্রেমের রংয়ের ছাপ নেই। রূঢ় জীবনের কথা। যে ভয়ংকর দিনগুলো রমলার সামনে থাবা মেলে দাঁড়িয়েছে তার স্বরূপ। পরিশেষে জয়ন্তর সম্বন্ধে যা শুনেছে সে কথা লিখল। এ সমস্ত কথা যে মিথ্যা এ কথা জানাক জয়ন্ত। মর্মান্তিক একটা যন্ত্রণার অবসান ঘটাক।

উত্তর এল না। দিনের পর দিন রমলা অপেক্ষা করল।

ইতিমধ্যে বাপের ব্যাঙ্কের খাতাটা খুলে নিজের সামনে ধরেছে। প্রায় রমলার ভবিষ্যৎ জীবনেরই মতন শূন্য। বেশীর ভাগ গেছে সমুদ্রের ওপারে। জয়ন্তর প্রয়োজনে। তারপর এতদিন ধরে সংসার চলেছে।

এতদিন রমলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিজেকে প্রসারিত করে বেঁচে ছিল, এবার সংকোচনের পালা। নভোচারী বিহঙ্গকে পাখা গুটিয়ে কোটরে আত্মগোপন করতে হবে।

নীচের তলায় ভাড়া এল। বারান্দায় বসে বসে রমলা দেখল।

এসব ব্যবস্থা রাজীব রায়ের এক উকিল বন্ধুই করলেন। অবশ্য রমলার অনুমতি নিয়ে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কিছু দাস-দাসী বিদায় হল। মোটরও গেল।

অনেক পরে জয়ন্তর চিঠি এল। উত্তরের আশা রমলা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, সেই সময়ে।

চিঠিটা আঁচলে চেপে রমলা নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। তুটো হাতে বুক চেপে ধরেও দ্রুতস্পন্দন থামাতে পারল না। প্রথম প্রণয়লিপি পড়ার মতন ভীরু কম্পিত হৃদয়ে রাজ্যের লজ্জা, সংকোচ সরিয়ে তারপর চিঠিটা চোখের সামনে মেলে ধরল।

একবার, তুবার, বার বার তিনবার চিঠিটা পড়ল।

হাতের মুঠোয় চিঠিটা দলা পাকিয়ে রমলা আস্তে আস্তে চোখ বুজল। অসহ্য একটা যন্ত্রণা বুকের ঠিক মাঝখানে। মনে হল মাথার রক্তবাহী শিরাগুলো অগ্নিবাহী শিখায় রূপান্তরিত হয়েছে। চেতনা হারাবে রমলা। এপারে বাচবার মতন আর কোন মোহ, আঁকড়ে ধরার মতন আর কোন অবলম্বন রমলার রইল না।

ক্ষমা চেয়েছে জয়ন্ত। ত্যাগ, তিতিক্ষার গালভরা কথা লিখেছে। ঠিক যেমন সব অন্তঃসারশূন্য কথা সতীনাথ তর্কভূষণ বলতে আসেন। মানুষকে আবিলতা, পঙ্কিলতা থেকে টেনে তোলবার অর্থহীন প্রয়াস। তার পারলৌকিক প্রশান্তির ইঙ্গিত।

কথাটা সত্যি। জয়ন্ত যখন অসুখে শয্যাগত তখন মেয়েটি অক্লান্ত সেবা করেছিল। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। তারই প্রতিদান দিয়েছে জয়ন্ত তাকে অন্তরতমা করে। অবশ্য সেতুবন্ধন করে দিয়েছে আইরিন ও’-হারা।

জয়ন্ত উপদেশ দিয়েছে। সে রমলার অযোগ্য। তাকে রমলা ভুলে যাক। আর কাউকে জীবনসঙ্গী করুক। সুযোগ পেলেই

জয়ন্ত রমলার ঋণ শোধ করে দেবে। প্রত্যেক পাইয়ের হিসাব তার ডাইরীতে লেখা আছে।

রমলার ভয় নেই। প্রতিটি পাইয়ের হিসাব জয়ন্তর খাতায় লেখা আছে, শুধু আসল হিসাবটাই বাদ পড়ে গেছে। সে হিসাবের পরিশোধের পথও বন্ধ।

অন্ধকার নামছে। রাত্রির অন্ধকার।

অন্ধকারকে রমলার ভয় নেই। সে অন্ধকারেরই সঙ্গিনী। বরং আলো দেখে বার বার শিউরে উঠেছে।। তার জীবনে আলোর ছদ্মবেশে আলেয়া এসেছে। শুধু চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেছে, ভুল পথে নিয়ে গেছে তাকে।

রমলা কি ভুলতে পেরেছে জয়ন্তকে! সম্পূর্ণরূপে তাকে বিস্মৃত হয়েছে! যতবার মনেব গহনে ওই নাম, ওই পরিচিতি ঝলসে উঠেছে ততবার রমলা রক্তের ঝাপটায় মুছে ফেলেছে। আজ বুঝি কোথাও তার চিহ্নটুকুও নেই।

জয়ন্ত যেমন বদলেছে, তেমনই রমলাও বদলেছে। তিলে তিলে হৃদয়ের কোমলবৃত্তিগুলো উপড়ে ফেলেছে। দু'হাতে অঞ্জলি করে নিয়ে সমাজের যত পাঁক, সমাজ-জীবনের যত ঘৃণা মুখে মেখেছে। জীবনের হাজার চোরাগলি বেয়ে বেয়ে নির্মম, নিস্পৃহ, গরাদঘেরা এই কুঠুরিতে শেষ কয়েক দিনের অপেক্ষায় রয়েছে।

জীবন দেখেছে। তার আশা আর আশাভঙ্গ। তার সব রঙ, সব বিবর্ণতা। এবার দেখবে কি আছে চেতনার ওপারে। যেখানে আলো নেই, বাতাস নেই, শুধু অনাদি, অনন্ত চৈতন্যহীনতা।

মুখ ফেরাতেই রমলা চমকে উঠল।

বকুলগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকির দীপ। হাজার জ্যোতির্ময় কটাক্ষের মতন। তারা দেখছে রমলাকে। কিছু বুঝি বলতে চায়। সাবধান করে দিতে চায় তাকে।

রমলা উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ উঠলে মাথাটা ঘুরে ওঠে। অনেকক্ষণ ধরে থরথর করে সারাটা দেহ কাঁপে। ক্লান্তি আর অবসাদ। সারা জীবন ধরে রমলা যা কুড়িয়েছে। ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মতন নিজের সর্বাঙ্গে ছোবল মেরেছে। রক্তাক্ত বিষদগ্ধ অবসন্ন শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সংসারের কাঁটাঝোপের ওপর দিয়ে।

এতদিন পরে সংগ্রামের ইতি। বাঁচার নামে তিলে তিলে এ অপমৃত্যুর আর প্রয়োজন হবে না। কুণ্ডলী পাকিয়ে নিজের বিবরে চিরনিদ্রা।

নিকষকালো আকাশের দিকে রমলা মুখ ফেরাল। এবার অবলুপ্তি দাও সৃজনের দেবতা! যেমনভাবে একটা একটা করে সব সুখ, সব শান্তি, সব আশ্বাস নিঃশেষে মুছে দিয়েছিলে তেমনি করে নির্মমহাতে রমলাকে মুছে দাও। পরাভূত আত্মাকে শান্তি দাও।

রমলার দু'গাল বেয়ে অশ্রুর দুটি ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। কারাকক্ষের কঠিন মেঝের ওপর দুটি ধারা, মুহূর্তের পরমায়ু দিয়ে।

আশ্চর্য, জয়ন্তর চিঠি পাবার পরই রমলার শান্তনুর কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন শান্তনুর কোন খোঁজ নেই। এতদিনে শান্তনুর ফেরার কথা।

রমলা নিজেকে বার বার প্রশ্ন করল। দিনের আকাশে সূর্যের প্রদীপ্ত আলোয় যেমন নক্ষত্রপুঞ্জ থাকলেও দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনই রমলার মনের আকাশে যখন জয়ন্ত ভাস্বর ছিল, তখন শান্তনুকে দেখা যায় নি। তার কথা মনেও হয় নি। আজ জয়ন্ত রমলার নাগালের বাইরে। দুটো হাত প্রসারিত করেও রমলা তাকে ধরতে পারবে না। প্রতিশ্রুতির রাখী ছিন্ন করে সে নতুন সংসার পেতেছে। নতুন দেশে নতুন মেয়েকে নিয়ে। বিন্দু বিন্দু করে রমলা রক্ত দিয়েছে, প্রতিদানে পেয়েছে অবহেলা আর উপেক্ষা।' সারাজীবনের সঞ্চয় উজাড় করে দিয়েছে যে দেবতার পায়ে, সে যে শুধু মৃন্ময় মূর্তি, প্রাণহীন, এতদিন পরে রমলা উপলব্ধি করতে পারল।

রমলা টেলিফোনটা তুলে ধরল। জানা নম্বর, ডায়াল করতে দেরি হল না। বলল, শান্তনু বোসকে একবার দরকার।

কিছুক্ষণ কোন শব্দ নেই। তারপর গম্ভীর গলায় আওয়াজ, শান্তনু বোসকে প্রয়োজন?

হ্যাঁ। রমলা মৃদুকণ্ঠে বলল।

আপনার প্রয়োজনটা যদি ব্যক্তিগত না হয় তো আমাকে বলতে পারেন।

রমলা ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবল, তারপর বলল, আমার প্রয়োজনটা একান্ত ব্যক্তিগত। অনুগ্রহ করে শান্তনুবাবুকে ডেকে দিন।

তিনি এখানে নেই।

মাদ্রাজ গিয়েছিলেন, শুনেছিলাম, এখনও কি ফেরেন নি ?

তিনি এ অফিস থেকে রিজাইন দিয়েছেন।

চলে গেছেন ?

হ্যাঁ। আজ দিন সাতেক।

কোথায়, মানে কোন্ অফিসে গিয়েছেন, জানেন ?

না। মাপ করবেন, এ অফিসে নেই এইটুকুই জানি। কোথায় গিয়েছেন সে খোঁজ রাখি না।

ও-পারে ফোনটা রেখে দেওয়ার শব্দ হল। রমলা ফিরে এসে চুপচাপ চেয়ারের ওপর বসল।

শান্তনু চাকরি ছেড়ে দিয়েছে! অবশ্য একটা পুরুষের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার হাজার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু রমলার কেবলই মনে হতে লাগল পাছে রমলার সঙ্গে পথেঘাটে মুখোমুখি দেখা হয়, রমলা যদি টেলিফোন তুলে খোঁজ নেয় শান্তনুর, তাই সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। তার এই অজ্ঞাতবাসের কারণ রমলা।

কিন্তু কি করে রমলা বোঝাবে শান্তনুকে যে, জয়ন্তর ওপর নির্ভর করে শান্তনুকে রমলা প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই জয়ন্ত আর রমলার নেই। জল কেটে কেটে স্টীমারের জেটি থেকে দূরে সরে যাওয়ার মতন একটু একটু করে সে সরে গিয়েছে রমলার বুকের তট থেকে।

শুধু তাই নয়। এ যদি নিছক সরে যাওয়া হ'ত, তাহ'লে হয়তো রমলার মনে এতটা যন্ত্রণা হ'ত না, কিন্তু দিনের পর দিন এভাবে প্রতারণা কেন করল জয়ন্ত! কেন রমলাকে ভালবাসার ভান করে, পূর্বরাগের সাতরঙা আলোয় তার আকাশ রাঙিয়ে হৃদয়দান করল আর এক শ্বেতাঙ্গিনীকে।

শান্তনু অন্যায় কিছু করে নি। সোজাসুজি রমলার বাপের কাছে মনের প্রার্থনা জানিয়েছে। যদি রমলা রাজী থাকে, তবেই শান্তনু এগোবে। তার আগে নয়।

দেয়ালে হেলান দিয়ে রমলা ভাবতে শুরু করল। সব যেন ঠিক মনে পড়ে না। স্মৃতি বিস্মৃতির দোলায় অল্প অল্প করে সব কিছু কাঁপে। নিজের অতীত, নিজের ভবিষ্যৎ।

একদিন সলিসিটরের চিঠি এল।

রমলা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরের কোণে বসে বসে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল, বেয়ারা এসে চিঠিটা রাখল।

এই একটি বেয়ারাতে ঠেকেছে। একাধারে ভৃত্য আর পাচক। আর আছে বিনুর মা। এ বাড়ির সঙ্গে বহুদিনের সম্পর্ক। সম্পদে এ বাড়ির আলো গায়ে মেখেছে, আজ এই ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে এ বাড়ি ছেড়ে, দিদিমণিকে ছেড়ে যেতে সে নারাজ।

একটা সই করে দিন দিদিমণি। পিয়ন দাঁড়িয়ে আছে।

রমলা সই করে দিল। খামটা উল্টেপাল্টে কিছুক্ষণ দেখল, তারপর ছিঁড়ে ফেলল। সলিসিটর রমণীমোহন চন্দ্র লিখেছেন তাঁর মক্কেল মানেকলাল বাজোরিয়ার তরফ থেকে। মাঝে মাঝে হুণ্ডি কেটে পরলোকগত রাজীব রায় বাজোরিয়ার কাছ থেকে যে টাকা ধার নিয়েছিলেন, তা সুদে আসলে বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। আর অপেক্ষা করা মানেকলাল বাজোরিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মৃত রাজীব রায়ের ওয়ারিশন হিসাবে রমলা দেবীর উচিত ঋণ পরিশোধ করা।

চিঠিটা রমলা অনেকবার পড়ল। প্রায় বানান করে করে।

রাজীব রায় ব্যারিস্টারীতে যথেষ্ট রোজগার করতেন। প্রতিপাল্য তাঁর এমন কিছু বেশী ছিল না। ঋণ করার তাঁর কি প্রয়োজন হল!

কিছু বলা যায় না, বিপদ যখন আসে, তখন এইভাবেই আসে। ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে যায়। মানুষকে পথ দেখার অবকাশ দেয় না। অভিভাবকহীন, নিঃসহায় রমলাকে ঘায়েল

করার এই সুবর্ণ-সময়। সত্যমিথ্যায়-মেশানো নানা অপবাদ, নানা ষড়যন্ত্রের চারা গজিয়ে উঠবে চারপাশে। কু-লোকে এমন সুযোগের চরম সদ্ব্যবহার করবে।

রাজীব রায়ের জুনিয়র সতীপ্রসন্নের কথা রমলার মনে পড়ে গেল। বিকেলের দিকে বেয়ারার হাতে চিঠি দিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠাল।

জুনিয়র হলে হবে কি, বয়স সতীপ্রসন্নর কম নয়। মাথা-জোড়া টাক, বিরাট চামর-গোঁফ, মসীকৃষ্ণ বর্ণ।

কি ব্যাপার রমলা? হাতের ব্রিফেব বাণ্ডিল টেবিলের ওপর আছড়ে ফেলে সতীপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

রমলা কোন কথা বলল না। সলিসিটরের চিঠিটা সতীপ্রসন্নর দিকে এগিয়ে দিল।

সতীপ্রসন্ন পকেট থেকে চশমা বের করে মনোযোগ দিয়ে পড়লেন, তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে রমলার দিকে চেয়ে রইলেন।

হুণ্ডি কেটে টাকা ধার করার বাপীর কোনদিন প্রয়োজন হয়েছিল বলে তো জানি না।

সতীপ্রসন্ন চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রাখলেন। বললেন, চিঠিটা আমার কাছে থাক। কাল আমি একবার রমণীমোহন চন্দ্রের অফিসে হুণ্ডিগুলো দেখব। তবে মিস্টার রায় বাজোরিয়ার কাছ থেকে টাকা কিছু নিয়েছিলেন তা জানি, তবে সে কত টাকা তা আমার জানা নেই।

বাপী টাকা নিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, শেষ কয়েক বছর শেয়ার বাজার নিয়ে খুব মেতেছিলেন। এক আর্মেনিয়ান ব্রোকার প্রায়ই যাওয়া-আসা করত। কিছুটা গোলমালে পড়েছিলেন, তাও বলেছিলেন একবার।

গোলমালে পড়েছিলেন? মনে হ'ল মুহূর্তের মধ্যে রমলার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিল।

গোলমালে মানে, কিছু টাকা শেয়ারে আটকে গিয়েছিল। ভালো শেয়ার ভেবে কিনেছিলেন, হঠাৎ কোথায় কি হ'ল, শেয়ারের দাম হু হু করে নেবে গেল। একেবারে বটমে চলে এল। সেই সময়ে আমাকে বলেছিলেন মিস্টার রায়, এই কাদা থেকে উঠতে পারলে আর নয়। হাত ধুয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাব। এ পাপ বাজারে আর ঢুকছি না।

চেয়ারের হাতলে দুটো হাত রেখে রমলা পাষাণপ্রতিমার মতন বসে রইল। কোন সন্দেহ নেই। সংসারের ছিদ্রপথে সবার অলক্ষ্যে শনি প্রবেশ করেছে। বিন্নুর মা কথাটা বলেছিল, রমলার শিক্ষিত মন মানতে চায় নি। বিশ্বাস করে নি। কিন্তু এখন, এই অসহায় মুহূর্তে যখন সব আশা নির্বাপিত, সব ভরসা ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, তখন এসব বিশ্বাস করতে মন চায়। বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করা যায় না, শিক্ষার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন চলে না, এসবের উর্ধ্বে বিবেচনার অগম্যলোকে এ রহস্যের উৎস।

সতীপ্রসন্ন বলে চলেছেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। নোটিশটা আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

সতীপ্রসন্ন চলে গেলেন। কিন্তু রমলা সহজ হতে পারল না। কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রইল। সামনে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। সেই অনন্ত তমিস্রা একদিন তাকে গ্রাস করবে, এ যেন তার জানা।

কয়েকটা দিন পর। ইতিমধ্যে সতীপ্রসন্ন ফোন করেছিলেন, তিনি দিন ঠিক করেছেন রমণীমোহন চন্দ্রের সঙ্গে। সেইদিন হুণ্ডিগুলো পরীক্ষা করবেন, তারপর এসে রমলার সঙ্গে কথা বলবেন।

রমলা খুব সাধারণভাবে বি. এ. পরীক্ষায় পাস করেছে। এত সাধারণ যে নিজেও একটু তৃপ্তি পায় নি। অবশ্য এই কটা মাস

ঝড় বয়ে গেছে তার মাথার ওপর দিয়ে। সব কিছু বানচাল করে দিয়েছে। পরীক্ষার পড়া বলতে রমলা কিছুই করতে পারে নি। ভেবেছিল, এম.এ.-টা পড়বে। ভাল ফল যদি হয়, তাহলে কোথাও ভাল চাকরি জুটে যেতে পারে। এ ছাড়া আর কি করবে রমলা! আর কোন অবলম্বন আঁকড়ে ধরবে!

তবু এখানে ওখানে দরখাস্ত দিয়েছিল। সহপাঠিনীদের পরামর্শে। এক জায়গা থেকে উত্তর এসেছিল। দেখা করার নির্দেশ জানিয়ে। রমলা গিয়েছিল। গিয়েই অসুবিধায় পড়েছিল।

লোক নেওয়া হবে বুঝি দুজন, দর্শনপ্রার্থিনীর সংখ্যা তিপ্পান্ন। তার মধ্যে কজন চেনাজানাও বেরোল।

তারা ঠাট্টা করল রমলাকে।

তোমরা যদি চাকরির খোঁজে পথে বের হও, তাহ'লে আমরা যাই কোথায়? এ চাকরি তো তোমাদের বিলাসিতা। সময় কাটাবার অছিলা। কিন্তু মধ্যবিত্ত সংসারের এটাই আমাদের অবলম্বন। গোটা একটা পরিবার চেয়ে আছে নিয়োগপত্রের দিকে।

রমলা কোন উত্তর দেয় নি। একটি কথাও বলে নি। শুধু ভেবেছে, এরা জানে না রমলা আজ কত অসহায়, কত নিঃসম্বল। আভিজাত্যের মিনার থেকে নেমে নেমে রমলা আজ পথের ধুলোয় এসে দাঁড়িয়েছে। মধ্যবিত্ত মেয়েদের কাঞ্চনকৌলীন্যটুকু হয়তো নেই, কিন্তু আর সব আছে। সামনে ভবিষ্যৎ রয়েছে অনন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-মাখানো। ঘর বাঁধার মন রয়েছে, হয়তো ঘর বাঁধার মানুষও।

রমলার কিছু নেই। চারপাশে শুধু রুক্ষ মরুভূর বিস্তার। অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে রমলা মনে মনে মরীচিকার আলপনা এঁকে চলবে।

রমলা ফিরে আসে নি। ছোট সায়েবের সঙ্গে দেখা করেছিল।

তাঁর প্রশ্নের জবাবও দিয়েছিল। পরে খবর দেবেন—তু-কান ভরে এই আশ্বাসবাণী নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল, হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকল ; রমলা !

শহরের হাজার গোলমালে নামটা তার কানেও যায় নি, কিন্তু কাঁধের ওপর আলতো একটা স্পর্শ লাগতেই রমলা ঘুরে দাঁড়াল।

দীর্ঘ কাঠামোটা একটু নুয়ে পড়েছে। গালে, কপালে বাড়তি অনেকগুলো বলিরেখা। কানের তু-পাশে পাকা চুলের সার।

জয়ন্তর বাবা ডাক্তার সৌরীন ঘোষাল।

চিনতে পারছ ? সৌরীন ঘোষাল অল্প হাসলেন।

উত্তরে রমলা তাড়াতাড়ি নীচু হ'য়ে পায়ের ধূলা নিল। মুচকি হেসে বলল, আমার স্মৃতিশক্তি বুঝি এতই খারাপ মনে করেন যে নিজের লোককে চিনব না ?

কি ভেবে রমলা কথাটা বলল সে নিজেই জানে না। সৌরীন ঘোষাল আপনার লোক হ'তে পারতেন, খুবই আপনজন, কিন্তু তাঁর ছেলে নিজের হাতে যে বাঁধন ছিঁড়েছে, তার জের টানা যে কত অর্থহীন, সেটাও কি বোঝা উচিত ছিল না রমলার ! নিজেকে সে বোঝাবার চেষ্টা করল। তা কেন। জয়ন্তকে বাদ দিয়ে বুঝি সৌরীন ঘোষালের সঙ্গে আত্মীয়তা কল্পনা করা যায় না। রক্তের সম্পর্কটুকুই কি সব ! কে আপন, কে পর, তা ঠিক করা মোটেই সহজ নয়। দেহ যা মানুষের সবচেয়ে আপন, তাই তো ব্যাধির আকর হয়, আর ওষধি আসে দূর বনভূমি থেকে। এই ধরনের একটা কথা রমলা বহু আগে পড়েছিল।

কেমন আছ বল ? সৌরীন ঘোষাল স্নেহসিক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

ভাল নেই কাকাবাবু। কয়েকমাস আগে বাবাকে হারিয়েছি। জানেন তো আমার আপনার বলতে আর কেউ নেই।

কথা শেষ হবার আগেই রমলা চোখে আঁচল চাপা দিল।

সময়টা দ্বিপ্রহর, তাই রক্ষা। অন্য সময় হ'লে এমন নয়ন-মনোহর দৃশ্য দেখতে হয়তো ভিড় জমে যেত।

তবু সৌরীন ঘোষাল অসুবিধায় পড়লেন। বললেন, রমলা মা, চল সামনের রেস্তরাঁয় গিয়ে একটু বসা যাক! সকাল থেকে ঘুরছি। একটু কিছু মুখে না দিলে আর চলছে না।

ব্যাপারটা রমলা বুঝল। কিন্তু আপত্তি করার আগেই দেখল সৌরীন ঘোষাল দ্রুতপায়ে রাস্তা পার হচ্ছেন।

অগত্যা রমলাকেও পিছন পিছন যেতে হ'ল।

ছোট কামরা। হাতের জিনিসগুলো টেবিলের ওপর রেখে সৌরীন ঘোষাল চেয়ার টেনে বসলেন। রমলাকেও বসালেন সামনের চেয়ারে।

বল, এবার তোমার কথা।

বলবার মতন কথা আর আমার কিছু নেই। এত আচমকা বাবা যাবেন, কল্পনাও করতে পারি নি।

এই পৃথিবী বড় অদ্ভুত জায়গা মা। এখানে নিয়মমাফিক কিছু হয় না, কিছু হতে পারে না। বাঁধাধরা কোন ছক নেই। এক পাগলের ছন্নছাড়া নাচের ঠেলায় সব ছত্রখান হয়ে যায়। আমার দিকে চেয়ে দেখ না। ঘর বাঁধার নেশা আমারই কি কম ছিল। ঘর বাঁধলাম, ঘরনী বাছলাম, কিন্তু কোথায় গেল সে-সব।

সৌরীন ঘোষাল হাসলেন। অপেক্ষাকৃত নির্জন দুপুরে, এক-টানা পাখার শব্দের মধ্যে সে হাসির আওয়াজে রমলা চমকে উঠল। রমলার কান্নার সুরের সঙ্গে এ হাসির যেন কোথায় মিল আছে।

বেয়ারা ঢুকতেই সৌরীন ঘোষাল রমলার দিকে চাইলেন।

কি খাবে বল?

আমি একটু আগে খেয়ে বেরিয়েছি। এক কাপ চা কিংবা এক গ্লাস শরবত ছাড়া আর কিছু আমি খেতে পারব না।

আমিও তাই। শুধু পথ থেকে সরিয়ে আনব বলেই, তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম।

তারপর বেয়ারার দিকে হেসে বললেন, টু-গ্লাস অরেঞ্জ-স্কোয়াশ।

বেয়ারা বেরিয়ে যেতে সৌরীন ঘোষাল একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ টেবিলের ওপর রাখা অ্যাশ-ট্রের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, জয়ন্তর খবর পাও না? সে তোমাকে চিঠি লেখে?

মাথা নীচু করে রমলা ঘাড় নাড়ল।

লেখে না জানি। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার আর তার মুখ নেই। মধ্যে আমার কাছে টাকা চেয়ে কয়েকবার চিঠি লিখেছিল। আমার সাধ্যমতো টাকাও পাঠিয়েছি।

আপনিও টাকা পাঠিয়েছেন? রমলা আর্তনাদ করে উঠল।

হ্যাঁ, অবশ্য আমার সামর্থ্যও পরিমিত। কিন্তু সবই আমার ভস্মে ঘি ঢালার সামিল।

ট্রেতে শরবতের গ্লাস নিয়ে বেয়ারা ঢুকতে সৌরীন ঘোষাল থেমে গেলেন। রমলার দিকে একটা গ্লাস এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, নাও, খেয়ে নাও।

রমলা মুখটা নীচু করল কিন্তু খেল না। স্ট্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

আমি হেরে গেছি, রমলা। সব দিক দিয়েই আমার হার হয়েছে। জীবিকায় উন্নতি করতে পারলাম না, জীবনেও পরাজিত হলাম। কদিন আগে আইরিনের একটা চিঠি এসেছে। আমার পরাজয়ের এই দিকটার কথাই সে লিখেছে তীব্র শ্লেষ আর ব্যঙ্গ করে।

আইরিন ও'-হারা চিঠি লিখেছেন সৌরীন ঘোষালকে? এতদিন পরে! চুকিয়ে দেওয়া সমস্ত সম্পর্কের সুতো টেনে টেনে এ আবার তাঁর কি নতুন খেলা! তূণীরে আরো বুঝি তীর ছিল? পয়োমুখ, তীক্ষ্ণধার। সৌরীন ঘোষালের মর্মমূল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেও শান্তি পান নি?

চিঠি নয়, চ্যালেঞ্জ। সৌরীন ঘোষাল শরবতের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললেন, লিখেছে জয়ন্তকে এ দেশের মেয়ের সঙ্গে আমিই তোড়জোড় করে বিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তার জীবনে তোমার নাটকের পুনরভিনয় হতে দেব না। এ বিয়ের ভিত্তি ছলনা বা প্রতারণা নয়, তাই এ বিয়ে অটুট থাকবে। অবশ্য জয়ন্তর ব্যক্তিগত সুখশান্তির চেয়ে আর একটা বিষয়ের কথা আমি বেশী ভেবেছি। আমি জানি এ বিয়ে হলে, এ ধরনের বিয়ে হলে তুমি আঘাত পাবে। জয়ন্ত যাতে আর কোনদিন তোমার কাছে ফিরে না যায়, সে ব্যবস্থাও আমি করব।

সৌরীন ঘোষাল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। বাইরের একটা কোলাহল শোনা গেল। বোধহয় কোন হতভাগ্য যন্ত্রদানবের বলি হল। শহরের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু কত প্রাণ তিলে তিলে নিঃশেষিত হয়, রক্তক্ষরণে পাংশু, বিবর্ণ, কে তার খোঁজ রাখে। খোঁজ রাখে না, কারণ সেখানে সোচ্চার আর্তরব নেই, দৃশ্যত কেউ যন্ত্রণায় ছটফট করে না।

জয়ন্ত যা কিছু করুক, আর যদি ফিরেও না আসে, তাতে আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু আইরিন যে অভিযোগ করেছে যে ছলনা আর প্রবঞ্চনার জাল বিস্তার করে আমি তাকে ধরেছিলাম, তাকে বিবাহ করেছিলাম, এ কথাটা যে কতদূর মিথ্যা, তা সে ছাড়া আর কেউ বোধহয় জানে না।

সৌরীন ঘোষাল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর ধীরকণ্ঠে বললেন, কি জানি আমারই হয়তো ভুল হয়েছিল। আইরিন বিক্ষুব্ধ অগ্নিগর্ভ ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিল। আমাকে যদি তার ভাল লেগে থাকে, তাহ'লে সেই চঞ্চল, অশান্ত ভারতের প্রতিনিধি হিসাবেই লেগেছিল। তারপর আমার সঙ্গে এ দেশে ফিরে এসে দেখল, আমি অতি সাধারণ লোক। নিজের পোড়াশোনা নিয়েই

ব্যস্ত। বোমাবারুদে আসক্তি নেই, রাজনীতির ধার দিয়েও যাই না। তারপর আইরিন বোধহয় আশা করেছিল জয়ন্তকে সেইভাবে মানুষ করে তুলবে। কিছুটা চেষ্টাও করেছিল, বিপ্লববাদের গরম গরম বই হাতে তুলে দিয়ে। কিন্তু দেখল জয়ন্ত আমার চেয়েও ভীরু, আমার চেয়েও নিস্তেজ।

রমলা চুপ করে কথাগুলো শুনে গেল। সৌরীন ঘোষালকে একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে। অবশ্য উত্তেজনা স্বাভাবিক। এই বয়সে দেহমন দুই-ই আশ্রয় চায়। সেদিক থেকে সৌরীন ঘোষাল একেবারে নিরাশ্রয়।

কিন্তু রমলা কি এত সহজে নিজের কথা বলতে পারবে! এত উত্তেজিত হ'য়ে! জয়ন্ত তার কি কেড়ে নিয়েছে, কতখানি, তা কাউকে বুঝি বলার নয়। রমলাব বর্তমান ধূলিধূসর, তার ভবিষ্যৎও নিশ্চিহ্ন। আর কোনদিন নতুন করে কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারবে, এমন আশা দুরাশা। বিরাট একটা ক্ষত বুকে চেপে নিজের ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ আর অপমানিত মনটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াতে হবে পৃথিবীর পথে পথে।

তবু রমলা নিজেকে সামলে নিল। বলল, এসব কথা থাক। এসব বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে, শুনতেও আমার কষ্ট কম নয়। তার চেয়ে আপনার কথা বলুন। আপনি কিছুদিন কলকাতায় থাকবেন?

না, মা, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সৌরীন ঘোষাল উত্তর দিলেন, আজ বিকেলের গাড়ীতেই আমি চলে যাব। হাসপাতালের জন্য কয়েকটা জিনিস কিনতে এসেছিলাম। কেনা হয়ে গেছে।

নিতান্ত কথার পিঠে কথা বলার ভঙ্গীতে রমলা জিজ্ঞাসা করল, ওখানে তো আপনি একেবারে একলা?

সৌরীন ঘোষাল বিষণ্ণ হাসি ফোটালেন বিবর্ণ ঠোঁটে, একলা

১০

তো আমি চিরদিনই। সংসার আমায় কিছুই দেয় নি, অথচ আমার প্রত্যাশা ছিল অনেক। শান্ত সুখী জীবন অন্য সকলের মতন আমারও কাম্য ছিল।

রমলা মুশকিলে পড়ল। এড়াতে গিয়ে বারবারই গোপন ক্ষতে খোঁচা লেগে গেল। সৌরীন ঘোষাল তো জানেন না, জানবার কথা নয়, এক অস্ত্রে দুজনেই আহত হয়েছে। যে বিষের মর্মান্তিক জ্বালায় দুজনে ছটফট করছে, সে বিষ একই শরসঞ্জাত। অলক্ষ্য থেকে নিপুণ এক শিকারী অব্যর্থ লক্ষ্যে দুজনকে বিঁধেছে।

সৌরীন ঘোষালই সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন, হাস-পাতালের কাছেই আমার কোয়ার্টার। হাসপাতালের এক ঝি ঘরদোর দেখে, রান্নাবান্না করে। আমার কোন অসুবিধা নেই। ভালই আছি আমি।

কথাগুলো বলতে বলতেই তাঁর দুটো চোখ চকচক করে উঠল। টেবিলের ওপর থেকে জিনিসগুলো তুলে নিয়ে সৌরীন ঘোষাল দাঁড়িয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে রমলাও দাঁড়াল।

বিল মিটিয়ে দুজনে বাইরে চলে এল।

আপনি কোন্ দিকে যাবেন? রমলা জিজ্ঞাসা করল।

আমি চৌরঙ্গীর দিকে যাব। সেখানেই একটা হোটেলে উঠেছি। তুমি বাড়ি যাবে তো?

রমলা ঘাড় নাড়ল।

একটু এগোতেই একটা ট্যাক্সি। হাত নেড়ে রমলা ট্যাক্সিটা থামাল, তারপর সৌরীন ঘোষালের দিকে ফিরে বলল, আসুন, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।

দুজনে পাশাপাশি বসল।

অনেকদিন আগের এক দৃশ্য রমলার মনের সামনে ভেসে উঠল। সেদিনও এমনি পাশাপাশি ফিরেছিল দুজনে, তবে ট্যাক্সিতে নয়, বাড়ির গাড়িতে। জয়ন্তকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে।

তখন তুজনেরই মনের অবস্থা এক। অপূর্ব রঙীন কল্পনার এক জাল বুনতে ব্যস্ত। তুজনেরই ভবিষ্যৎ রুপোলী রেখায় সমুজ্জ্বল।

আর আজ ক্লান্ত, বিধ্বস্ত তুটি মন। পৃথিবী তার সব বিবর্ণতা, সব কদর্যতা নিয়ে ফুটে উঠেছে সামনে। জীবনের আর মনের পাথেয় নিঃশেষিত। কর্দমাক্ত অগভীর জলে লগি ঠেলে ঠেলে ঘাটের সন্ধান করা।

গাড়ির মধ্যে একটি কথাও হল না। তুজনে বুঝি তুজনের চিন্তায় বিভোর। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সৌরীন ঘোষাল বললেন, ব্যস, এইখানে আমি নেমে যাব।

ট্যাক্সি থামল। হাতের জিনিসগুলো সামলে সৌরীন ঘোষাল নেমে দাঁড়ালেন। জানলার কাছে মুখ রেখে বললেন, একটা কথা বলব রমলা ?

বলুন।

তুমি নিজের জীবনটা এভাবে নষ্ট করো না। জয়ন্ত তোমার যোগ্য নয়, একথা তার বাপ হয়ে আমি বলছি।

উত্তর দেবার কিছু ছিল না। তা ছাড়া এমন ধরনের একটা কথা সৌরীন ঘোষালের কাছ থেকে রমলা আশাও করে নি। হয়তো সবই তিনি জানতেন। জয়ন্তকে ট্রেনে তুলতে আসার দিনই সব কিছু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু এভাবে আচমকা কথাটা তিনি বলবেন রমলাও ভাবতে পারে নি।

তাও তো সৌরীন ঘোষাল কিছুই জানেন না। এইটুকু শুধু জানেন অতনুর তন্তুহীন বন্ধনে তুজনে বাঁধা পড়েছিল। তিনি জানেন না কিভাবে মাসের পর মাস, জয়ন্তর প্রয়োজনে রমলা নিজের সর্বস্ব তার হাতে তুলে দিয়েছে। শুধু নিজের টাকাই নয়, বাপের অসুস্থতার সুযোগে তাঁর টাকাও মুঠো মুঠো খরচ করেছে জয়ন্তর জন্য।

এখন জয়ন্তর শঠতা আর প্রবঞ্চনার জালে আটকে পড়ে

অসহায় মৃগীর মতন শুধু ছটফট করছে। ছাড়াবার যত চেষ্টা করছে, ততই জড়িয়ে যাচ্ছে নিবিড় ভাবে।

রমলা বাড়ি ফিরে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বিন্নুর মা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

দিদিমণি!

চোখ না খুলেই রমলা উত্তর দিল, কি বল?

সতীপ্রসন্নবাবু ফোন করেছিলেন। আজ বিকেলে আসবেন।

আচ্ছা।

রমলা পাশ ফিরে শুল। বালিশ আঁকড়ে।

চোখ বন্ধ করলেই আইরিন ও'হারার মূর্তিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তখন আইরিন ও'হারা নয়, আইরিন ঘোষাল। সৌরীন ঘোষালের স্ত্রী। রমলার সমস্ত ভবিষ্যৎ আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়েছেন। প্রতিহিংসার বিরাট রথটা সবলে টেনে নিয়ে চলেছেন নির্মমতার রাজপথ বেয়ে, তাতে কটা প্রাণ নিষ্পিষ্ট হল, কটা পঞ্জর চূর্ণপ্রায়, তা দেখার তাঁর সময় নেই।

এই সময়টা রমলার বড় কষ্ট হয়।

কারাজীবনের দিনগুলো তবু একরকম কাটে। আশেপাশে লোক থাকে, আলো থাকে, পাখপাখালির ডাক।

কিন্তু রাত্রির কৃষ্ণ যবনিকা যেন একরাশ ভয় সঙ্গে করে নিয়ে আসে। চারপাশের সবকিছু মুছে দেয়। শুধু প্রাচীরের উঁচু কাঠামোটা নিষেধের প্রতীক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

শুধু অন্ধকার নয়, অদ্ভুত সব শব্দ শুরু হয় দিকে দিকে। বিবেকের প্রতিধ্বনি! বিবেক, না বিবেক রমলা মানে না। বিবেকের অনুশাসন শুধু স্বার্থলোভী মানুষের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আর এক ছলনা মানুষকে ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধার।

ওসব কিছু নয়। মনের বিচিত্র অনুভূতি শব্দের রূপ নেয়।

আর কটা দিন; তারপর রমলা উন্নীত হবে আলোহীন, শব্দহীন রূপহীন এক জগতে। সুখ-দুঃখের অতীত। জ্বালা-যন্ত্রণারও।

রমলা উঠে বসল। নিকষ-কালো আকাশের বুকে বকুলের আরো কৃষ্ণ শাখা-প্রশাখার চিহ্ন। রাত্রে বোঝা যায় না, এই ডালে পাতা গজায়, ফুল ফোটে।

প্রহরীর ভারী বুটের শব্দ। কাছে, আরো কাছে।

রমলা চুপচাপ বসে থাকে।

হঠাৎ মুখের ওপর টর্চের তীব্র আলো এসে পড়ে। রমলা চমকায় না, সরে না।

মায়ী শো যাও, শো যাও।

রমলা নিস্পন্দ। শুধু শাড়ীর অাঁচল দিয়ে চোখ দুটো ঢাকে।

জেলাখানার পেটাঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজে। টর্চের আলো সরে যায় রমলার মুখের ওপর থেকে। প্রহরীর বুটের শব্দ অস্পষ্ট হ'য়ে আসে।

সেদিন সন্ধ্যায় সতীপ্রসন্নবাবু এসেছিলেন।

রমলা বসে বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল, চাকরি-খালির বিজ্ঞাপনের সন্ধানে, চৌকাঠের ওপারে সতীপ্রসন্নবাবু এসে দাঁড়ালেন।

রমলার বাপের অনেকদিনের পুরোনো জুনিয়র। সেই সুবাদে বাড়ীর সর্বত্রই অবাধ গতি ছিল। রমলাকে খুব ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন।

রমলা!

আসুন। রমলা হাতের কাগজ সরিয়ে রাখল।

সতীপ্রসন্নবাবু চেয়ারে এসে বসলেন।

হুণ্ডিগুলো দেখলাম। গোটা-ছয়েক হুণ্ডি। সব মিলিয়ে প্রায়

বাহান্ন হাজার। এত টাকা উনি শেয়ারে ইনভেস্ট করেছেন, এমন কথা তো কোনদিন বলেন নি। তোমায় একটা কাজ করতে হবে রমলা।

বলুন।

মিস্টার রায়ের কাগজপত্রগুলো একবার দেখে রাখবে। শেয়ার সম্পর্কীয় যদি কিছু পাও, আলাদা করে রাখবে, আমি এসে দেখব।

রমলা ঘাড় নাড়ল।

এ ছাড়া আর কোথাও কি কিছু ছিল? কোন দান-খয়রাত? কিন্তু হুণ্ডি কেটে দান করবেন এমন তো মনে হয় না। ব্যাঙ্কে টাকা থাকতেও হুণ্ডি কেটেছিলেন, হয়তো ভেবেছিলেন, প্র্যাকটিশের টাকা থেকেই দেনার টাকাটা মিটিয়ে দেবেন। কিংবা শেয়ারের দাম চড়লেই শেয়ার বিক্রি করে শোধ করবেন। ঠিক কেন করেছিলেন, বলা মুশকিল। যাক, রাস্তা একটা বের করতেই হবে। আমি ইতিমধ্যে এটর্নীকে বলে সময় নিয়েছি।

রমলা একভাবে বসে রইল। সতীপ্রসন্নবাবু হয়তো ভাবছেন, রাজীব রায়ের ব্যাঙ্কে টাকা রয়েছে। প্রয়োজন হ'লে সেই টাকাতেই ঋণ শোধ হবে। কিন্তু তিনি জানেন না, রাজীব রায়ের মেয়ে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার মিথ্যা প্রলোভনে ভুলে মুঠো মুঠো করে সে সঞ্চয় অপচয় করেছে।

সত্যি যদি এই বাহান্ন হাজার টাকার প্রয়োজন হয়, কোথা থেকে এ টাকা সংগৃহীত হবে!

আর ভাবতে পারে না রমলা। এ ভাবনার বুঝি কুলকিনারা নেই। জীবন যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এমন যদি হ'ত, রমলা ভাবল, যাদুদণ্ডের স্পর্শে মাঝখানের এই অন্ধকার দিনগুলো মুছে যেত। আবার আগের আলো-ঝলমল দিন ফিরে আসত। জয়ন্তর সঙ্গে মাঠে ময়দানে, গঙ্গার ধারে ধারে

নিশ্চিন্ত ভ্রমণ। হাতে হাত রেখে কাছে আসার প্রতিশ্রুতি। শান্তনু, শান্তনু বোসকে নিয়ে পরিহাস-উজ্জ্বল সময়ের সার।

সেদিন শান্তনুকে বিগত যুগের এক কবন্ধ বলে মনে হয়েছিল। এমন একটা পরিবারে অচল। আধুনিক চিন্তাধারার বিরোধী মন।

কিন্তু আজ রমলার ধারণা বদলেছে। শান্তনু চটুল, অন্তঃসার-শূন্য নয়। পায়ের তলায় মাটি আছে আর সে মাটিতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত। এমন একটা সুদৃঢ় শমীবৃক্ষের কাণ্ডেই বুঝি জীবনের তরী বাঁধা যায়।

পরের দিন রমলা রাজীব রায়ের আলমারি খুলল। এর আগেও কয়েকবার খুলেছিল কিন্তু এমন তন্ন তন্ন কবে সব কিছু খোঁজে নি।

চেক-বই পাস-বই রয়েছে। কিছু মক্কেলের দলিল। একপাশে লাল ফিতে বাঁধা শেয়ারের বাণ্ডিল।

সেইগুলো রমলা সন্তর্পণে নামাল। খুলে খুলে দেখল। নানা কোম্পানীর শেয়ার। কিছু শেয়ার সংক্রান্ত চিঠিপত্রও রয়েছে। সেইগুলো বের করে রেখে রমলা আলমাবি বন্ধ কবে দিল।

ফিরে এসে চেয়ারে বসল। আজও কতকগুলো দরখাস্ত লিখতে হবে। ঠিকানা দেখে দেখে।

কোনদিন রমলা কল্পনাও করে নি, এভাবে তাকে জীবিকার জন্য অফিসের দরজায় দরজায় মাথা খুঁড়ে বেড়াতে হবে। বাড়ি-ভাড়ার টাকায় রমলার অনায়াসেই চলে যাবে, কিন্তু তবু চাকরি রমলার একটা চাই।

চুপচাপ সারাক্ষণ এ বাড়িতে বসে থাকলে রমলা পাগল হ'য়ে যাবে। চিন্তার মেঘ ভিড় করে আসবে মনের আকাশে। কশাঘাতে রমলাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে।

তার চেয়ে অফিসের মধ্যে নানা জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন

মিশিয়ে দিয়ে রমলা অন্যমনস্ক হ'তে পারবে। নিজের দৈন্য, ক্ষোভ, হতাশা সব ভুলতে পারবে।

বিকেলে সতীপ্রসন্নবাবু আবার এলেন।

রমলা শেয়ারের গোছা তাঁর সামনে রেখে একটা চেয়ারে বসল।

সতীপ্রসন্নবাবু গভীর মনোযোগ দিয়ে একটার পর একটা শেয়ার আর চিঠিপত্র দেখতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পর তিনি মুখ তুললেন। চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে রমলার দিকে চেয়ে বললেন, এ তো দেখছি প্রচুর শেয়ার কিনেছিলেন মিস্টার রায়। বেশীর ভাগই তো বাজে শেয়ার। ডিভিডেণ্ডের জন্য চিঠিপত্রও লেখালেখি করেছেন। অনেকগুলো চিঠিরই উত্তর পান নি। এ-সমস্ত শেয়ার মিস্টার রায়কে কে গছালে?

রমলা ঘাড় নাড়ল। কে গছালে তা তার জানবার কথা নয়। এসব কথা রাজীব রায় মেয়েকে কোনদিন বলেন নি। বলার কথাও নয়।

সতীপ্রসন্নবাবু কাগজগুলো দেখতে দেখতে বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। ভ্রূ কুঁচকে গেল। থমথমে মুখ।

এ ভাবান্তর রমলার চোখ এড়াল না।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে রমলা বলল, দেখলেন কাগজগুলো?

হুঁ, দেখলাম। আমি যা ভেবেছিলাম, কেস তার চেয়েও অনেক জটিল। এত টাকা মিস্টার রায় শেয়ারে ঢেলেছেন, আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি। তা ছাড়া বেশীর ভাগই বাজে শেয়ার। কোন রিটার্ন আশা করা বাতুলতা।

জানত, রমলা সব জানত। ঠিক এইভাবে চারদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসবে। ওর জীবনের সব আলো নিভে যাবে।

রুদ্ধ হয়ে যাবে বাতাসের প্রবাহ। নির্বাত, নিষ্প্রদীপ কোটরে দুঃসহ বেদনায় রমলা ছটফট করবে।

দিন সাতেক কেটে গেল। কোন উত্তর নেই। অন্য অনেক অফিসে, রমলা দরখাস্ত পাঠিয়েছিল, কোন সাড়া আসে নি। অথচ নিজেকে ব্যস্ত রাখবার জন্য একটা চাকরির রমলার খুব প্রয়োজন।

দুপুরে রমলা শোবার আয়োজন করছিল, দরজায় শব্দ হ'তেই চমকে উঠে বসল। আজকাল শব্দ হ'লেই রমলা ভয় পায়। তার মনে হয়, নতুন কোন বিপদের বুঝি পূর্বাভাস। অমঙ্গলের সঙ্কেত বহন করে আর কেউ এসে দরজায় দাঁড়াল।

কে? শঙ্কাতুর কণ্ঠে রমলা প্রশ্ন করল।

আমি, দিদিমণি। বিনুর মার গলা।

কি রে? আয়, ভিতরে আয়।

রমলার কণ্ঠে ভয়ের ঘোর তখনও কাটে নি।

বিনুর মা আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে মেঝের ওপর বসল। কিন্তু কোন কথা বলল না।

কি বলতে এলি? রমলা আবার মনে করিয়ে দিল।

একটা কথা বলতে এলাম, দিদিমণি।

কি কথা বলবি তো?

বিনুর মা একটু ঢোক গিলল, তারপর বলল, সেই শান্তবাবুর কোন খবর পাও না দিদিমণি?

শান্তবাবু, মানে শান্তনু। হঠাৎ শান্তনুর কথা মনে হল কেন বিনুর মার!

না, কি করে আর খবর পাব। ভদ্রলোক কোথায় আছেন, তাই জানি না।

আগে যে অফিসে ফোন করতে?

সে অফিসের কাজ শান্তনুবাবু ছেড়ে দিয়েছেন। কোথায়

গেছেন কেউ জানে না। কিন্তু হঠাৎ তোর শান্তনুবাবুর কথা মনে হল কেন?

হঠাৎ মনে হয় নি দিদিমণি, ক'দিন ধরেই ভাবছি। এই সময় তিনি এলে একবার বড় ভাল হত।

হাসি পেল রমলার। বিনুর মা ভেবে রেখেছে কবেকার ছোট্ট এক প্রতিশ্রুতি উত্তরকালে ঠিক রূপ নেবে। রমলা আর শান্তনুর কাছে আসার পথে কোন বাধা নেই। জানে না বিনুর মা, হাতের মুঠোর মধ্য দিয়ে সময়ের অঢেল বালুস্রোত পার হয়েছে। জয়ন্তর পেছনে সব কিছু রমলা ঢেলেছে। যে প্রেমের দীপশিখা জ্বলিয়ে প্রেমাস্পদের আরতি করবে রমলা ভেবেছিল, সেই শিখা লেলিহান হয়ে তার কপাল পুড়িয়েছে।

নীলনয়নার মোহে জয়ন্ত সাগবের এপারের সব কিছু ভুলেছে। প্রতিশ্রুতি, প্রেম, ত্যাগ।

এসব কথা, এত সব কথা বিনুব মাকে বলা যায় না। কাউকেই বুঝি রমলা বলতে পারবে না। নিরুদ্ধ বেদনায় গুমরে গুমরে কাঁদবে, চাপা আগুনে নিজের পাঁজর পুড়বে, আর কিছু সুরাহা হবে না।

তুমি একটা চিঠি লেখ দিদিমণি। এ সময়ে অভিমান কবে দূরে সরে থেক না। ইন্দ্রপাত হয়ে গেল। সায়েব চলে গেলেন। একটা পাহাড় সরে যাওয়ার মতন। এখন যেমন করে পাব, বাবুকে কাছে ডাক।

কি বাজে বকছিস? রমলা এবার বিরক্ত হয়ে উঠল।

কেন, বাজে আবার কি বকছি। তুমি কতদিন এরকম থুবড়ো হয়ে থাকবে। এতদিন পরীক্ষার ছুতো ছিল, এবার তো পাস দিলে। সায়েব বেঁচে থাকলে তোমার বিয়ের চেষ্টা করতেন না বুঝি?

এখন আমার বিয়ের কথা ভাববার সময় নেই, বুঝলি, রমলা

বিনুর মাকে নয়, যেন নিজেকেই বোঝবার চেষ্টা করল, জানিস এ বাড়িঘর কিছুই থাকবে না। আমাকে চাকরি করে খেতে হবে। দেখিস না রোজ কত গোছা গোছা দরখাস্ত লিখি।

বিনুর মা অবাক চোখে অনেকক্ষণ ধরে রমলার দিকে চেয়ে দেখল। জীবনের এমন গুরুতর বিষয় নিয়ে কেউ পরিহাস করতে পারে, এ যেন তার ধারণারও বাইরে।

বর ঠিক। দু পক্ষের কথাবার্তা বলা আছে, সুতরাং শুভ-কাজটা সেরে ফেলাই তো ভাল। একটা অসুবিধা অবশ্য, রমলার গুরুজনস্থানীয় কেউ নেই, সেইজন্য বিনুর মা রমলাকেই কথাটা পাড়তে বলছে। এতে চটে উঠবার কি আছে, আর পরিহাসই বা করা কেন?

বিনুর মা উঠে পড়ল। যেতে যেতে বলল, কি জানি বাপু। আমরা গরীব লোক, আমাদের কথা বলতে আসাই অন্যায়। বাবুর বাবাকে আসবার জন্য একটা চিঠি লিখলেই হয়। নিজের লিখতে লজ্জা হয়, সায়েবের সঙ্গে যে ছোট উকিল বসতেন, সতীপ্রসন্নবাবু, তাঁকে একবার বললেই তো তিনি লিখে দেন।

রমলা কোন উত্তর দিল না। কোন কথা নয়। যেমন বসেছিল, তেমনি চুপচাপ বসে রইল।

বিশ্রী একটা চীৎকার। রাত্রির আকাশ বিদীর্ণ করে পেঁচার ডাক। রমলা চমকে উঠল।

অমঙ্গলে এখন আর ভয় নেই। মঙ্গল-অমঙ্গল, ভালমন্দ সব কিছুই আজ রমলার কাছে সমান। মৃত্যু তার অমোঘ দণ্ড দিয়ে তাকে স্পর্শ করেছে। তার আয়ুষ্কাল পরিমিত। আর কোনদিন রমলা বাইরের পৃথিবী দেখতে পাবে না। এই কারা-প্রাচীরের ওপারে যাবার তার কোন সম্ভাবনা নেই।

বাইরে আলোর বন্যা, হাজার মানুষের কোলাহল, জন্মমৃত্যু দুই চক্রে গাঁথা চিরন্তন জীবনযাত্রা।

কিন্তু আলোর নীচে অন্ধকারের গাঢ় স্রোত রমলা দেখেছে, অবগাহন করেছে সেই স্রোতে। মানুষের হাসিকান্নার অন্তরালে দীর্ঘ, কালো সরীসৃপকেও দেখেছে। কামনা-বাসনার গরল ঠাসা বিরাট ভুজঙ্গম। যে পৃথিবীকে আপাতদৃষ্টিতে মনোহারিণী মনে হয়, সুন্দরী, তারই কীটদষ্ট, গলিত রূপ রমলা দেখেছে।

বাইরের পৃথিবী আর কারাপ্রাচীর-বেষ্টিত এই ভূখণ্ডের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখতে পায় না রমলা। তার কাছে আলো আর অন্ধকারের রূপ এক। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যেও বুঝি কোন পার্থক্য নেই।

বিছানা ছেড়ে রমলা উঠে দাঁড়াল। অসহ্য গরম। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে। অঙ্গে বসন রাখাই ভার।

আবার টর্চের আলো, প্রহরীর বুটের ছন্দায়িত শব্দ। এগিয়ে আসছে। কাছে, আরো কাছে।

তার কয়েকদিন পরেই আরতির সঙ্গে দেখা হল। স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত দুজনে একসঙ্গে পড়েছে। শুধু একসঙ্গে নয়, একেবারে পাশাপাশি।

বি.এ. পাস করার পর আর তার সঙ্গে দেখা নেই। জীবিকার সন্ধানে কে কোনদিকে ছিটকে পড়েছে, খোঁজ রাখা সম্ভব হয় নি।

পোস্ট-অফিস থেকে একটা দরখাস্ত ডাকে দিয়ে রমলা বেরিয়ে আসছিল, আরতির সঙ্গে চোখাচোখি হল। আরতি ঢুকছিল।

আশপাশের লোকজনের কথা ভুলে গিয়ে আরতি রমলার একটা হাত জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, আরে, কেমন আছিস? কতদিন পরে দেখা বল তো?

রমলা আরতির হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বলল, আয়, বাইরে আয়, অনেক কথা আছে।

একটু দাঁড়া, দুটো খাম কিনে নিয়ে আসি। আরতি ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। রমলা পোস্ট-অফিসের বাইরে এসে দাঁড়াল। আরতি এল প্রায় মিনিট কুড়ি পরে।

কই, কি বলবি বল। আরতি শাড়ীর আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল।

এখানে নয়, বাড়িতে আয়।

একটু এগিয়ে দুজনে একটা রিক্সায় উঠল। রমলার বাড়ি খুব কাছেই। অনায়াসেই হেঁটে যাওয়া যেত, কিন্তু একটা আবরণের যেন বড় বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল রমলার। বান্ধবীর সান্নিধ্যে নিজেকে ভারি অসহায় বোধ হচ্ছিল।

রিক্সাতেই আরতি জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার, তুই পোস্ট-অফিসে যে? আমার মতন খাম পোস্টকার্ড কিনতে নিশ্চয় নয়?

তার চেয়েও খারাপ কাজ করতে। রমলা হাসল।

তার মানে?

একটা চাকরির দরখাস্ত পোস্ট করতে। দেরি হয়ে গেছে। রাস্তার ডাকবাক্সে ফেললে কাজ হবে না, তাই পোস্ট-অফিসে দিয়ে এলাম। এখন বসে বসে দিন গুণব। প্রিয়তমের পদধ্বনির অপেক্ষায়।

এবারেও রমলা হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

আরতি সবিস্ময়ে রমলার দিকে মুখ ফেরাল, কি ব্যাপার বল তো? তুই চাকরির দরখাস্ত করছিস? তোর বাপের সঙ্গে মন-কষাকষির পালা চলছে বুঝি, জয়ন্তকে বিয়ে করা নিয়ে? দেখি মাথাটা নীচু কর।

রমলা মাথাটা একটু কাত করল।

কই, সিঁদুরের চিহ্নও তো নেই। আজকাল অবশ্য ওসব বর্বর প্রথার সামিল হ'য়ে গেছে। সত্যি ব্যাপারটা কি, বল তো?

রমলা অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

আকাশের চোখে নীলাঞ্জনমায়া। পাতলা কুয়াশার মতো রোদের পাতলা একটা পর্দা কাঁপছে চোখের সামনে। লোকজন, যানবাহন সব যেন অস্পষ্ট।

রমলার নির্দেশে রিক্সা থামল। নেমেই আরতি অবাক।

পরিচ্ছন্ন, সৌখিন বাড়িটার কেমন হতশ্রী অবস্থা। নীচের ঘরে একপাল লোক ঘুরছে। গেটের ওপর রাজীব রায়ের নামলেখা পিতলের ফলকটাও বিবর্ণ।

আরতি কোন কথা বলল না। রমলার পিছন পিছন ওপরে গিয়ে উঠল।

আবতিকে রমলা একেবারে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে এল।

বিছানায় বসিয়ে পাশে বসল।

আরতি চেয়ে চেয়ে ঘরদোরের অবস্থা দেখল, তারপর বলল, কি ব্যাপাব বল তো? কোথায় যেন কি একটা হয়েছে!

বড় কিছু একটা হাওয়ার মধ্যে, বাবা আর নেই।

সেকি! কি হয়েছিল?

থ্রম্বসিস। রমলা অন্যদিকে চেয়ে চোখে আঁচল চাপা দিল, তারপর একটু সামলে নিয়ে বলল, একেবারে হঠাৎ। অজ্ঞান অবস্থায় কোর্ট থেকে নিয়ে এলেন অন্য উকিলেরা। দুটো পায়ে একেবারে জোর ছিল না। তারপর একটু যেন ভাল হয়ে উঠছিলেন। একেবারে সেরে কোনদিনই উঠতেন না, তবু মানুষটা তো থাকতেন চোখের সামনে। মাঝরাতে চেঁচামেচি শুনে উঠে পড়লাম। তখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে। উঠতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে বোধহয় পড়ে গিয়েছিলেন, আর উঠলেন না।

শেষদিকে রমলার কণ্ঠস্বর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

অনেকক্ষণ কোন কথা হল না। হাঁটুর ওপর মুখ রেখে রমলা চুপচাপ বসে রইল জানলার দিকে চেয়ে।

রমলার পিঠে হাত রেখে আরতিও নিস্তব্ধ হয়ে রইল। এমন থমথমে আবহাওয়ায় কোন কথা যেন বলা চলে না। দুজনকে ঘিরে শোকের প্রবাহ উত্তাল হয়ে উঠেছে।

অনেক পরে আরতি আস্তে আস্তে বলল, সেইজন্য বুঝি তোদের বিয়েটা পিছিয়ে গেল? একটা বছর তো অপেক্ষা করতেই হবে।

রমলা আরতির দিকে মুখ ফেরাল। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে, তারপর বলল, বিয়েটা চিরজীবনের মতন পিছিয়ে গেছে।

তার মানে?

মানে, জয়ন্ত বিয়ে করেছে। জয়ন্ত বিলেতে আছে, বোধহয় শুনিস নি? সেখানেই এক আইরিশ মহিলাকে বিয়ে করেছে।

আইরিশ মহিলাকে? আরতির দু'চোখে বিস্ময়ের ঝিলিক, জয়ন্তর মাও তো আইরিশ ছিলেন, শুনেছি।

হ্যাঁ, তিনিই ঘটকালি করেছেন।

জয়ন্তর মাও বুঝি বিলেতে?

হ্যাঁ, জয়ন্তর বাবার সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তিনি এদেশ ছেড়ে চলে গেছেন।

একটু একটু করে আরতির মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে অনেক কষ্টে সে নিজেকে যেন সংযত করল। সোজা রমলার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, কি কৈফিয়ত দিল জয়ন্ত?

কিসের কৈফিয়ত?

তোর সঙ্গে এমন ব্যবহারের? সারা কলেজে তো সবাই জানত জয়ন্ত তোর অনুরক্ত। তুইও তাকে যথেষ্ট আস্কারা দিতিস। জয়ন্তকে তুই বিয়ে করবি এমন কথা আমাকে অনেকবার বলেছিস। জয়ন্তর ওভাবে মন বদলাবার কারণ?

আইরিশ মেয়েটি বোধহয় আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী।

চালাকি রাখ রমলা। জয়ন্ত শেষ পর্যন্ত কি বলে পিছিয়ে গেল, তাই বল?

যারা পিছিয়ে যাবার মন নিয়ে এগিয়ে আসে তাদের কৈফিয়ত দিতে হয় না আরতি।

কথার হেঁয়ালি দিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবি না। মুখের হাসিতে চোখের জল লুকানো যায় না। জয়ন্ত কিছু বলে নি তোকে?

না। কিছু বলে নি। মাস মাস আমার পাঠানো টাকা হাত পেতে গ্রহণ করেছে। মাঝে মাঝে নানা ছুতোয় বাড়তি টাকা চেয়েছে, তাও পাঠিয়েছি, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কোন কথা আমায় লেখে নি। আমি বিলেতফেবত একটি ভদ্রলোকের কাছ থেকে সব কথা জানতে পেরে যখন জয়ন্তকে লিখলাম, তখন সে সব স্বীকার করল।

স্কাউণ্ড্রেল! আরতি দুটো হাত মুঠো করে ফেলল।

তুই ভাগ্য মানিস আরতি? নিয়তি?

আরতি ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, মানি।

আমি আগে কিছু মানতাম না। ভাবতাম গ্রহনক্ষত্রের কাজ নিছক আকাশ সাজানো। পৃথিবীর মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে তাদের কোন হাত নেই। কিন্তু আঘাতের পর আঘাত পেয়ে মনে হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যা নয়। মানুষের জীবনের সঙ্গে গ্রহের অচ্ছেদ্য গ্রন্থি। আমি নিজের জীবনে সব কিছু প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি। নয়তো এভাবে দমকা বাতাসে তাসের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হওয়ার মতন আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত না।

আরতি একদৃষ্টে রমলার দিকে চেয়ে রইল। ব্যারিস্টার রাজীব রায়ের একমাত্র সন্তান, তার একদা-সহপাঠিনী রমলার চিহ্নমাত্রও যেন নেই সামনে বসা মেয়েটির মধ্যে। সেদিনের প্রাণোচ্ছল,

আনন্দময়ীর রূপান্তর এই ব্যর্থজীবনের ভগ্নস্তূপ, এ যেন বিশ্বাস করতে মন চায় না।

তুই এখন কি করবি ? আরতি জিজ্ঞাসা করল।

চাকরির চেষ্টা করছি।

তুই সিরিয়স ?

বিশ্বাস কর, চাকরির আমার খুব দরকার। এতদিন ভেবেছিলাম, নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য নতুন পরিবেশে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রয়োজন আছে, কিন্তু বর্তমানে অর্থের জন্য, নিজেকে বাঁচাবার জন্য চাকরি আমায় একটা খুঁজে নিতেই হবে।

তুই স্কুলমাস্টারি করবি ?

কেন করব না। কিন্তু পাচ্ছি কোথায় ?

যদি কলকাতার বাইরে হয় ?

আরো ভাল। এই শহরের পথে-ঘাটে আমার জীবনের ভুলের হাজার স্মৃতি ছড়ানো। রক্ত ঢেলেও সে কলঙ্ক মোছা সম্ভব নয়। একমাত্র উপায়, এখান থেকে সরে যাওয়া।

আমি কলকাতার বাইরে এক স্কুলে চাকরি করছি। আরতি বলল।

কলকাতার বাইরে ? কোথায় ?

আসানসোল। ভবতারিণী বিদ্যামন্দির। আমাদের অবস্থা তো জানিস। সংসারে রোজগারের হাত বাবার একলার, কিন্তু খাবার মুখ অনেক। আমার এখনও ছোট ভাইবোন আছে গোটা চারেক। তাদের মানুষ করতে হবে।

তোদের ওখানে কি চাকরি খালি আছে ?

এখন নেই। তবে নতুন স্কুল। ক্লাস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকাও বাড়বে। তুই একটা দরখাস্ত আমায় দিয়ে রাখ। আমি সুযোগ বুঝে সেক্রেটারির কাছে পেশ করব।

কথাটা বলেই আরতি যেন একটু চিন্তা করল, তারপর বলল, কিন্তু তুই যাবিই বা কি করে ?

কেন ?

বাড়িঘর তাহলে তো খালি পড়ে থাকবে।

বাড়িঘরের ওপর আমার মোহ খুব নেই আরতি। তা ছাড়া, যদি আমি বাইরে যাই, একতলাটা যেমন ভাড়া দিয়েছি, ওপর-তলাটাও তাই করব।

আরতি কোন কথা বলল না। একটু পরে রমলা উঠে বাইরে গেল। মিনিট দশেক পরে বিন্নুর মাকে নিয়ে ফিরল। বিন্নুর মার হাতে ট্রের ওপর ধূমায়িত চায়ের কাপ আর খাবারের ডিশ।

আরতি ব্যস্ত হয়ে উঠল, এসব লৌকিকতা আবার তুই কেন করতে গেলি ?

রমলা ম্লান হাসল, এটুকু অন্তত আমায় করতে দে। এতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল। তা ছাড়া তুই চাকরি করে দিবি, তোকে তো একটু তোয়াজও করতে হবে।

আরতি আর কথা বলল না।

আরতি যাবার সময় নিজের ঠিকানা দিয়ে গেল আর মাঝে মাঝে চিঠি লেখার প্রতিশ্রুতি।

ঠিক দু'দিন পরে সতীপ্রসন্নবাবু এলেন।

রমলা একটু বেরোচ্ছিল, কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কেনা দরকার, দরজার কাছে সতীপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে দেখা।

বেরোচ্ছ নাকি ?

একটু মার্কেটের দিকে যাবার দরকার ছিল।

ওপরে এস, কথা আছে।

রমলা ওপরে উঠে এল। পিছন পিছন সতীপ্রসন্নবাবু।

সতীপ্রসন্নবাবু একেবারে কাজের কথা পাড়লেন।

বড় মুশকিল হ'ল যে মা।

আশা করেছিলেন, রমলা একটা উত্তর দেবে, কিন্তু রমলার দিক থেকে কোন সাড়া এল না।

তাই তিনি আবার বললেন, ওরা তো আর দেরি করতে রাজী নয়। বলছে, অনেকগুলো টাকা, ক্রমেই তো সুদে ভারী হচ্ছে। কি করা যায় বল তো মা? ওদের ধরে কিস্তির বন্দোবস্ত করার কথাও বলেছিলাম কিন্তু তাতেও রাজী হচ্ছে না।

ব্যাঙ্কে বাবা বিশেষ টাকা রেখে যান নি। রেখে গেলে এভাবে বাড়িতে ভাড়াটে বসানো হত না। আপনি তো সবই জানেন।

জানি বলেই তো এতটা বিচলিত হয়েছি মা। মিস্টার রায় শেষজীবনে এমন একটা কাঁচা কাজ করে যাবেন ভাবতেও পারি নি। শেয়ারের নেশায় কবে থেকে মেতে উঠেছিলেন, তাও জানতে পারি নি।

এখন আর ওসব কথা ভেবে লাভ কি বলুন। কিভাবে ঋণ শোধ করা যায়, সেই চিন্তাই করা উচিত।

উপায় তো আমি কিছু দেখছি না মা।

দৃঢ়, সংযত গলায় রমলা বলল, এ বাড়ি রেখে কোন লাভ নেই। বিক্রি করে দেনা মিটিয়ে দিন।

সতীপ্রসন্ন চমকে উঠলেন। অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে রমলার আপাদমস্তক দেখলেন। বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হল না যে মিতবাক্, শান্ত মেয়েটির মুখ থেকে এমন একটা সর্বনাশা কথা বেরোতে পারে।

তুমি, তুমি থাকবে কোথায়? সতীপ্রসন্নবাবু থেমে থেমে প্রশ্ন করলেন।

যে কোন একটা আস্তানা খুঁজে নেব। পিতৃঋণ শোধ না করে এ বাড়িতে বাস করার আমার কোন অধিকার নেই।

একেবারে বিক্রি না করে, মর্টগেজ রেখে কিছু টাকার ব্যবস্থা করলে হয়।

এক গর্ত বুজোবার জন্য আর এক গর্ত খুঁড়ে লাভ কি বলুন?

সেখানেও তো সুদের পরিমাণ বাড়বে। কোথা থেকে এসব শোধ করব? তা ছাড়া বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়াই ভাল। দেনা শোধ করে যা বাকি থাকবে, কোন ব্যাঙ্কে রেখে দেব। হঠাৎ প্রয়োজনে আমার কাজে লাগবে।

কিন্তু তুমি কি করবে? তোমার ভবিষ্যৎ জীবন?

রমলার হাসি পায়। ওর সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ভবিষ্যৎ জীবনের কথা কেউ বললে, ওর জন্য দরদ দেখালে, বাঁধ ভেঙে হাসির বেগ সারা দেহে ছাপিয়ে পড়ে। এই আন্তরিকতার ভানটুকু তখন হয়তো ভাল লাগত, কিন্তু এখন, জীবনের চোরাগলি বেয়ে এতটা পথ হেঁটে এসে, দু'পাশে অজস্র মানুষের মুখোস-ঢাকা মুখ দেখতে দেখতে সারা পৃথিবীর ওপর একটা বিতৃষ্ণা এসেছে, জীবনের ওপর বীতস্পৃহা।

সতীপ্রসন্নবাবুর দু'চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক লক্ষ্য করেছিল কিন্তু সেই সময় রমলা তার অর্থ বুঝতে পারে নি। অর্থ বুঝতে পারার অভিজ্ঞতা তার হয় নি। তারপর মানুষ ঘেঁটে ঘেঁটে মনুষ্যচরিত্র বুঝতে রমলার আর অসুবিধা হয় না। শুধু একটা ভদ্রতার আবরণ, মনুষ্যত্বের খোলস জড়ানো। সেই আবরণ সরে গেলে, সেই খোলস পড়ে গেলে নখদন্ত সমন্বিত একটা জন্তুর পূর্ণ অবয়ব প্রকট হ'য়ে পড়ে।

প্রায় মাসখানেক পরে আরতির চিঠি এল। একটা ভাল কাজ পেয়ে সে কোচবিহার বদলি হয়ে যাচ্ছে। রমলা যদি রাজী থাকে, তাহলে তার জায়গায় আসতে পারে।

তিনদিনের মধ্যে আরতি উত্তর চেয়েছে।

রমলা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে দিল। এখানকার কাজকর্ম চুকতে আর দিন দশেক, তারপরেই রমলা রওনা হতে পারবে কর্তৃপক্ষদের আরতি যেন রমলার কথাটা বলে রাখে।

ইতিমধ্যেই বাড়ির বাড়তি আসবাব রমলা বিক্রি করে দিয়েছিল। রাজীব রায়ের এক পুরোনো মক্কেল ছিল ফার্নিচারের দোকানের মালিক। তিনি প্রায় সব কিনে নিলেন।

বেয়ারা আর বিন্নুর মাকেও জবাব দিয়ে দেওয়া হল। বেয়ারাটা খুব পুরোনো নয়। পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে সেলাম করে সরে গেল। কিন্তু মুশকিল হ'ল বিন্নুর মাকে নিয়ে। বহুদিন এ বাড়িতে আছে। এ বাড়ির নাড়ীর সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে গেছে। স্বপ্নেও ভাবে নি, এ আশ্রয় ছেড়ে কোথাও তাকে চলে যেতে হবে।

মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে বিন্নুর মা কাঁদতে লাগল। সে কোথাও যাবে না। দিদিমণির সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

রমলা কাছে বসে তাকে অনেক বোঝাল। সে নিজে কোথায় যাবে, পরগাছার মতন কোন ডালে আশ্রয় নেবে, নিজেই জানে না, কাজেই বিন্নুর মাকে কি করে সঙ্গে নেবে। তার চেয়ে বিন্নুর মা মেদিনীপুরে নিজের ছেলের কাছে চলে যাক। ছেলে সাইকেলের দোকানে কাজ করে। ছুটো পেট অনায়াসেই চলে যাবে। এ বয়সে আর তার চাকরি-বাকরি করার দরকার নেই।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বিন্নুর মা উঠে বসল। রমলার দিকে ফিরে বলল, তুমি কোথায় যাবে দিদিমণি?

তার কিছু ঠিক নেই রে। যেখানে চাকরি পাব, সেখানে চলে যেতে হবে। আমার সঙ্গে আর তোকে জড়াতে চাই না। তবে একটা কথা দিচ্ছি, যদি অবস্থা ফেরে, নিজের পায়ে ভাল-ভাবে দাঁড়াতে পারি, তাহ'লে তোর ঠিকানা তো রইলই আমার কাছে, আমি চিঠি লিখে তোকে আনিয়ে নেব।

বিন্নুর মা কি বুঝল কে জানে। বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

রমলার আসানসোল যাবার আর ছু'দিন। প্রায় প্রত্যেকটি ঘরই খালি, আসবাব বিবর্জিত, কিন্তু স্মৃতির ভারে ঠাসবোঝাই।

রমলা ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। তার পড়ার ঘর, শোবার ঘর, বাপীর শোবার ঘর, কাজ করার ঘর, দক্ষিণের দীর্ঘ টানা বারান্দা। নিজেদের প্রসারিত করে বাঁচবার রাজসূয় ব্যবস্থা। কিন্তু এইবার! দুর্যোগের মুখে পাখি যেমন নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বসে থাকে, তেমনি রমলাকে নিজেকে সঙ্কুচিত করে বাঁচতে হবে। জীবনযাত্রার মাপা হিসাবের চৌহদ্দির মধ্যে।

এপাশ ওপাশ করতে করতেই রমলার চোখে পড়ল মেঘের ফাঁক দিয়ে ম্লান জ্যোৎস্নার ঝিলিক। বকুলের ডালে, কারাপ্রাচীরের কাঁচগুলোর ওপর, রমলার শীর্ণ শিরাপ্রকট দেহে তারই স্পর্শ।

রমলা যখন থাকবে না, তখনও চলবে মেঘে চাঁদে এমনি লুকোচুরি খেলা। এই কক্ষে শুয়ে শুয়ে আর একজন কয়েদী হয়তো মরণের পদধ্বনি শোনার আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠবে।

রমলা কিন্তু ভয় পায় নি। তিল তিল করে প্রতি পলে এভাবে মৃত্যুর চেয়ে মুহূর্তের মধ্যে মুছে যাওয়া, সে তো অনেক গুণে কাম্য। রমলার কোন আপসোস নেই। পঙ্কিল এই পৃথিবীতে বাঁচবার কোন আকাঙ্ক্ষা নয়। ওর মনে হয়, এইভাবে চরম দিনের অপেক্ষা না করে, ও যদি এগিয়ে যেতে পারত উল্কা-বেগে। যে বরমাল্য জীবনের উষায় পায় নি, সেই বরমাল্য জীবন-মধ্যাহ্নে নিজের গলায় পরতে পারত, তাহ'লে চোখ বুজতে পারত পরম প্রশান্তিতে।

রমলা উঠে বসল। ঘুম আসে না। অনেক চেষ্টা করেছে। দিনের পর দিন কামনা করেছে ঈশ্বরের কাছে, কয়েক ঘণ্টার নিদ্রার জন্য। কিন্তু পায় নি। চোখ বন্ধ করলেই মনের পটে বিশ্রী সব ছবি ফুটে উঠেছে। মাথার শিরা উষ্ণ প্রস্রবণের রূপ নিয়েছে। ঘুম আসে নি, ঘুমে নাগাল পায় নি রমলা।

সেদিন খবর এনেছিল ভাড়াটেদের একটি ছোট ছেলে।

বিনুর মা রান্নাঘরের সামনে ঘুমাচ্ছিল। রমলা একলা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিল।

ছেলেটি দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

কে? রমলা চমকে উঠল।

আজকাল এমনই হয়েছে রমলার। কোথাও সামান্য শব্দ হলেই চমকে ওঠে। স্নায়ুতে শিরায় বিদ্যুৎ-স্পন্দন।

আপনাকে কে একজন ডাকছেন।

আমাকে? আমাকে কে ডাকবে?

তা তো জানি না, একটি বুড়ো মতন ভদ্রলোক। নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।

বুঝতে রমলার কোন অসুবিধা হল না। সৌরীন ঘোষাল এসেছেন বাড়ি খুঁজে খুঁজে। জয়ন্তর বাবা।

রমলা নিজের আধময়লা শাড়ীর দিকে একবার চাইল। ভাবল শাড়ীটা পাল্টে নেবে। তারপর নিজের মনেই হেসে ফেলল। শাড়ী পাল্টালেই যেন অবস্থা পাল্টানো যাবে।

তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

ভাড়াটেদের ছেলেকে বিদায় দিয়ে রমলা হাত দিয়ে চুলটা ঠিক করে নিল, শাড়ীটা গুছিয়ে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়েই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গৌরবর্ণ দীর্ঘ চেহারা, মাথায় সুপুষ্ট শিখা, অঙ্গে ফতুয়ার ওপর খদ্দরের চাদর। ধুতি হাঁটুর সামান্য নীচে। ধীরে ধীরে পদ-চারণা করছেন।

সিঁড়িতে শব্দ হতেই ঘুরে দাঁড়ালেন। আয়ত দুটি চোখ প্রজ্জ্বলিত। বয়স হয়েছে কিন্তু বয়সের ভার নামে নি দেহে।

তুমি কি রাজীবের মেয়ে? গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

খুব স্তিমিত গলায় রমলা উত্তর দিল, হ্যাঁ।

তুমি আমায় চিনবে না। চিনতে পারার কথাও নয়। আর একবার যখন এসেছিলাম, তুমি খুব ছোট। এতটুকু।

হাত দিয়ে ভদ্রলোক সেদিনের রমলার দৈর্ঘ্য দেখালেন।

বিড়বিড় করে বলতে গিয়েও রমলা থেমে গেল। ভাবল যদি তার অনুমান ঠিক না হয়।

ভদ্রলোক আত্মপরিচয় দিলেন, আমি নীরোদ বোস। রাজীবের বাল্যবন্ধু।

তা হ'লে রমলা ঠিকই ভেবেছিল। কোনদিন দেখে নি কিন্তু চেহারা দেখে কেমন সন্দেহ হয়েছিল। আর একজন খুব জানালোকের প্রতিচ্ছায়া এঁব সর্ব অবয়বে। বিশেষ করে প্রশান্ত উজ্জ্বল তুটি চোখে।

আপনি, শান্ত—শান্ত—, রমলার কণ্ঠস্বর অসম্ভব কাঁপছে।

হ্যাঁ, আমি শান্তনুর বাবা। তোমার বাবার কোর্ট থেকে ফিরতে বোধহয় দেরি আছে? আমি প্রথমেই তোমাদের বাড়ি এলাম। রাজীবকে বলে তবে আর সবাইকে বলব।

খুব ধীর পায়ে রমলা এগিয়ে এল। নীরোদ বোসের সামনে দাঁড়িয়ে হেঁট হ'য়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল, তারপর বলল, আপনি শোনেন নি কিছু?

না তো, কি শুনব?

বাবা নেই। মারা গেছেন।

নীরোদ বোস দেয়াল ধরে নিজেকে সামলালেন। মুখ আর চোখেব পাশের মাংসগুলো কুঁচকে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বললেন, রাজীব নেই! আমার আগেই চলে গেল। আমি জানতেও পারলাম না।

আপনার ঠিকানা আমার জানা ছিল না, সেইজন্য খবর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

শান্তনু, শান্তনুও তো কিছু জানে না।

না, শান্তনুবাবুও কিছু জানেন না। তাঁকে ফোন করে শুনলাম তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি একবার ওপরে আসবেন না? বাবা নেই, আমি তো আছি। একটু বসে যাবেন না?

রাজীব নেই, তুমি আছ। বিড়বিড় করে নীরোদ বোস দু-একবার উচ্চারণ করলেন, তারপর রমলার পিছন পিছন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। বোঝা গেল সিঁড়িতে উঠতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। বার বার থেমে থেমে দম নিলেন।

সারা বাড়ির একমাত্র চেয়ারটা এনে রমলা নীরোদ বোসের সামনে এগিয়ে দিল।

চেয়ারের ওপর বসে নীরোদ বোস এদিক ওদিক চাইলেন, তারপর রমলার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, তুমি কি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ, এ বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। আমি আসানসোল চলে যাচ্ছি।

সেই ছেলেটি কি আসানসোলেই থাকে?

এবার রমলার মুখ রক্তাভ হয়ে উঠল। প্রশ্নটা বুঝেও, না বোঝার ভান করল। বলল, কার কথা বলছেন?

নামটা আমার সঠিক স্মরণ নেই মা। শান্তনুর কাছে নামটা শুনেছিলাম। যাকে তুমি জীবনে বরণ করে নিচ্ছ?

তীব্র ব্যথায় রমলা মুখটা বিকৃত করল। এরা কেউ তাকে অব্যাহতি দেবে না, নিষ্কৃতি নয়, সপ্তরথীর মতন তাকে বেষ্টন করে বাণে বাণে ক্ষতবিক্ষত করে তুলবে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বুঝি চলবে এই অত্যাচার। কৈফিয়ত দাবি করার অন্ত থাকবে না।

তবু রমলাকে বলতে হল।

আসানসোলের একটা স্কুলে আমি চাকরি নিয়ে যাচ্ছি।

ভ্রূকুঞ্চিত করে নীরোদ বোস কিছুক্ষণ স্থিরলক্ষ্যে রমলার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আমি ঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারছি না মা। কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়েছে। রাজীব খুব অসুস্থ হয়ে কোর্ট থেকে ফিরেছিল সে খবর শান্তনুর কাছে আমি পেয়েছি। আমার আর তোমার বাবার অনেক দিনের একটা ইচ্ছা ছিল দুজনের মধ্যে কুটুম্বিতার একটা সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আমরা ঠিক করেছিলাম তোমার সঙ্গে শান্তনুর বিয়ে দেব। এদিক-ওদিক তার বিয়ের কথা হতে আমি তাকে লিখেছিলাম তোমার কথা। আমার আর রাজীবের পূর্ব প্রতি-শ্রুতির কথা। তোমাকেও শান্তনুর ভাল লেগেছিল। তার চিঠিতে সে আভাস পেয়েছিলাম। আমিই তাকে লিখেছিলাম রাজীবের কাছে কথাটা পাড়তে। শান্তনুর ইচ্ছা ছিল তুমি বি. এ. পাস করলে রাজীবকে কথাটা বলবে। তাই সে বলেছিল কিন্তু, কিন্তু, নীরোদ বোস একটু দম নিলেন। বোঝা গেল এসব কথা আলোচনা করতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে।

একটু সামলে নিয়ে বললেন, তারপরই শান্তনুর চিঠি গেল, তুমি নাকি আর একজনকে কথা দিয়েছ। অবশ্য মানুষের মনের ওপর আর জোর চলে না। আমি আশীর্বাদ করি মা, দাম্পত্য-জীবনে তুমি সুখী হও। তোমার বেছে নেওয়া পতি যেন তোমার মঙ্গলের কারণ হয়।

রমলা ঘাড় হেঁট করে রইল। দু'গাল বেয়ে জলের ধারা মাটিতে পড়ল টপ টপ করে। এই সহানুভূতি, সমবেদনা সে সহ্য করতে পারে না। এর চেয়ে কঠিন তিরস্কার সে মাথা পেতে নেবে। তাই তার যোগ্য।

আমি যে কাজের জন্য এসেছি সেটা করে যাই মা। রাজীব নেই, আমার কিছু ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে আমাকে ফাঁকি দিয়ে যেন সে বেরিয়ে পড়েছে। কিছু না জানিয়ে। ঠিক আগে

আমাকে জব্দ করার জন্য স্কুল-জীবনে যেমন করত। কিন্তু সে বেশীদূর যেতে পারবে না মা, তাকে শীঘ্রই আমি ধরে ফেলব। আমার এই শেষ কাজটা বাকি ছিল। এবার আমি মুক্ত।

ফতুয়ার পকেট থেকে নীরোদ বোস চিঠির গোছা বের করলেন। তার মধ্যে থেকে একটা চিঠি বের করে রমলার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, চিঠিটা রাজীবের নামেই রয়েছে। আমি নিজের হাতে আর তার নামের আগে 'স্বর্গীয়' কথাটা লিখতে পারব না। সামনের শনিবার শান্তনুর বিয়ে। জানি না সে-সময়ে তুমি কোথায় থাকবে। বিয়ে হচ্ছে আমার দেশের বাড়িতেই। তোমার ওপর আমার জোর নেই। যদি যেতে পার, খুবই খুশী হব। আমাকে একটা চিঠি লিখে জানালেই আমি তোমাকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করব।

নীরোদ বোস উঠে দাঁড়ালেন। রমলার চিবুকে একটা হাত রেখে বললেন, আসি মা।

খুব নরম গলায় রমলা বলল, একটা কথা।

যেতে যেতে নীরোদ বোস ঘুরে দাঁড়ালেন, কি বল?

শান্তনুবাবুকে পুরোনো অফিসে টেলিফোন করেছিলাম। শুনলাম তিনি আর সেখানে নেই।

হ্যাঁ, শান্তনু এখন বম্বেতে কাজ করছে। ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ার্স কোম্পানীতে।

নীরোদ বোস চলে গেলেন। তিনি চলে যাবার অনেকক্ষণ পর রমলার খেয়াল হল, অন্যায় হয়ে গেছে। এমনি সময় ভদ্রলোক এলেন, কিছু দেওয়া উচিত ছিল। কয়েকটা মিষ্টি আর এক গ্লাস শরবত। বাপী থাকলে সম্বর্ধনাটা কেমন হত, তাও ভাবল রমলা। দুই বন্ধুতে এতদিন পরে দেখা। নিশ্চয় এত সহজে নীরোদ বোসের যাওয়া সম্ভব হত না।

বাপী বেঁচে থাকলে আর কি হত। আর কি হতে পারত।

নীরোদ বোসকে একান্তে ডেকে রাজীব রায় সব কথাই হয়তো বলতেন। বলতেন মেয়ের দুর্ভাগ্যের কথা। কিভাবে প্রবঞ্চনা আর প্রতারণার জন্য রমলার জীবন ব্যর্থ হতে চলেছে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে জয়ন্ত প্রয়োজনে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। শুধু গুটিয়ে নেওয়াই নয়, সাগরপারের শ্বেতাঙ্গিনীকে নিয়ে নতুন বাসা বেঁধেছে, রমলারই ভগ্ন-পাঁজরের খড়কুটো দিয়ে।

শান্তনুর বিয়ের চিঠিটা রমলা তুলে নিল। পাত্র শান্তনু বোস আর পাত্রী সতী রায়। এখানে রমলার নাম থাকতে পারত। শুধু রমলার একটি কথায়। শান্তনু তো এগিয়ে এসেছিল, নিজেকে নিবেদন করেছিল। অবশ্য তার বিশেষ ধরনে নিবেদন করা। এ যুগের জয়ন্তদের মতন পথে ঘাটে, সিনেমা, রেস্তরাঁয় গোপন কূজনে মন-দেওয়া-নেওয়ার খেলায় মাতে নি। আনুষ্ঠানিক ভাবেই এগিয়েছিল। রমলার বাপের কাছে কথাটা পেড়েছিল। বলেছিল রাজীব রায়ের মত থাকলে শান্তনুর বাবা আসবেন কথা কইতে। রাজীব রায় মেয়ের সম্বন্ধে পাকা কথা দিতে পারেন নি। মেয়ের মন জানবার জন্য সময় চেয়েছিলেন।

মেয়ের মন। এ যুগের মেয়েরাই কি নিজেদের মন জানে! মেকী সভ্যতার দুরন্ত ঘূর্ণিপাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হতে হতে মন বলে কোন পদার্থই বুঝি তাদের থাকে না। দশটা পুরুষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে চঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে নতুনত্বের মোহ হয়তো আছে, কিন্তু পবিত্রতা নেই, শান্তি নেই।

আজ বাপী থাকলে সত্যিই বুঝি এমন হত না। এভাবে পালছেঁড়া, দাঁড়ভাঙা নৌকার মতন ঢেউয়ের অস্থির বেগে রমলা টলমল করত না। কিছু একটা ব্যবস্থা হতই।

শান্তনুর বিয়ের চিঠিটা হাতের মধ্যে মোচড়াতে মোচড়াতে রমলার আর একটা কথা মনে এল। পাছে রমলার সঙ্গে এই শহরের পথে-ঘাটে দেখা হয়ে যায়, সেইজন্যই কি সে এ অফিসের

চাকরি ছেড়ে দিয়ে সুদূর বোম্বেতে পাড়ি দিল! রমলার সান্নিধ্য ছাড়িয়ে দূরে টেনে নিয়ে গেল নিজেকে। প্রত্যাখ্যানের অপমান থেকে নিজের পৌরুষকে বাঁচাবার এ ছাড়া আর বুঝি তার কোন উপায় ছিল না।

পূর্বদিকে অস্পষ্ট আলোর আঁচড়। ভোর হচ্ছে। রজনী মুছে যাচ্ছে তার সমস্ত ক্লেদ, সমস্ত কালিমা নিয়ে। আর একটা দিন আসছে। রমলার বন্দিনী জীবনের আর এক দুঃসহ দিন।

সামনে অনিশ্চিত অন্ধকার, পিছনেও তাই। কোন আশা, কোন আশ্বাসে নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়া যায় না। পুঞ্জীভূত তমিস্রা ঠেলে ঠেলে অর্থহীন এ জীবনযাত্রায় কি সঞ্চয় করেছে রমলা! সারা দেহ ভর্তি পাপ, মন ভর্তি অন্যায় চিন্তা, গ্লানি আর কাপুরুষতা। জীবনতরী পরিপূর্ণ। কেবল ভরাডুবির অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন-চিত্তে প্রহর গণনা।

আরো আলো আসছে। কারাপ্রাচীরের মাথায়, বকুলের ডালে, জেলখানার মৃত্তিকায় আলোর অভিসার।

হাতের উপর মাথাটা রেখে রমলা শুয়ে শুয়ে দেখল। এমনই এক মুঠো আলোর প্রতীক্ষায় সে সারাজীবন কাটিয়েছে। সূর্যমুখীর মতন নিজেকে তুলে ধরতে চেয়েছে আলোর উৎসের দিকে। কিন্তু বার বার পরাজিত হয়েছে। মাটির মধ্যে শিকড়ের রাশ অনুপ্রবেশ করেছে, জীবনও সেই পঙ্কের উর্ধ্বে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে নি।

এত ভোরেও কয়েদীরা উঠে পড়েছে। প্রহরীর সঙ্কেতে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। হাত-মুখ ধোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সবাই।

স্টেশনে আরতি নিতে এসেছিল। ট্রেন থেকে রমলা নামতেই

সে ছুটে কাছে গেল। রমলাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোকে দেখলে জীবনটা যেন অনিত্য বলে মনে হয়, রমলা।

স্যুটকেসটা এক হাত থেকে আর এক হাতে নিয়ে রমলা বলল, কেন রে?

জানিস তো কলেজে তোকে আমরা কি ঈর্ষা করতাম। তোর সাজ-পোশাক, চাল-চলন সব নকল করতাম, আবার হিংসা করতেও ছাড়তাম না। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে আমরা, ভাবতাম তুই আমাদের চেয়ে কত উঁচুতে, মগডালের ফুল।

রমলা হাসল, আর এখন দেখছিস সেই মগডালের ফুল পথের ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে, তাই না? তুই তো দর্শনের ছাত্রী, পড়িস নি, ধুলোই সবচেয়ে অবিনশ্বর। পৃথিবীর সব কিছুই একদিন রূপান্তরিত হবে এই ধুলোয়।

তুই কি করে হাসছিস রমলা? তোর মতো অবস্থা আমার হলে, আমি ভেঙে পড়তাম।

জানিস না আরতি, একজাতের পাখি আছে যাদের বুকে কাঁটা না বিঁধলে তারা গান গাইতে পারে না। মনে কর আমি সেই ধরনের এক বিহঙ্গ।

আরতি আর কথা বাড়াল না। রমলার পাশাপাশি চলতে চলতে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল।

দুজনে সাইকেল-রিক্সায় উঠল। পায়ের কাছে রমলার স্যুটকেস আর বিছানা।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরে রমলা প্রশ্ন করল, তোদের স্কুল আর কতদূর রে আরতি?

এই তো আর একটুখানি।

বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল। সাদা দু'তলা বিল্ডিং। সামনে কাকচক্ষু সায়র। চারপাশে নারকেলগাছের সার।

সাইকেল-রিক্সা গেটের মধ্যে দিয়ে একটা একতলা বাড়ির

সামনে গিয়ে থামল। আরতি আর রমলা নামতেই আশপাশের জানলায় অনেকগুলো মেয়ের মুখ দেখা গেল। কৌতূহলী তু-একজন বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

এই আমাদের আস্তানা।

শহরের রূঢ়তা থেকে গ্রামীণ শান্ত পরিবেশ খুব ভাল লাগল রমলার। এখানে দাঁড়িয়ে ক্ষণেকের জন্যও মনে হল পৃথিবীতে শান্তি আছে, মমতা আছে। সবাই, সব কিছু বুঝি নিষ্করুণ নয়।

ভারি চমৎকার জায়গা তো, রমলা একটু দূরে দাঁড়ানো মেয়ের কান বাঁচিয়ে বলল, এমন জায়গা ছেড়ে কোচবিহার চলে যাচ্ছিস কেন?

আরতি হাসল, কি করব ভাই, চিঠিতে এখানকার সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছিলাম, তাতে মধ্যবিত্ত বাপ আর নাবালক ভাইবোনদের পেট ভরল না। এখানে যা মাইনে পাই, কোচবিহারে তার চেয়ে প্রায় চল্লিশ টাকা বেশী পাব। আপাতদৃষ্টিতে সিনারীর চেয়ে সেটাই বেশী লোভনীয় মনে হল।

ছোট কামরা। একপাশে একটা সিঙ্গল খাট। কোণে একটা টেবিল, একটা চেয়ার। দেয়ালে আয়না। আরতির সংসার। রান্নাবান্নার জন্য একজন লোক আছে। প্রতিমাসে এক একটি মেয়ে তদারকের ভার নেয়।

আরতি রমলার জিনিসগুলো একদিকে সরাতে সরাতে বলল, কাল সকালে তোকে সেক্রেটারির বাড়ি নিয়ে যাব। তাঁকে বলেই রেখেছি। কোন অসুবিধা হবে না। আমার যেতে এখনও দিন চারেক। তার মধ্যে আমার সংসারে তোকে প্রতিষ্ঠিত করে যাব।

মেয়ের দল তু-একজন করে দরজার মুখে জমায়েত হল। তার মধ্যে বর্ষীয়সী একজন একটু এগিয়ে এসে বলল, এঁরই বুঝি আসবার কথা ছিল, আরতি?

হ্যাঁ, সুলতাদি। এস আলাপ করিয়ে দিই। এই আমার বন্ধু

রমলা। রমলা রায়। আর ইনি সুলতা হাজরা। ভবতারিণী বিদ্যামন্দিরের হেড-মিস্ট্রেস।

রমলা দাঁড়িয়ে দুটো হাত জোড় করে বলল, আপনাদের আশ্রয়ে এসে পড়লাম।

সুলতা আরো কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, আমাদের আশ্রয়ে আর কি। জাহাজের এক বন্দরে রাত কাটানোর মতন। রাতের বেলা কাছাকাছি ঘেঁষাঘেষি দাঁড়াব, দুলব একই তরঙ্গের দোলায়, আবার ভোর হলে কে কোথায় সরে যাব ঠিক আছে?

রমলা মুখ তুলে দেখল। সুলতার চোখ দেখা গেল না। আপাতত হাই পাওয়ার কাঁচের আড়ালে তারা উধাও। জাহাজের উপমা সুলতা কেন দিল। নিজের সম্বন্ধেও রমলার বার বার এই একটা উপমাই মনে এসেছে। মাস্তুলভাঙা, জরাজীর্ণ জাহাজ, নিরাপদ বন্দরের আশায় দিনের পর দিন দুলতে দুলতে চলেছে তরঙ্গের মাথায় মাথায়।

রমলার মতন সুলতারও কি প্রতিকূল ঝড়ের বাতাসে সব কিছু ভেঙেছে। মাস্তুল, হাল, নিরুদ্বেগে এগিয়ে চলার সমস্ত শক্তি।

আরো দু-একজন মেয়ের সঙ্গেও আলাপ হল। আলাপ করিয়ে দিল আরতি।

রমলার এ পরিবেশ ভাল লাগল। মাঝখানের অন্ধকার দিনগুলো মুছে পায়ে পায়ে আবার যেন সে তার কলেজের দিনগুলোর মধ্যে ফিরে গেল। শুধু পাশে জয়ন্ত নেই। মূর্তিমান প্রবঞ্চনা আর ছলনা।

ভাবতেও রমলার সারাটা দেহ ঘৃণায় শিউরে উঠল। কি দেয় নি জয়ন্তকে? নিজের কৌমার্য ছাড়া, তার মনপ্রাণ, সমস্ত আবেগ উদ্দীপনা, প্রেম নিঃশেষে অর্পণ করেছে। আর প্রতিদানে কি দিয়েছে জয়ন্ত। কতটুকু!

রমলার বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে নিজের সাফল্যের রথ চালিয়েছে

দুর্দম বেগে। তার সব কিছুর পরিবর্তে, নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জন করার চেষ্টা করেছে।

জানলায় দাঁড়িয়ে অনেক দূরে তাল-নারিকেলের মাথায় মাথায় অস্তসূর্যের শেষ সোহাগের আবির ছড়ানো দেখতে দেখতে কথাটা রমলার মনে পড়ে গেল।

এমনও হতে পারে, লেখাপড়া শেষ হলে, ব্যারিস্টারি সনদ নিয়ে জয়ন্ত কলকাতায় ফিরে আসবে। সঙ্গে নীলনয়না শ্বেতাঙ্গিনী। চলতে-ফিরতে পথে-ঘাটে দেখাও হয়ে যেতে পারে রমলার সঙ্গে। আসানসোল থেকে কলকাতা আর কতদূর। মাঝে মাঝে রমলাকে কলকাতায় যেতে হবে। স্কুলের কাজে কিংবা নিজের কাজে। বাড়ি বিক্রি করে দেনা শোধ করার পর যে উদ্‌বৃত্ত টাকাটা হাতে এসেছে তার একটা ব্যবস্থা করতে তাকে যেতে হবে কলকাতায়। সাহস করে সতীপ্রসন্নবাবুর হাতে আর এ কটা টাকা রমলা তুলে দিতে পারে নি। যদিও এ বিষয়ে সতীপ্রসন্নবাবুর আগ্রহের অভাব ছিল না।

তা হলে রমলা কি করবে। অপরিচিতের ভান করে মুখ ফিরিয়ে যাবে, না হেসে এগিয়ে গিয়ে জয়ন্তকে সম্বর্ধনা জানাবে মনোমতো প্রণয়িনী লাভ করার জন্য।

এ ছাড়া রমলা আরো একটা কাজ করতে পারে। মুখোমুখি দাড়িয়ে তার দেওয়া প্রতিটি পাই ফেরত চাইতে পারে। জয়ন্তব চিঠিগুলো সব তার কাছে রয়েছে। একটিও সে ছেঁড়ে নি। ছিঁড়তে পারে নি। মানুষের মতন এমন আশ্চর্য পদার্থ বুঝি পৃথিবীতে নেই। মানুষের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কবে ঘুচে গেছে, অথচ কয়েকটা কাগজের টুকরোর ওপর এত মমতা!

আর একটা কথা মনে হতেই রমলা চমকে উঠল। না, না, এমন কামনা সে কখনও করে নি। কোনদিন নয়। নাই যদি করেছে, তবে অবচেতন মনের গোপন গুহা থেকে সরীসৃপের মতন

এমন চিন্তা কি করে বেরিয়ে এল? তবে কি নিজেরও অলক্ষ্যে মনের গোপনে এমন একটা বাসনা অঙ্কুরিত হচ্ছিল!

জয়ন্তর মা আইরিন ঘোষাল নির্মম হাতে দাম্পত্যজীবনের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে আইরিন ও'হারা হয়েছিলেন। স্বামীর দিকে চোখ তুলে দেখেন নি। ছেলের দিকেও নয়। শুধু ছেলেকে নিজের আওতার মধ্যে পেয়ে তাকে সৌরীন ঘোষালের সংসার গুঁড়িয়ে ফেলার ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

জয়ন্তর নবপরিণীতা বধূও আইরিন ও'হারার মতনই আয়ার্ল্যাণ্ডের মেয়ে। যদি তারও সংসারে অতৃপ্তি জাগে, বিস্বাদ লাগে দাম্পত্য-জীবন, বিদ্বেষের স্ফুলিঙ্গ একটু একটু দাবানলের রূপ নেয়! তা হলে সৌরীন ঘোষালের মতন জয়ন্তও সব হারাবে।

কিন্তু তখন যদি রমলা সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। পূর্বপরিচিতির সনদ নিয়ে, জয়ন্তর বিধ্বস্ত সংসারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে, আমি এসেছি। এ সংসার গেছে যাক। এস আবার আমরা দুজনে নতুন সংসার গড়ি। শ্বেতাঙ্গিনী তো তোমার চোখের নেশা। আদিতে আমি ছিলাম, অন্তেও থাকব। আমাকে বরণ করে নাও।

এমনও তো হতে পারে। জয়ন্ত আবার ফিরে আসবে তার কাছে। দুদিনের বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্ন মুছে যাবার মতন, জয়ন্তর প্রবাসজীবনের সব কথা, সব চিহ্ন বিস্মৃতির সামনে বিলীন হবে।

দু হাতে মাথাটা টিপে ধরে রমলা জানলার কাছ থেকে সরে এল। সাঁড়াশীর মতন অন্যায় এক চিন্তা যেন শ্বাসরোধ করে দিচ্ছে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে রমলার।

কি রে, ক্লান্ত লাগছে? আরতি জিজ্ঞাসা করল।

না, মাথাটা একটু ধরেছে। রমলা কৈফিয়তের সুরে বলল।

শুয়ে পড় বরং। খাবার তৈরী হলে আমি ডাকব তোকে।

না, না, রমলা আরতির কাছে সরে এল। জানে না আরতি, বিছানায় গেলেই রাশি রাশি চিন্তাকীট তাকে ছেয়ে ফেলবে। কুরে

কুরে খাবে স্নায়ু, মজ্জা, মেদ, নিঃশব্দে শোণিতের শেষবিন্দু লেহন করে নেবে।

তার চেয়ে লোকের কাছে, লোকের মাঝখানে রমলা থাকতে চায়, তা'হলে ভাবনার ভূতটা আর পিছু নিতে পারবে না।

না, শুলে আমার মাথাধরাটা বাড়ে। চল বাইরে গিয়ে একটু বসি। তুই চলে যাবি, ভাবতে ভাল লাগছে না।

রমলা আর আরতি দুজনে বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসল।

পরের দিন সকালে আরতি রমলাকে স্কুলের সেক্রেটারির বাড়ি নিয়ে গেল।

কাছেই বাড়ি। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। নিজের মার নামে স্কুল করেছেন। দৌড়ঝাঁপ করে কিছু সরকারি সাহায্যও পেয়েছেন। ইচ্ছা আছে, স্কুলটিকে এ তল্লাটের সেবা প্রতিষ্ঠান করে তুলবেন।

আরতি আর রমলা যখন গিয়ে পৌঁছল, ভদ্রলোক নীচের ঘরে আরাম-কেদারায় বসে ছিলেন।

আরতি রমলার পরিচয় করিয়ে দিল।

আমার বন্ধু রমলা। একসঙ্গেই আমরা বি. এ. পাস করেছিলাম। এর বাবা ব্যারিস্টার রাজীব রায়। হঠাৎ মারা যাওয়াতে বেচারি বড় বিপদে পড়েছে। সব কথাই আপনাকে আগে বলেছিলাম।

সেক্রেটারি তুলসীবাবু চশমার মোটা কাঁচের মধ্য দিয়ে রমলার আপাদমস্তক দেখলেন, তারপর আরতির দিকে ফিরে বললেন, তুমি তো জানো মা, স্কুলটি আমার মায়ের নামে উৎসর্গ করা। এ প্রতিষ্ঠানে আমি এমন শিক্ষিকা চাই, যারা শিক্ষাকেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করবে। শুধু কিছুদিন সময় কাটাবার জন্য সখের শিক্ষকতা করা যাদের লক্ষ্য, তাদের আমি চাই না। আমি দেখেছি অনেকে স্কুলে পড়াতে আসে, জীবনে আর কিছু পাচ্ছে না বলে। এখানে পড়ায় বটে, কিন্তু লক্ষ্য থাকে অন্য কোন চাকরির ওপর।

ফলে সে নিজেও একনিষ্ঠ হতে পারে না, আর স্কুলের মেয়েরাও খুব অসুবিধায় পড়ে।

আরতি মেঝের দিকে চেয়ে বলল, আপনি আমার প্রতি কটাক্ষ করছেন কিনা জানি না তুলসীবাবু, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমাদের সংসারের যা অবস্থা, তাতে আমার বেশী মাইনের চাকরির দিকে হাত বাড়ানো ছাড়া আর উপায় নেই।

তুলসীবাবু বিব্রত হলেন। তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললেন, না, না, আরতি, তুমি আমায় ভুল বুঝো না। তোমার ওপর আমি কোন ইঙ্গিত করি নি। তোমাদের অবস্থার কথা আমাকে তো সব তুমি খুলেই বলেছ। তা ছাড়া, তুমি তো শিক্ষিকার জীবিকা-চ্যুত হচ্ছ না। কোচবিহারেও তুমি যাচ্ছ শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে। তোমার কথা নয়, তোমাদের কথা নয়। আমি বলছি তাদের বিষয়ে যারা জীবনে অন্য কোন ধরনের চাকরি না পেয়ে শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। সাময়িকভাবে শুধু একটা কিছু করার মোহে। তাদের কথাই আমি বলছি মা। এ বৃত্তি এত সহজ নয়। দধীচির মতন নিজের পাঁজর আহুতি দিয়ে বজ্র তৈরী করতে হয়। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে হয়। এই বৃত্তিকেই ভালবাসলে চলে না, শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে যেতে হয়।

এখন এসব কথা মনে হলে রমলার হাসি আসে। শুধু হাসি নয়, সারা শরীর জ্বলে ওঠে। অর্থহীন তত্ত্বকথা। নিজের মনের কুশ্রীতাকে আবৃত করার সৌখীন যবনিকা।

কিন্তু সেদিন তুলসীবাবুর কথায় রমলা অভিভূত হয়ে পড়েছিল। বলেছিল, আপনি আমার সম্বন্ধে কি ভেবেছেন জানি না, সত্যিই আমি শিক্ষাবৃত্তিকেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করতে চাই। সংসারে আমি একলা, সুতরাং প্রয়োজনও আমার খুব বেশী নয়। এদিক ওদিক করে বেড়াবার আমার কোন মোহ নেই।

তুলসীবাবু বোধ হয় খুব খুশী হয়েছিলেন। এক গাল হেসে

বললেন, খুব ভাল লাগল মা তোমার কথা শুনে। আজকালকার মেয়েরা বড় অস্থিরচিত্ত। সেইজন্য তারা নিজেরাও সুখী হয় না, কাউকে সুখী করতেও পারে না। ঠিক আছে, আমি সুলতাকে তোমার নিয়োগপত্র দেবার কথা বলে দেব। কোনরকম অসুবিধা হলেই আমাকে এসে বলবে।

রমলা তুলসীবাবুকে হাত তুলে নমস্কার করে বাইরে বেরিয়ে এল, আরতির সঙ্গে।

নিজের বাসায় ফিরে এসে আরতি আবার বলল, বেশ করে ভেবে দেখ রমলা, শহরের মেয়ে তুই, এ পাড়াগাঁয়ে থাকতে পারিবে তো।

তুইও তো শহরের মেয়ে। এতদিন তো এখানে কাটিয়ে গেলি ?

আমার কথা ছেড়ে দে। পয়সার জন্য দরকার হলে আমাকে নরকেও যেতে হবে। বিরাট একটা সংসার আমার রোজগারের প্রত্যাশায় হাঁ করে আছে। তার ক্ষুধার শেষ নেই। রোজগার না করতে পারলে আমাকেই সে নিজের ভোজ্য করে তুলবে।

কি ভেবে আরতি কথাটা বলেছিল, রমলা জানে না, কিন্তু কথাটা শুনে সে চমকে উঠেছিল। পয়সার জন্য আরতি সব কিছু করতে প্রস্তুত। এমন কি অবনতির শেষ ধাপে যেতেও তার দ্বিধা নেই। অর্থের এমনই মাদকতা।

এই অর্থের জন্যই দিনের পর দিন জয়ন্ত চিঠিতে তাকে ভালবাসার ভান করেছে। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা সব কিছু শুধু রমলার অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য।

তা হলে জয়ন্ত সত্যিই কি কোনদিন রমলাকে ভালবাসেনি! এতগুলো বছর তার পাশে পাশে এই যে মধুকরবৃত্তি, দুজনে মিলে নতুন এক জীবন গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি, সব, সব মিথ্যা! কোন কিছুতে আন্তরিকতার সামান্য স্পর্শও ছিল না!

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেউ পারে এমন অভিনয় করতে! একটা হৃদয়কে নিষ্পিষ্ট করে, একটা মানুষকে নিঃশেষিত করে, সর্বনেশে খেলায় মাততে পারে তা যেন রমলার ধারণারও

পরের দিন সকালেই রমলার নিয়োগপত্র এসে গেল হেড-মিস্ট্রেস সুলতার মারফত।

আরতির জায়গায় রমলা রায়কে বহাল করা হল। আজ ক্লাস করে আরতি চলে যাবে। কাল থেকে রমলার শিক্ষকতা শুরু।

আরতির সঙ্গে রমলাও স্কুলে গেল।

সুলতা রমলাকে সঙ্গে করে দু-একটা ক্লাসে নিয়ে গেল। পরিচয়ও করিয়ে দিল।

আরতি দিদিমণি চলে যাচ্ছেন জানো তো? তাঁর জায়গায় এবার থেকে ইনি পড়াবেন। ইনি তোমাদের রমাদি।

আপত্তি করতে গিয়েও রমলা থেমে গেল। বেশ তাই হোক। রমলা নয়, রমা। নতুন জীবনের সঙ্গে নতুন নামকরণও হোক। পিছনের পোশাকটা পিছনেই পড়ে থাক। অতীতের স্মৃতির টুকরো-গুলো জ্বালিয়ে দিয়ে রমলা নতুন পথে চলতে শুরু করবে।

বিকেলের দিকে স্কুলে ছোট একটা সভার আয়োজন হল। আরতির বিদায়-সভা। মেয়েরাই টেবিল চেয়ার সাজাল। ফুল তুলে ফুলদানিতে রাখল। হাতে লিখে একটা মানপত্রও দিল। সুলতা বক্তৃতা দিল। অন্য দু-একজন শিক্ষিকাও কিছু কিছু বলল। উত্তরে আরতিও বলল মিনিট পাঁচেক। কিন্তু সে যত না বলল, কাঁদল তার চেয়েও বেশী।

ছোট অনুষ্ঠান কিন্তু আন্তরিকতার জন্য রমলার খুব ভাল লাগল।

সন্ধ্যার দিকে আরতি রওনা হয়ে গেল। তাকে স্টেশনে তুলে দিতে গেল সুলতা আর রমলা। এক সাইকেল-রিক্সায় মালপত্র নিয়ে সুলতা। অন্যটায় আরতি আর রমলা।

আরতিকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে যখন দুজনে ফিরল তখন রাত হয়েছে।

পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত। তাল-নারিকেলের মাথায়, ঝোপে-ঝাড়ে, অসমতল পথে যেন দুধ ঢালা।

সাইকেল-রিক্সায় বসে একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রমলার মনে পড়ে গেল আজ শনিবার। শনিবারই শান্তনুর বিয়ে।

কথাটা মনে হতেই রমলাব বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল। অব্যক্ত একটা যন্ত্রণায় স্নায়ুশিরা ঝিমঝিম করে উঠল।

কিন্তু কেন? শান্তনুর সঙ্গে কি সম্পর্ক রমলার। ঘনিষ্ঠতর হবার চেষ্টা যেমন শান্তনুও করে নি, তেমনি রমলাও তাকে এড়িয়ে গেছে। শুধু এড়িয়ে যাওয়াই নয়, তার চালচলন, বিগতযুগের ধারণা নিয়ে ঠাট্টাও করেছে জয়ন্তর সঙ্গে। এ যুগে বিলেত-ফেরত কোন ছেলে আসন পেতে মা-বাপের ফটো সামনে রেখে পূজো কবতে বসে, এ যেন রমলার চিন্তারও অতীত।

তবু কি আছে শান্তনুর, যার জন্য তার দিকে ফিরে চাইতে হয়। দেহের সুগৌর বর্ণ, শালপ্রাংশু কাঠামো, আয়ত দীপ্ত লোচন। সত্যের যেন একটা জ্বলন্ত শিখা।

ঠিক এই কারণেই বুঝি বার বার রমলার মাথা নত হয়ে আসে। একটা প্রবঞ্চনা, একটা শঠতার পরিপ্রেক্ষিতে এই শিখা আরও উজ্জ্বল, আরও ভাস্বর মনে হয়।

অনেকদিন আগে বিনুর মার কথাটাও মনে পড়ে যায়।

কবে বুঝি শান্তনুর বাবা আর রমলার বাবা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের অদৃশ্য তন্তুর বাঁধনে বাঁধবার জন্য।

সে কথার মর্যাদা রাখতে শান্তনুও এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু বাধা দিয়েছে রমলা। বাধা দিয়েছে কারণ জয়ন্তর মিথ্যামোহের জালে তখন সে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এতক্ষণে শান্তনু বোধহয় নববধূ নিয়ে বাসরঘরে ঢুকেছে। এক-রাশ পরিহাস, হাসির ফুলঝুরির মাঝখানে কিভাবে বসে আছে শান্তনু, কিভাবে আত্মরক্ষা করছে দেখতে রমলার ভারি ইচ্ছা করল।

এমন একটা মুহূর্তে শান্তনুর কি রমলার কথা মনে পড়ছে?

ভাবতেও রমলা আরক্ত হয়ে উঠল। শান্তনুর কোন দুর্বলতার পরিচয় রমলা পায় নি। হৃদ্যতা জানাবার কোন চেষ্টা কখনও শান্তনু করে নি। শান্তনু যে ধরনের ছেলে, তাতে অগ্নিসাক্ষী রেখে নববধূকে গ্রহণ করে, বিয়ের রাতে আর কারও কথা চিন্তা করাও সে পাপ বলে মনে করে।

হঠাৎ রমলার খেয়াল হল, সুলতা গায়ে হাত দিয়ে ঠেলছে।

কিছু বলছেন আমাকে? রমলা সুলতার দিকে ফিরে চাইল।

বলছি তো অনেকক্ষণ থেকে। আপনার সাড়াই পাচ্ছি না। সুলতা হাসল।

রমলা রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে বলল, না, মানে, আমি,—

সুলতা একটা হাত রমলার কাঁধে রাখল, বুঝতে পেরেছি, এমন দিনে আপনার মনটা খুব খারাপ থাকাই স্বাভাবিক।

এমন দিনে? বিশেষ এই দিনটার খোঁজ সুলতা কি করে পেল?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে রমলা চাইল।

সুলতা বলল, আরতি আপনার প্রাণের বন্ধু, সে-খবর তার কাছেই পেয়েছি। সে চলে যাওয়াতে আপনার মনটা খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক।

রমলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

সোমবার থেকে রমলা যথারীতি ক্লাস শুরু করল।

নীচু ক্লাসে ইংরাজী আর বাংলা। আরতি তাই পড়াত।

একটা ক্লাসে ঢুকেই রমলা বিব্রত হল।

ছোট্ট একটি মেয়ে পাশের একজনকে বলল, কি সুন্দর দেখতে ভাই, এই দিদিমণিকে, ঠিক যেন মেমসায়েব।

স্কুলে আসবার সময় রমলা খুব সাধারণভাবে সেজেছে। রুজ, লিপস্টিক একেবারে বাদ। অল্প স্নো, আর হালকা পাউডারের প্রলেপ। উগ্রতা নেই, কিন্তু তাপসীর অবসাদ-মাধুর্য সারা দেহে ছড়ানো।

টিচার্স-রুমে টিফিনের সময় আরও অনেক শিক্ষিকা এসে আলাপ করল। তারা একটু দূর থেকে আসে।

ওবই মধ্যে বাণী একটু মুখফোঁড়। লতায়-পাতায় সেক্রেটারি তুলসীবাবুর সঙ্গে তার একটা সম্পর্কও আছে।

বমলার পাশে বসে বলল, বাড়িতে ঝগড়া করে এসেছেন বুঝি ?

কেন বলুন তো ? রমলা একটু আশ্চর্য হল।

তা না হলে, আপনার মতো মেয়ে এই গোবিন্দপুরে কখনও মাস্টারি নিয়ে আসে।

রমলার উত্তর শোনবার আশায় আরো কয়েকজন শিক্ষিকা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

রমলা দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে একটু ভেবে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, ঝগড়া করে আসবার মতন বাড়িতে কেউ নেই ভাই। বাবা ছিলেন, তিনিও আমাকে একলা ফেলে সরে গেলেন।

বাণী অপ্রস্তুত হল। রমলার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না, আমি সেরকম কিছু ভেবে বলি নি। আপনার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আপনি

বেশ বড়ঘরের মেয়ে। লেখাপড়াও জানেন। এ স্কুলের সামর্থ্য কম। এখানে আপনি কিসের আশায় এলেন, তাই কেবল ভাবছি।

রমলা ক্লান্ত দুটি চোখ তুলে চাইল। ক্ষীণ গলায় বলল, অফিসে মাথা ঠুকে ঠুকে হয়রান হয়ে গেছি ভাই। চৌকাঠের ওপারে আর ঢুকতে পারি নি। কলকাতার স্কুলে বি. টি. না হলে অচল। তাই নিরুপায় হয়েই এখানে এসে হাজির হয়েছি।

কেউ কিছু বলার আগেই টিফিনের ঘণ্টা শেষ হল। বই-খাতা হাতে শিক্ষিকারা দিকে দিকে ছুটলেন।

রমলার ইংরাজী, ক্লাস নেবার কথা। ক্লাসে ঢুকেই বই খুলে কবিতা পড়া শুরু করল। একটু পড়তেই খেয়াল হল ক্লাসের মেয়েরা মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। এত বিশুদ্ধ উচ্চারণ, এমন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এর আগে বুঝি তারা আর শোনে নি।

রমলা আরক্তিম হল, কিন্তু পড়া থামাল না।

অনেকদূরে কোথায় জেলখানা ধোয়ার শব্দ হচ্ছে। জল আছড়ানোর আওয়াজ। সব কিছু পরিষ্কার করা হচ্ছে। কোথাও একটু ময়লা না থাকে। সম্ভবত জাঁদরেল কেউ জেল পরিদর্শনে আসবেন। তাঁর সামনে কোন কলঙ্ক, কোন মালিন্য না প্রকাশ পায়।

রমলা আস্তে আস্তে উঠে বসল। গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে দারুণ অবসাদ। দু'চোখে তীব্র জ্বালা। রাতের পর রাত জেগে জেগে শরীর মন ভেঙে পড়েছে।

পিছন ফিরে দেখলে জীবনের এই কটা দিনই একটু লোভনীয় বোধ হয়। বাঁচবার সাধ হয় শুধু এই কটা দিনের জন্য।

একরাশ কচি কচি হাসিমুখের সার। নিষ্পাপ, নিস্পৃহ শিশুর

দল। পৃথিবীর শঠতা আর বঞ্চনার পাঠ এখনও গ্রহণ করে নি। সারা দেহে সূর্যের আলো—সঞ্জীবনী, প্রাণদায়ী।

এদের মধ্যে রমলা যেন প্রাণ খুঁজে পেয়েছিল। জীবনের নতুন অর্থ। টিফিনের সময় টিচার্স-রুমে না এসে খেলার মাঠে গিয়ে রমলা হাজির হত। ছোট ছোট মেয়েদের নতুন নতুন খেলা শেখাত। মাঝে মাঝে নিজেও খেলায় মেতে উঠত তাদের সঙ্গে।

আরো অন্তরঙ্গ হতে সমবয়সী অন্য শিক্ষিকারা ঠাট্টা-তামাসাও করত।

হেনা মনস্তত্ত্বের ছাত্রী। রমলাকে কাছে পেলে সহাস্যে বলত, এ আর কিছু নয়। তোমার মধ্যে যে বঞ্চিত বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় রয়েছে, সেটাই এভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। ঘর বাঁধার তোমার চিরন্তন বাসনা, নিজের সংসাব, নিজের সন্তান জড়িয়ে বাঁচবার তোমার দুর্বার মোহ। এদের নিয়ে তোমার সেই কামনা-পূরণের, ইচ্ছাপূর্তির খেলা চলেছে।

এত কথা জানে না রমলা। এসব সে ভাবেওনি। ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে মিশতে তাব ভাল লাগে, তাই সে মেশে। এর বেশী আর কিছু সে বলতে পারে না।

কিন্তু সংসার বাঁধার মোহ!

কাজের নিশ্চিন্ত অবসরে রমলা ভাবতে বসে। জয়ন্তর সঙ্গে আলাপ হবার আগে থেকেই নীড় বাঁধার দুর্বার এক কামনা মাঝে মাঝে তাকে চঞ্চল করত। হয়তো বান্ধবীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের পরিপূর্ণ সংসার দেখার জন্যই।

নিজের সংসারের কথা রমলার মনে পড়ত। মা নেই, শুধু বাপ। কাজেই সংসারের এই অসম্পূর্ণ ছবিটা বার বার তাকে আঘাত করত। ঠাকুর চাকর ঝি বেয়ারা ঘেরা মমতাহীন এক জীবনযাত্রা। রসহীন, স্বাদহীন, যান্ত্রিক। দেরি করে এলে বলার

কেউ নেই, অসুখবিসুখে আঁকড়ে ধরার মতন মা নেই, মনের কথা বলবার মতন, খেলার সঙ্গী হিসাবে ভাইবোন কেউ নেই।

এই থেকেই হয়ত ধীরে ধীরে, মৌচাকে মধু জমার মতন, মনের গভীরে তিল তিল করে নিটোল এক সংসারের ছবি ফুটে উঠেছে। মনের মানুষকে নিয়ে সংসার গড়ার ছবি।

এমন সময়েই জয়ন্ত এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল।

সুন্দর কান্তি, নীল চোখে রহস্যের স্পর্শ, প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্যের মনোরম সংমিশ্রণ। তখন ভাবতেও পারে নি রমলা সেই সুঠাম সুন্দর মানুষটার মধ্যে এত পাপ, এত প্রতারণা। ইনিয়ে-বিনিয়ে ভালবাসার কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে শুধু নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় খুঁজছিল।

জয়ন্তর অধ্যায় শেষ। শান্তনু কাছে এসেও আসতে পারে নি। এসবের জন্য রমলার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই।

রমলা পৃথিবী চিনেছে। নিজেকে চিনতে শিখেছে। ছলনার পিচ্ছিল পথে আর সে পা বাড়াবে না।

কিন্তু কতটুকু মানুষের সাধ্য! যে দুর্বার শক্তি গ্রহনক্ষত্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করছে, তার কাছে রমলাকে মাথা নত করতেই হবে। এটুকু রমলা বুঝেছে, মানুষ শুধু ক্রীড়নক, তার স্বাধীনতা, তার স্বাতন্ত্র্য শুধু দম্ভ। ঝড়ের মুখে কুটোর মতন; তার আলাদা কোন গতিবেগ নেই। নিয়তির কাছে নিজেকে বলি দিতেই হবে।

তুলসীবাবু অবসর গ্রহণ করলেন।

বললেন, আর নয়, এতদিন তো কাদা ঘাঁটলাম। এবার নিজের কাজ একটু করব। পরলোকের পাথেয়-সংগ্রহ। স্কুলের শক্তি হয়েছে, সে নিজেই চলতে শিখেছে।

সেক্রেটারী হলেন আদিত্যবাবু। তুলসীবাবুর ছোট ছেলে।

কলকাতায় কি একটা ব্যবসা করছিলেন, সুবিধা না হওয়ায় ব্যবসার জাল গুটিয়ে বাড়িতে বসে আছেন। কাজের মধ্যে বাপের পুকুরে ছিপ ফেলে বসে থাকেন, আর পাড়ার নিষ্কর্মাদের সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা।

তুলসীবাবু সারাটা জীবন ধুতি পাঞ্জাবি পরে কাটালেন, কিন্তু ছেলে স্কুলের মিটিংয়ে আসতে আরম্ভ করলেন প্যাণ্ট কোট পরে। স্কুলের ব্যাপারের চেয়েও শিক্ষিকাদের সম্বন্ধে উৎসাহ দেখাতে লাগলেন আরো বেশী।

কমবয়সী প্রায় সব শিক্ষিকাই তাঁর লক্ষ্য, তবে বিশেষ করে নজর পড়ল রমলার ওপর।

স্কুলের ভবিষ্যৎ পাঠপন্থা নির্ধারণের জন্য এক জরুরী মিটিং ডাকা হয়েছিল। ডেকেছিলেন আদিত্যবাবু। সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকার বন্দোবস্ত করার জন্য তিনি কলকাতা যাচ্ছেন, তার আগে শিক্ষিকাদের মতামত একবার জানা দরকার। আরো উঁচু ক্লাস যদি করা যায়, তাহলে কোন অসুবিধা হবে কিনা। আর সুবিধা হলেই বা কতটুকু।

শিক্ষিকাদের মধ্যে প্রধান শিক্ষিকা সুলতাই কথা বলল। কাজের কথা। ক্লাস যদি বাড়ে তবে এই শিক্ষিকারাই পড়াতে পারবে, তবে এই মাইনেতে নয়।

তা তো নিশ্চয়, আদিত্যবাবু স্বীকার করলেন, সেইজন্যই তো টাকার ব্যবস্থা করতে ছুটছি। এখান থেকে উঁচু ক্লাসে উঠেই ছাত্রীদের আসানসোল শহরে যেতে হচ্ছে। সব মেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব হচ্ছে না। যাতায়াতের খরচও কম নয়। সেইজন্য হাইয়ার ডিপার্টমেণ্ট আমাদের খুব দরকার।

মিটিং শেষ হল কিন্তু রমলার দুর্ভোগ কাটল না।

শেষদিকে আদিত্যবাবু সুলতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ভবতারিণী স্কুলে টেম্পরারী টিচার কজন আছেন?

সুলতা রমলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, টেম্পরারী এই একজন। আরতি বসাকের বদলি এসেছেন দিনকয়েক। তা ছাড়া সবাই প্যাকা।

ও, আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে। আদিত্যবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

তখনও রমলা কিছু ভাবে নি। ব্যাপারটা একেবারে স্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

অন্য সকলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে আদিত্যবাবু টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, এর আগে আপনি কোন স্কুলে পড়িয়েছেন?

রমলা টেবিলের ওপর হাতদুটো রেখেছিল, আদিত্যবাবু ঝুঁকে পড়তে তাড়াতাড়ি সে নিজের হাতদুটো কোলের ওপর রাখল। মাথা নেড়ে বলল, না, এর আগে আমি কোথাও পড়াই নি। বি.এ. পাস করার পরই এখানে দরখাস্ত দিয়েছি।

কোন কলেজ থেকে পাস করেছিলেন?

কলকাতার স্কটিশ চার্চ।

ও, আপনি কলকাতার বাসিন্দা। আমার কেমন ধারণা হয়েছিল আপনি বর্ধমান থেকে এসেছেন।

এ কথার রমলা কোন উত্তর দিল না। মানুষের ধারণার ব্যাপারে তার বলবার কি থাকতে পারে।

আপনার বাবার নামটা কি জানতে পারি?

শ্রীরাজীব রায়।

নামটা বার দুয়েক আদিত্যবাবু উচ্চারণ করলেন। চেনবার ভান করে একটু পরে বললেন, কোন অফিসে কাজ করতেন?

ব্যারিস্টারি করতেন। খুব মৃদুকণ্ঠে রমলা বলল।

ব্যারিস্টারি করতেন? আদিত্যবাবু খাঁজ ফেললেন কপালে। ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলেন। হাতের পেন্সিলটা

টেবিলের ওপর বার ছয়েক ঠুকলেন তারপর বললেন, বোঝা যাচ্ছে, আপনি আর এ স্কুলে বেশীদিন থাকবেন না।

কেন বলুন তো ?

আপনারা এসব স্কুলে থাকতে আসেন না। হয়তো অভিজাত জীবনে ক্লান্তি এসে যায়, তাই সেই একঘেয়েমির ঘোরটুকু ঘোচাবার জন্য, শুধু বৈচিত্র্যের লোভে আপনাবা এমন চাকরি করতে আসেন। এ বৃত্তিকে আপনারা অন্তর দিয়ে ভালবাসেন না। অথচ এই আন্তরিকতাটুকু না থাকলে শিক্ষিকার রূপ পূর্ণতা পায় না।

এক কথা শুনে শুনে বমলা বিরক্ত হয়ে ওঠে। কি করে রমলা এদের বোঝাবে ব্যারিস্টার রাজীব রায়ের একমাত্র সন্তান সর্বস্ব খুইয়ে ধাপে ধাপে অনেক নীচে নেমে এসেছে। নিঃস্ব, অসহায় অবস্থায় একটা অবলম্বনের প্রয়োজন, সে অবলম্বন যতই ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর হোক।

হঠাৎ যেন খেয়াল হল, এইভাবে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে আদিত্যবাবু চমকে উঠলেন।

তাইতো, বাইরে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। আপনাকে এভাবে আটকে বাখলাম।

তাতে আর কি। আমাদের কোয়ার্টার তো কাছেই। রমলা উঠে দাঁড়াল।

চলুন, আপনাকে বরং পৌঁছে দিয়ে আসি, আদিত্যবাবু পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে চললেন।

রমলা ঘাড় হেঁট করে এগিয়ে গেল।

স্কুলের দরজায় টুলের ওপর বুড়ো দরোয়ানটা বসে ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করল।

সেলাম ফেরত দিতে গিয়েই রমলার খেয়াল হোল, এ অভিবাদন তাকে নয়, সেক্রেটারিকে।

ছুজনে সায়রের পাশে এসে দাঁড়াল।

এ সায়রটার নাম জানেন ? আদিত্যবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

রমলা ঘাড় নাড়ল, তারপরই মনে পড়ল তার এই ঘাড়নাড়া অন্ধকারে আদিত্যবাবুর দেখতে পাবার কথা নয়, তাই ক্ষীণকণ্ঠে বলল, না।

এর নাম সতীসায়র। মানে আমার বৃদ্ধা প্রপিতামহীর নামে এই সায়র। তাঁর সম্বন্ধে কিছু শোনেন নি বোধ হয়, অবশ্য শোনবারও কথা নয়। এ আমাদের গাঁয়ের এক অলৌকিক কাহিনী। বসুন না একটু। শুনতে আপনার খুব ভাল লাগবে।

সায়রের ধারে ধারে লাল সিমেণ্টের বেদী। তারই দিকে আদিত্যবাবু আঙুল দেখালেন।

রমলা প্রমাদ গুণল। না, আর নয়। এ ধরনের কথাবার্তার সঙ্গে তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। কলেজে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়েছে। অসূর্যম্পশ্যা সে কোনকালেই নয়। ছেলেদের এগিয়ে এসে, প্রায় গায়ে পড়ে তার সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহের কথা তার বেশ মনে আছে। ছল-ছুতো করে প্রশ্ন, নোট চাওয়া, এমনকি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠিন না সহজ সে-বিষয়ে খোঁজ করা। আজকের সায়রের কাহিনী যে সেইসবেরই পুনরাবৃত্তি তা বুঝতে রমলার একটুও দেরি হল না।

রমলা বসল না। বলল, আজ থাক। সতীসায়রের কথা অন্যদিন শুনব। আমাকে এখনই ফিরতে হবে। মেয়েদের ইংরাজী অনুবাদের খাতাগুলো এনেছি, দেখতে হবে সেগুলো।

এই কারাবেষ্টনীর মাঝখানে বকুলগাছের পাতার ঝোপে ঝোপে সন্ধ্যার ঝোঁকে যেমন জোনাকির দীপ্তি দেখা যায়, ঠিক তেমনি, সে-রাতের অন্ধকারে সতীসায়রের পাশে একজোড়া জোনাকির

অনির্বাণ শিখা রমলা দেখতে পেয়েছিল। লোভ, ক্ষুধা আর কামনায় সে শিখা লেলিহান!

আদিত্যবাবু তবু আর একবার চেষ্টা করলেন।

মিনিট কুড়ির বেশী লাগবে না। এ উপাখ্যানটা আপনার শোনাও দরকার।

একটু সরে গিয়ে রমলা তীবের ফলা থেকে ত্বক্ বাঁচাল। অনুনয়ের সুরে বলল, আজ আর অনুরোধ করবেন না আদিত্যবাবু। আর একদিন বরং আপনার কাছ থেকে শুনে নেব।

আদিত্যবাবুব উত্তরেব অপেক্ষা না করেই রমলা হনহন কবে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। একবারও পিছন ফিরে দেখল না।

ঠিক বাড়ির দরজায় সুলতার সঙ্গে দেখা হল। মনে হল সে যেন রমলারই অপেক্ষা কবছিল।

কি ব্যাপার এত দেরি হল?

আপনাদের আদিত্যবাবু যাচাই কবছিলেন আমাকে।

যাচাই?

হ্যাঁ, তাই বোধ হয়।

তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। সুলতা সত্যিই বিস্ময় প্রকাশ করল।

তিনি আমার সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবর নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি টিঁকে থাকবার জন্য এসেছি কিনা।

হঠাৎ তোমার সম্বন্ধে এত কৌতূহল?

আমি কাঁচা গুটি যে। আমারই তো ভয় পদে পদে। আপনারা পাকাপোক্ত। এদিক ওদিক হবার আশা কম।

রমলার সঙ্গে সঙ্গে সুলতাও বাড়ির মধ্যে ঢুকল। কতকটা যেন নিজের মনেই বলল, কি জানি আদিত্যবাবুকে আমার খুব ভাল লাগল না।

নিজের ঘরের পর্দাটা সরিয়ে রমলা বলল, আসুন সুলতাদি, একটু গল্প করি। হাতে কোন কাজ নেই তো?

না, কাজ আর কি। লাইব্রেরী থেকে একটা বই এনেছি। অর্ধেকটা পড়া হয়েছে। বাকিটা কোন এক সময়ে পড়ে নেব।

কোণে রাখা চেয়ারটার ওপর সুলতা বসল।

রমলা বসল একটা মোড়ার ওপর। বলল, আদিত্যবাবুর কথা কি বলছিলেন তখন?

বলছিলাম ভদ্রলোকের চাউনিটা আমার মোটেই ভাল ঠেকছিল না। সুলতা মুখচোখের এমন ভঙ্গী করল, মনে হল আদিত্যবাবুর দৃষ্টি অলক্ষ্য থেকে এখনও যেন তার শরীরে বিঁধছে।

চাউনিটা খারাপ? কেন বলুন তো? রমলা অজ্ঞতার ভান করল।

সে বোঝানো যায় না। অনুভব করতে হয়। তোমরা ছেলে-মানুষ, সবে জীবনে প্রবেশ করছ, একটা কথা মনে রেখো পৃথিবী একটা মহাসমুদ্র। হাঙর, কুমীর, তিমি এখানে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওৎ পেতে রয়েছে। কায়দায় পেলেই সর্বনাশ করে দেবে। কোথায় তলিয়ে যাবে, তার আর ঠিক-ঠিকানা থাকবে না। আমরা অনেক দেখেছি, ঠেকে শিখেছি, আমি তোমায় বলছি, লোকটি মোটেই সুবিধার নয়।

এই কদিনেই সুলতা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। আপনি থেকে তুমি।

রমলা স্বীকার করল, আপনি ঠিকই বলেছেন সুলতাদি। ভদ্রলোক আমাকে সায়রের পাড়ে বসিয়ে সতীসায়রের গল্প শোনাতে চাচ্ছিলেন।

হুঁ, সুলতা নাক আর মুখ দিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ বের করে বলল, কেন সতীসায়রের গল্প ওর কাছে শুনতে যাবে কেন? আমরা কি জানি না, না শুনি নি।

কাজ আছে বলে আমি চলে এসেছি সুলতাদি।

ভাল করেছ, খুব ভাল করেছ। আমাদের বরাত তাই, ওই ছোকরা সেক্রেটারি হয়ে এল। তুলসীবাবুও আর লোক পেলেন না। অবশ্য ধৃতরাষ্ট্র-স্নেহ, তাতেই তো সর্বনাশ করেছে। না হলে এই আদিত্যের জন্য তুলসীবাবুকে কম ভুগতে হয়েছে ?

নতুন করে রমলা গল্পের গন্ধ পেল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একটু দাঁড়ান, হীটারে দু কাপ চা করে নিয়ে আসি। পরচর্চাটা চায়ের সঙ্গে খুব মুখরোচক হয়।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সুলতা বলল, তুমি ছোট বোনের মতন, তোমায় আর কি বলব। পাড়ার ঝি-বৌয়ের আদিত্যর জ্বালায় ঘাটে আসা দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। ছিপ হাতে সকাল-দুপুর-বিকেল বসে থাকত। তারপর কেলেঙ্কারি আরো দূর গড়িয়েছিল। তুলসীবাবুর টাকার জোর আছে, তাই ধামাচাপা দিতে পেরেছিলেন।

রমলা চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুনল। একটি কথাও না বলে।

সুলতার কথা শেষ হতে বলল, একটা কাজ করলে হয় না সুলতাদি ?

কি ? সুলতা চায়ের কাপ সরিয়ে রাখতে রাখতে বলল।

আমরা সবাই মিলে দল বেঁধে যদি তুলসীবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। বলি, আদিত্যবাবুকে সরিয়ে দিন। অমন একটা লোক কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকলে, সে প্রতিষ্ঠানেরও তো বদনাম।

সুলতা হাসল, জলের চেয়ে রক্ত অনেক ঘন সেই ইংরাজী প্রবাদটা আশা করি ভুলে যাওনি। কিছুই হবে না। মাঝখান থেকে আমরা বিষনজরে পড়ব। দিনকাল তো দেখছ। সামান্য একটা শিক্ষিকার পদের জন্য কত এম.এ., বি.টি.-র দরখাস্ত পড়ে। তাও খুঁটির জোর চাই, তেলের সঞ্চয় চাই।

ঝুমুর ঝুম। ঝুমুর ঝুম। ঝুমুর ঝুম। অপূর্ব সুরেলা ছন্দ। মনে হয় একদল তরুণীর নূপুর-নিক্কণ। প্রথম প্রথম রমলা উতলা হয়ে উঠত। মেঘমেদুর আকাশের দিকে চেয়ে ভাবত। কি ভাবত, সে নিজেই জানে না।

অনেক আগে, জীবনে বিপর্যয় শুরু হবার আগে, সারা আকাশে মেঘেরা পেখম ছড়ালে রমলা জানলায় মাথা রেখে গুন্-গুন্ করে গাইত—এ ভরা বাদর, এ মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।

আজ আর এসব গান মনে পড়ে না। কোন গানই মনে আসে না। শুধু স্তব্ধ আকাশের নীচে নূপুরের শব্দ যেন পাগল করে তোলে।

কিন্তু এ ভুলও ভেঙে গেছে রমলার।

নূপুর নয়, পায়ের কঠিন বেড়ি তালে তালে এমনই শব্দ তুলছে।

সার সার মেয়ে-কয়েদীরা কাজে চলেছে। হয়তো বিরহিণী, কিন্তু অভিসারিকা নয়।

বসে বসে রমলা ভাবে। এদের হয়তো ঘরবাড়ি আছে, অন্তত একটা স্থায়ী ডেরা, স্বামী আছে, ছেলেমেয়ে আত্মজন। মেয়াদ শেষ হলে আবার ফিরে যাবে তাদের মাঝখানে।

রমলার কেউ নেই। অবশ্য তার ফিরে যাবার প্রশ্নও নেই। ভারি লোহার দরজাটা সেই যে কবে পার হয়ে এসেছে, সে পথে আর ফিরে যাবে না। প্রবেশ আছে, নিষ্ক্রমণ নেই।

নিষ্ক্রমণ নেই তাই রমলা শান্তির নিশ্বাস ফেলছে। কি নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াত রমলা? কোন মুখে?

রমলাকে দেখলে চেনা মানুষ শিউরে সরে যেত। সংবাদপত্রের কল্যাণে দিনের পর দিন ঘটনাটা ফলাও করে বেরিয়েছে। রিপোর্টাররা নিজেদের মনের রং মিশিয়ে আরো কৌতূহলোদ্দীপক

করে তুলেছে সমস্ত ঘটনা। রমলাকে পিশাচী, শোণিতপায়ী করে এঁকেছে। অবশ্য আইন বাঁচিয়ে।

কোর্টঘরে জনতার মুখে মুখে এ সংবাদের কিছুটা রমলার কানে এসেছে। লোকেরা ইচ্ছা করেই তাকে শুনিয়েছে। মৃদু গলায়, বিচারকের কান বাঁচিয়ে অভিশাপ দিয়েছে।

কাঠগড়ায় বসে রমলা সব নিন্দা, সব অপবাদ মাথা পেতে নিয়েছে। কোন আপত্তি করে নি। প্রতিবাদের কোন গুঞ্জন তোলে নি। বসে বসে সামনের সবাক অভিনয় দেখেছে। শুনেছে পাবলিক-প্রসিকিউটারের সওয়াল, দেখেছে বিচারকের মুখের চেষ্টা-কৃত নির্লিপ্ততা।

আমরা কিছু করি না, আমাদের করানো হয়। সাধ্য কি আমাদের কোন কিছু করার! অলক্ষ্যে নির্দেশ না থাকলে আমরা একটি পা অগ্রসর হতে পারি না, একটি আঙুলও নড়াতে পারি না। আমরা শুধু উপলক্ষ্য। তবু সেই উপলক্ষ্যের কাঠামোটাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া চলে। বিচারের নামে প্রহসন। অন্তরে মৃত একটা সত্তাকে নিয়ে দিনের পর দিন কৌতূহলী জনতার সামনে দাঁড় করানো।

রমলা উঠে পড়ল। এসব কথা মনে হলেই মাথায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে। থরথরিয়ে কাঁপে সমস্ত শরীর। মনে হয়, দুটো হাতের কঠিন পেষণে শ্বাসনলীটা চেপে ধরে। বাতাসের জন্য সামান্য আকুলি-ব্যাকুলি, তারপর অনন্ত নীরবতা। সব পরিহাস পার হয়ে চেতনাহীনতার শান্তলোকে।

আদিত্যবাবুকে এড়ানো গেল না।

আর একদিন রমলা ধরা পড়ে গেল। কদিন স্কুলের ছুটি। অনেক শিক্ষিকাই বাড়ি চলে গিয়েছে। সুলতা ভাইয়ের কাছে, পুরীতে। কেবল রমলা আর শান্তা রয়েছে। রমলার যাবার

তিনকুলে কেউ নেই। শান্তার মা বাবা সুদূর পুনায়। যেতে আসতেই ছুটি ফুরিয়ে যাবে।

বিকেলের অনেক আগেই দুজনে বেরিয়েছিল। শান্তাই খোঁজ দিয়েছিল কালভৈরবের মন্দিরের। এখান থেকে মাইল দুয়েক। দুজনে হেঁটেই গিয়েছিল।

ঠাকুরদেবতার ব্যাপারে রমলার বিশেষ উৎসাহ ছিল না, শুধু মন্দিরের স্থাপত্য আর গঠননৈপুণ্য দেখতেই সে গিয়েছিল।

ফিরল যখন, তখন চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। ঝুপসী পথ। দুজনেই শহরের মেয়ে। বেশ গা ছমছম করতে লাগল।

শান্তা, পথ চিনে ঠিক যেতে পারবে তো? শাড়ীর আঁচল দিয়ে রমলা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ, পথ হারাবার ভয় নেই। আমি ভাবছি অন্য কথা।

কি কথা?

মনসাদেবীর অনুচরদের আমার বড় ভয়।

সঙ্গে সঙ্গে রমলা শান্তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। এদিক ওদিক দেখে বলল, কি মন্দিরই তুমি দেখালে! আমি তো ভাবলাম পালবংশ কিংবা সেনবংশের আমলের কিছু হবে, কিন্তু মনে হল সে-সব কিছুই নয়। শুধু পুরোনো মন্দির। অবহেলায়, অযত্নে ফাটল ধরেছে। বট-অশথের চারা গজিয়েছে চাতালে চাতালে। বিগ্রহও নেই, পূজারীও নয়।

শান্তা উত্তর দিতে গিয়েই থেমে গেল। সামনের দিক থেকে একটা লণ্ঠনের আলো আসছে। তবু ভাল, সঙ্গে মানুষজনও আছে নিশ্চয়।

একটু কাছে আসতেই দেখা গেল স্কুলের বেয়ারা গোকুল লণ্ঠন হাতে আসছে। পিছনে আর একজন।

একি, এসময়ে আপনারা এখানে?

আদিত্যবাবুর কণ্ঠস্বর শুনে রমলা আর শান্তা দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

এই অন্ধকার রাতে কোথায় গিয়েছিলেন?

প্রশ্নটা রমলাকে, কিন্তু রমলা শান্তার দিকে চোখ ফেরাল। কোন উত্তর দিল না।

শান্তাই কথা বলল, আমরা কালভৈরবের মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম।

কালভৈরবের মন্দির? সে তো কাঞ্চনতলায়।

শান্তা ঘাড় নাড়ল।

আমাকে বললেই পারতেন, সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। এভাবে এতটা পথ অন্ধকারে যাওয়া-আসা করাটা ঠিক হয় নি। এ তল্লাটে বদলোকের আড্ডা। কিছু একটা হয়ে গেলেই হল। চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

আদিত্যবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাত বাড়িয়ে গোকুলের কাছ থেকে লণ্ঠনটা টেনে নিয়ে তাকে বললেন, তুই বাড়ি চলে যা। আজ আর আমি বেরোব না।

আদিত্যবাবু ফিরলেন। একপাশে রমলা, একপাশে শান্তা।

লণ্ঠনের আলোয় তিনজনের ছায়া পথের ওপর দীর্ঘ হয়ে পড়ল।

শান্তা বলল, আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

আদিত্যবাবু হাসলেন, ওই আমার একটি নেশা আছে। তাস খেলা। রোজ সন্ধ্যাবেলা এক হাত না খেললে ভাত হজম হয় না।

তা হলে আজ তো আপনার খুব অসুবিধা হল। হাসতে হাসতেই শান্তা বলল।

না, না, অসুবিধা আর কি। আপনাদের পৌঁছে দেওয়াও তো আমার একটা কর্তব্য। এই তো কিছুদিন আগে একটু দূরে, গরুর গাড়ী থেকে একজনের বৌকে গুণ্ডারা তুলে নিল। তিনদিন

পরে বৌকে অবশ্য পাওয়া গেল, কিন্তু তখন পাওয়া-না-পাওয়া সমান।

রমলা আর শান্তার দিকে চেয়ে আদিত্যবাবু অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন।

কিছুক্ষণ কোন কথা নয়। তিনজনে জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল।

কি ব্যাপার, আপনি যে একটি কথাও বলছেন না?

রমলা চমকে উঠল। শান্তা যে মনসার অনুচরদের কথা বলছিল, তাদের ছোবলেও বোধ হয় সে এতটা বিচলিত হত না।

আদিত্যবাবু রমলার একটা হাত ধরেছেন। অবশ্য অল্পক্ষণের জন্য। কথাটা বলেই হাতটা ছেড়ে দিয়েছেন।

রমলা নিজের হাতটা শাড়ীর আঁচলের মধ্যে ঢেকে ফেলল। একটু ব্যবধান রেখে হাঁটতে শুরু করল। আদিত্যবাবু যেন কোন-রকম অন্যায় সুযোগ আর নিতে না পারেন।

শান্তা ঝুঁকে পড়ে রমলার দিকে দেখল, তারপর আদিত্যবাবুর দিকে ফিরে বলল, রমলা পুরোপুরি শহরের মেয়ে কিনা, তাই অন্ধকারে একটু ভয় পেয়েছে। আমিও অবশ্য শহরের মেয়ে, তবে মাঝে মাঝে আমি মামার-বাড়ি গিয়েছি পাড়াগাঁয়ে।

ভয়টা কিসের? ভূতের না চোর-ডাকাতের? আদিত্যবাবু রমলার দিকে এগোতে এগোতে বললেন।

এতক্ষণ পরে রমলা কথা বলল। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন কণ্ঠে বলল, ভয়টা ভূতেরও নয়, চোর-ডাকাতেরও নয়। জন্তুর।

জন্তুর! আদিত্যবাবু বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

হ্যাঁ, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে, মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যারা নখ আর দাঁত বের করে।

আদিত্যবাবু একেবারে নিভে গেলেন। সারাটা পথ আর একটি কথাও বললেন না। শান্তাও চুপ করে রইল।

দরজায় এসে আদিত্যবাবু বিদায় নিলেন। শান্তা একটা ধন্যবাদের কথা বলল। রমলা কিছু না বলে নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

একটু পরেই শান্তা এসে দরজায় দাঁড়াল।

আসব রমলা?

এস। মৃদু গলায় রমলা আহবান জানাল।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই শান্তা বিব্রত হল।

বিছানায় উপুড় হয়ে রমলা শুয়ে আছে। বালিশে মুখ গুঁজে।

এক পা এক পা করে শান্তা বিছানার কাছে এগিয়ে এল। একটা হাত রমলার পিঠে রেখেই বিস্মিত হল। ফুলে ফুলে রমলা কাঁদছে।

শান্তা বিছানার একপাশে বসে পড়ে বলল, কি হয়েছে রমলা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

রমলা আস্তে আস্তে উঠে বসল। শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঘষে ঘষে চোখের জল মুছে ফেলল, তারপর জানলা দিয়ে বাইরের নিকষ-কালো অন্ধকারের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমাদের কি অন্য কোন পরিচয় থাকতে পারে না শান্তা? পুরুষের বিলাসের উপকরণ হওয়া ছাড়া আমাদের জীবনের কি অন্য কোন সার্থকতা নেই? রুচি-অরুচির প্রশ্ন নয়, যোগ্য-অযোগ্যতার কথা নয়, যে কোন পুরুষ নিজের খেয়াল-খুশীমতো আমাদের ছোঁবে, ছিনিমিনি খেলবে আমাদের নিয়ে, আর আমরা মুখ বুজে সব সহ্য করব?

কি হয়েছে বল তো? আমি তো কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি না। আদিত্যবাবু কি অপমানসূচক কোন কথা বলেছেন? আমি তো ঠিক খেয়াল করতে পারছি না।

রমলা বাইরে থেকে দৃষ্টি ঘরের মধ্যে ফেরাল। জ্বলছে দুটো চোখ। নিটোল বুক উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছে।

কিছুক্ষণ রমলা দৃষ্টি দিয়ে শান্তাকে জরিপ করল, তারপর বলল,

এর আগেও সেক্রেটারি একবার অন্যায় সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিলেন। আজ কথাবার্তার ফাঁকে আমার একটা হাত চেপে ধরেছিলেন। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য কর নি।

সেকি !

হ্যাঁ, আমি মিথ্যা বলছি না। এ সত্যভাষণের জন্য অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আমার অদৃষ্টে আছে, আমি জানি। হয়তো এ চাকরিটুকুও খোয়াতে হবে, কিন্তু এসব ছোটখাটো ব্যাপারে যদি চুপ করে থাকি, তাহলে এই সব জমে জমে পর্বতপ্রমাণ হয়ে আমাকে একদিন নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। তখন হাজার চেষ্টাতেও আর নিজেকে বাঁচাতে পারব না।

এখন এইসব নীতিকথা মনে হলেই রমলার হাসি আসে। নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে রমলা ? ছোটখাটো পাপ এড়িয়ে নিজেকে নিষ্কলুষ রাখতে পেরেছে ? পবিত্র দেহ ?

সেদিন কিন্তু রমলা মন থেকেই এসব কথা বলেছিল।

শান্তা কোন উত্তর দেয়নি। বোধ হয় উত্তর দিতে সাহসই করে নি। এখানে বাতাসেরও কান আছে। কোথাকার কথা কোথায় চলে যায় কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। চাকরি-নির্ভর শান্তা মুশকিলেই পড়ে যাবে।

সেটা রমলা বুঝতে পেরেছিল।

শান্তা শুধু একসময়ে বলল, এই নিয়ে তুমি হৈচৈ করবে নাকি রমলা ?

হৈচৈ করে লাভ কি ? তাহলে কাদা তো বেশী করে আমারই গায়ে লাগবে। সেক্রেটারির বিরুদ্ধে যেতে কার আর সাহস হবে।

তা সত্যি। সেক্রেটারির ঠাকুমার নামে স্কুল। বলতে গেলে ওঁদেরই তো সম্পত্তি।

স্কুলটা ওঁদের সম্পত্তি বলে, আমরা বুঝি বেওয়ারিশ মাল ? আমাদের নিয়ে যা ইচ্ছা করা চলবে ?

রমলা উত্তেজনায় ফেটে পড়ল।

না, না, তা বলছি না। শান্তা অপ্রস্তুত গলায় বলল, ওই যে একটু আগে তুমি বললে না, ক্ষতি আমাদেরই, সেই কথাই বলছি। এদেশে মেয়ে হয়ে জন্মানোই পাপ, বিশেষ করে গরীবের মেয়ে হয়ে।

আর কিছু রমলা বলল না। নিজের বিছানায় ফিরে এল। মেয়ে হয়ে জন্মানো পাপ! শান্তনু একবার গার্গী, খনা, মৈত্রেয়ীব কথা বলেছিল, তাঁদের মতন মেয়ে হয়ে জন্মানো পাপ নয় নিশ্চয়। তাঁরা দেশের গৌরব। বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। শুধু রমলার মতো মেয়েরা যারা নিজের সুখ, নিজের সম্পদ্. নিজের বাসনা কামনা চরিতার্থ কবার পথ খোঁজে, তারাই সব হারিয়ে কপাল চাপড়ায়। অন্ধমোহে ভুল পথে ছোটে, ভুল মানুষের সান্নিধ্য কামনা করে। তারপর একদিন চোখের জলে বুক ভাসায়।

রমলাব অন্য কি পথ আছে। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রয়েছে, একেবারে অনাহারে হয়তো মরবে না, কিন্তু এ চাকবি ছেড়ে কোথায় গিয়ে উঠবে। চেনাজানা কে আছে শহরে, যে হাত বাড়িয়ে আহ্বান করে নেবে। বি.এ. পাসের তকমা সম্বল করে এ বাজারে অন্য কোথাও অন্ন জুটবে, এ ভরসা কম। মেয়েছেলে কোন ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকলেও নানা কথা উঠবে। প্রতিবেশীদের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণান্ত হবে।

কিন্তু এভাবে অপমান সহ্য করে রমলা থাকতে পারবে না। আর একদিন আদিত্যবাবুর একটু বেচাল দেখলে হেস্তনেস্ত একটা করে ফেলবে। কারো বারণ শুনবে না।

যাবার একটি মাত্র আস্তানা হয়তো আছে। সৌরীন ঘোষালের কাছে। কোন দিক থেকে কোন সম্পর্কই নেই, তবু তিনি রমলাকে সরিয়ে দিতে পারবেন না। ছুজনের হাতে একই সর্বনাশের রাখী। একই হতাশার সূত্রে ছুজনে বাঁধা।

কিন্তু কি পরিচয়ে রমলা সেখানে গিয়ে উঠবে! জয়ন্ত রমলাকে প্রতারণা করেছে। শুধু প্রতারণাই নয়, তার এই ভাগ্যহীনতার জন্যও জয়ন্ত দায়ী। দু-হাতে বঞ্চনার কালি নিয়ে রমলার মুখে মাখিয়ে দিয়েছে। এতদিন পরেও সে-কালির ছোপ ওঠেনি। একটু কমে নি অপমানের দাহ।

কয়েকদিনের মধ্যেই রমলা সব কিছু ভুলে গেল। মেয়ের পাল খিরে ধরল তাকে। ক্লাসেব মধ্যে, ক্লাসের বাইরে। মেয়েরা তার নতুন নামকরণ করল, রাঙা-দিদিমণি। টিফিনের সময়ও রমলাব নিস্তার নেই। মেয়েদের সঙ্গে খেলতে হবে। কানামাছিতে চোখ বেঁধে দিতে হবে তাদের, বুড়ি হতে হবে।

সুলতাও ঠাট্টা করতে ছাড়ে নি, তুমি যে একেবারে ষষ্ঠীঠাকরুন হয়ে উঠলে রমলা! মেয়েরা সব সময় তোমায় ঘিরে থাকে।

শান্তা মুখ টিপে হেসে অন্য কথা বলেছে, ভাল, ছেলেমেয়ে মানুষ করাটা অভ্যাস হয়ে রইল। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

মুখ রাঙা করে রমলা পালিয়ে বাঁচল।

এটাই সব নয়। মেয়েদের মারফত নিমন্ত্রণ আসতে শুরু করল।

ও রাঙাদিদিমণি, আপনাকে মা স্কুলের পরে যেতে বলেছে। তালের বড়া খাবেন।

তালের বড়া!

হ্যাঁ, কেন তালের বড়া আপনি খান না?

উঁহু, ডাক্তাবের বারণ। খেলেই আমার অসুখ হবে। রমলা এড়িয়ে গেছে।

কিন্তু পরিত্রাণ পায় নি। কদিন পরেই আর একটা মেয়ে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। লাল শাড়ির আঁচল খুলে চিঠি বের করে দিয়েছে রমলার হাতে।

কিসের চিঠি? ভাঁজ খুলতে খুলতে রমলা জিজ্ঞেস করেছে।

পড়েই দেখুন না। মেয়েটি কিছু বলতে চায় নি।

চিঠিটা পড়েই রমলা অবাক। আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা নিমন্ত্রণ-লিপি।

ভাই রাঙাদি,

আমার মেয়ে মিনু কেবল আপনার কথা বলে। শুনে শুনে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে বড্ড ইচ্ছা হয়। আমরা পাড়াগাঁয়ের মুখ্যু মেয়েছেলে। আপনি শহরের লেখাপড়া জানা মেয়ে। আমাদের ডাকে আসবেন কিনা জানি না। তবে যদি ছুটির পরে মিনুর সঙ্গে আসেন, খুব খুসী হব। ইতি— মিনুর মা

দু'একটা বানান ভুল ছিল। হাতের আখরও সুগঠিত নয়, কিন্তু প্রাণের উত্তাপটুকু স্পষ্ট। এ আমন্ত্রণ বুঝি উপেক্ষা করা যায় না।

রাজী হয়ে গেল রমলা। সেদিন ছুটির পরে মিনুর সঙ্গে তাদের বাড়ি গিয়ে উঠল।

উঠান বরাবর যেতেই ঘোমটা-টানা একটি বৌ ছুটে এসে রমলার একটা হাত ধরে টেনে তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। একদৃষ্টে রমলার দিকে চেয়ে থেকে বলল, মিনুর কাছে আপনার রূপের কথা শুনেছি ভাই, কিন্তু আপনি যে এত সুন্দর তা ভাবতেও পারি নি।

রূপ, রূপ, রূপ! এই রূপই বুঝি রমলার কাল হল। জয়ন্ত শুধু এই রূপেই ভুলেছিল। তার প্রেম শুধু দেহ-কেন্দ্রিক। তাই দেহ থেকে দূরে সরে গিয়েই রমলাকে ভুলতে পেরেছিল। যদি প্রেমের উৎস হত রমলার অন্তরের রূপ, তাহলে কিছুতেই জয়ন্ত ছলনা কিংবা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে পারত না। অন্তরে অন্তরে তন্তুহীন বন্ধনকে অস্বীকার করার সাধ্য ছিল না জয়ন্তর।

আর শান্তনু। শান্তনুর চোখেও তো রঙের ঘোর লেগেছিল। হয়তো সামান্য, কিন্তু কিছুটা ছোপ নিশ্চয় পড়েছিল। তা না হলে

রাজীব রায়ের কাছে সে রমলাকে প্রার্থনা করবেই বা কেন! কেন বাপের মন জানবার প্রয়াস করবে।

আপনি এখনও বিয়ে করেন নি কেন ভাই?

মিনুর মার দ্বিতীয় প্রশ্নে রমলা চমকে উঠল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল। আরো জনকয়েক স্ত্রীলোক তাকে ঘিরে বসেছে। দু-একটি কুমারীও রয়েছে। সবাই চেয়ে রয়েছে রমলার মুখের দিকে! এমন একটা মুখরোচক প্রশ্নের উত্তর চায়।

মিনুর মা-ই আবার বলল, বয়সও তো আপনার বেশী নয়। আজকাল তো কত বেশী বয়সেই বিয়ে হচ্ছে।

একটু সামলে নিয়ে রমলা হাসল, সব মেয়েকে বিয়ে করলে চলবে কেন ভাই। কিছু মেয়ে বিয়ে করবে, সংসার করবে, আবার কিছু মেয়ে আমাদের মতন মাস্টারি করে আপনাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে।

সকলে হাসল। তারপর রীতিমতো মেয়েলী কথা শুরু হল। বাড়ির কথা, আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে, এমন কি কত মাইনে দিচ্ছে, তা পর্যন্ত।

সব কথার উত্তর রমলা একটা একটা করে দিল। তারপর ওঠবার মুখেই বিপত্তি।

একটা থালায় ফলের রাশ, একটা বাটিতে ক্ষীর নিয়ে মিনুর মা সামনে রাখল।

সর্বনাশ, রমলা প্রাণপণে আপত্তি জানাল, একি করেছেন! এতসব খেলে হোস্টেলে গিয়ে আর কিছু মুখে দিতে পারব না।

কোন ওজর টিকল না। বসে বসে রমলাকে অনেকখানিই খেতে হল।

খাওয়ার পরে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রমলাকে উঠতে হল। লণ্ঠন হাতে একটা চাকর এল এগিয়ে দিতে।

ঠিক এই সমাজ সম্বন্ধে রমলার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না।

ব্যারিস্টারের মেয়ে কিছু কিছু অভিজাত সমাজে মিশেছে। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে পার্টিতেও গিয়েছে। কলেজের অনুষ্ঠানে বহু লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, কিন্তু তারা ঠিক এদের মতন নয়। তাদের হাসি মাপা, কথাবার্তা আরো মাপা। এতদিন তাদেরই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। তাদের অনুকরণ করতে পারলেই বমলা কৃতার্থ হত।

এদেব সঙ্গে মিশে, কথা বলে রমলা এইটুকু বুঝল, এ আর এক জগৎ। সারা দেহ ছাপিয়ে এরা হাসে, কথা বলে সাবলীল ভঙ্গীতে, কাছে টানে অনাবিল উত্তাপে।

একটু গিয়েই কিন্তু রমলার ভুল ভাঙল।

দু'পাশে অনেক বাড়ির বৌঝিরা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। দু-একজন উঠানে এসেও দেখছিল ঘোমটা তুলে।

তাদেরই কয়েকজনের কথার টুকবো রমলার কানে গেল।

কে বা ন'বৌ?

ওই যে তুলসীবাবু এক ইস্কুল খুলেছে না, তারই বুঝি মাস্টাবনী।

বেশ দেখতে তো মেয়েটিকে। যেমন রঙ, তেমনই মুখ চোখের বাহার।

তা হবে না? তুলসীবাবু যে কলকাতায় গিয়ে নিজে পছন্দ করে এনেছেন।

পছন্দ করে এনেছেন কি লা?

হ্যাঁ মা, তাই। তুলসীবাবু নিজের ছেলের জন্য পছন্দ করে এনেছেন।

ছেলের জন্য?

হ্যাঁ, ওই যে আপনার ন'ছেলের বন্ধু আদিত্যবাবু, তার জন্য। রোজ সন্ধ্যায় একসঙ্গে যে সবাই ঘোষেদের বৈঠকখানায় তাস খেলতে বসে।

চটির স্ট্র্যাপটা ঠিক করার ছুতোয় রমলা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকটি কথা তার কানে গেল। সোজা হয়ে যখন দাঁড়াল, তখন তুটো চোখে তীব্র দাহ। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে চেপে রক্তাক্ত করে তুলেছে।

এরপর, এরপর কি করবে রমলা। কি তার করা উচিত। একজন লোক নির্বিবাদে কালি ছিটিয়ে তার সর্বাংশ মসীলিপ্ত করবে, আর সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাই সহ্য করবে?

কখনই না। এখানে চাকরি করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। আজই হোস্টেলে ফিরে গিয়ে নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলবে। কিছু বলা যায় না, মিনুর মা হয়তো এইজন্যই তাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিল। তুলসীবাবু এ তল্লাটের বিখ্যাত লোক। তাঁর নিজের পছন্দ করে আনা পুত্রবধূকে পূর্বাহ্নে একটু দেখবার লোভ কে ছাড়তে পারে!

এতক্ষণ ধরে মনের মাধুরী মিশিয়ে কুসুম চয়ন করে রমলা যে সুন্দর মালাটি গাঁথছিল, সেটা যেন হঠাৎ তার হাত ফসকে পড়ে গিয়ে কর্দমাক্ত হয়ে গেল। এতক্ষণ মনে মনে যে প্রশান্তির ছবি আঁকছিল, তুলির রূঢ় আঁচড়ে সে ছবির বর্ণ, দীপ্তি, রেখা সব নষ্ট হয়ে গেল।

হোস্টেলে ফিরে সমবয়সীদের এড়িয়ে রমলা সোজা সুলতার ঘরের চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়াল।

সুলতাদি!

সুলতা ঘরের মধ্যে নিজের জামা সেলাই করছিল, বলল, কে?

আমি, রমলা।

এস, এস, ভিতরে এস।

রমলা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে সুলতা জামাটা একপাশে সরিয়ে রাখল।

কি ব্যাপার রমলা, স্কুলের পরে কোথায় গিয়েছিলে? বাসীর মা তোমার চা নিয়ে ফিরে এল।

রমলা সুলতার পাশে বসে মিনুর মায়ের নিমন্ত্রণের কথা বলল।

তা মন্দ নয়, হোস্টেলের একঘেয়ে রান্না খেয়ে মুখ নষ্ট হয়ে যাবার যোগাড়, ছাত্রীর বাড়িতে ভালমন্দ খাওয়া মাঝে মাঝে দোষের নয়। প্রথম প্রথম আমিও খুব নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়িয়েছি। কি ব্যাপার, রাত্রে কিছু খাবে না, তাই বুঝি বলতে এসেছ।

সুলতা বলাতে রমলার মনে পড়ে গেল এমাসে হোস্টেলের ম্যানেজার সুলতা। শিক্ষিকাদের খাওয়া-দাওয়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব তার ওপর। কিন্তু এ কথা বলতে তো আসে নি রমলা। যা বলতে এসেছে, সে কথাটা কি করে শুরু করবে তাই. ভাবতে লাগল।

সুলতা আবার জিজ্ঞাসা করল, কি, পেট ভরতি তো?

রমলা এ কথার কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে শুধু বলল, আমি আর এখানে চাকবি করতে পারব না সুলতাদি।

কেন, কি হল?

রমলা পথের ঘটনা সব বলল। যেটুকু তার কানে গেছে, মেজাজ খারাপ করে দেবার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট।

সুলতা সব কথা মন দিয়ে শুনল, তারপর বলল, পুরুষ সম্বন্ধে তোমার একটা অদ্ভুত ভীতি রয়েছে রমলা। তুমি কি মনে কর, নারীত্ব এত ঠুনকো জিনিস যে কেউ হাত ধরলে, কিংবা কেউ কিছু বলে বেড়ালেই সেটা ক্ষুণ্ণ হবে?

আমি আপনাকে পাল্টা আর একটা প্রশ্ন করতে চাই সুলতাদি।

বল।

কোন দুর্বৃত্ত এসে যদি আমার হাত ধরে, কু-কথা বলে, তারপরে আমার সংসারে ফিরে আসার পথ কি খুব সুগম থাকবে?

এ দেশে একটা স্ত্রীলোককে ত্যাগ করতে কতটুকু অপবাদের প্রয়োজন হয়, তা কি আপনার জানা নেই, সুলতাদি? এদেশে নারী দেবী, সে শুধু পুঁথির পাতায়, বাস্তবে তার স্থান আঁস্তা-কুড়েরও তলায়।

তুমি উত্তেজিত হয়েছ রমলা, একটু স্থির হয়ে বস। তর্কের পথ ছেড়ে সুলতা সান্ত্বনার পথ, সহানুভূতির পথ ধরল।

এতেও উত্তেজিত হব না সুলতাদি? একটা পথের লোক, কানাকড়ির যোগ্যতা যার নেই, সে লোভের হাত বাড়াবে, অশ্রাব্য কথা বলে বেড়াবে, আর চাকরি যাবে এই আতঙ্কে মুখ বুজে পড়ে থাকব! এ আমি কিছুতেই পারব না সুলতাদি।

শেষদিকে রমলার স্বর অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল।

সেরকম কিছু হলে নিশ্চয় আমি তোমাকে অপমান সহ্য করে এখানে থাকতে বলব না রমলা। তোমার তো পাকা চাকরি নয়, যে পিছটান আছে। একটা দরখাস্ত দিলেই মুক্তি। তুমি ভাবছ কেন?

কেন ভাবছে সে কথা রমলা বলতে পারবে না। এইভাবে পুরুষেরা বার বার তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কলুষিত করবে আর সে একটি কথা বলতে পারবে না। জয়ন্ত তার অবমাননা করেছে দুপায়ে দলে, শান্তনু তাকে অবজ্ঞায় অবহেলায় পথের পাশে ফেলে দিয়েছে। তবু তাদের রমলার সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা ছিল, আর আদিত্যবাবুর কি আছে! রূপ, গুণ, বিদ্যাবুদ্ধি কিসের জোরে তিনি রমলার সান্নিধ্য কামনা করেন!

এক চিন্তা থেকে রমলা আর এক চিন্তায় জড়িয়ে পড়ে। জয়ন্ত থেকে শান্তনু। শান্তনু কি দোষ করেছে! প্রথম দিকে দারুণ ঔদাসীন্য আর অবহেলায় রমলার কাছে আসে নি। রমলার উগ্র আধুনিকতা হয়তো তার পছন্দ হয় নি, কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে সেও ধরা দিয়েছে রমলার সৌন্দর্যের জালে। রমলাই বরং

আমল দেয় নি। তখন তার মন অন্যখানে আবদ্ধ। জয়ন্ত তার দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্ন। জয়ন্ত ছাড়া আর কোন পুরুষের কথা ভাবতেও ভাল লাগত না।

ফলে দুটো পুরুষই সরে গেল রমলার জীবন থেকে।

সুলতা উঠে দাঁড়াল। রমলার কাছে এসে বলল, চল, বাইরে একটু হাওয়ায় বসি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

দুজনে হেঁটে হেঁটে সতীসায়রের লাল-সিমেন্ট-বাঁধা ঘাটের ওপর গিয়ে বসল।

অল্পক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। দূরে ঝোপেঝাড়ে ঝিঁঝি ডাকছে। একটানা শব্দের রেশ।

সুলতাই কথা বলল, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব রমলা, অবশ্য যদি তুমি কিছু মনে না করো।

অন্ধকারে দুটি চোখ বিস্ফারিত করে রমলা দেখার চেষ্টা করল। শুধু সুলতার বাইরেটাই নয়, তার অন্তরও জরিপ করার চেষ্টা। তারপর বলল, না, না, মনে করার কথা না হলে, মনে করব কেন?

সুলতা আসল কথাটা ভাঙল না। শুধু বলল, তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। তোমাকে আমি ছোট বোনের মতনই দেখি। বিশেষ করে দুজনের জীবন যখন এক গাঁটছড়ায় বাঁধা। কথাটা কদিন ধরেই ভাবছি রমলা।

বলুন কি কথা?

সুলতা ঢোঁক গিলল। গলা পরিষ্কার করল, তারপর বলল, তুমি কি কোন পুরুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছ?

রমলার মনে হল সিমেন্টের চাতালটা অল্প অল্প দুলছে। সায়রের জল বেড়ে বেড়ে আছড়ে পড়ছে চাতালের ওপর। জলের স্রোত এখনই বুঝি রমলাকে মুছে দেবে।

শাড়ীর আঁচলটা দু হাতের মুঠোয় ধরে রমলা টাল সামলাল।

খুব মৃদু গলায় বলল, কেন, একথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন সুলতাদি ?

সুলতা মুচকি হাসল। বলল, বিশেষ কোন কারণ নেই। এমনই জিজ্ঞাসা করছি। কারণ দেখছি পুরুষ জাতটার ওপরই তুমি বীতশ্রদ্ধ।

রমলা ঘাড় নাড়ল, না, সুলতাদি, আর কোন পুরুষ সম্বন্ধে তো আমি আপনার কাছে কোন অভিযোগ করি নি। যার সম্বন্ধে করেছি, তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারাবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে সুলতাদি। সেদিনের মিটিংয়ের পরের ব্যাপারটা আপনাকে বলেছি। পথের ঘটনাটাও সব জানেন, আর আজকের কথাও তো এসেই বলেছি আপনাকে।

সুলতা রমলার দিকে আর একটু ঘেঁষে বসল। একটা হাত রাখল তার কাঁধের ওপর। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলল, একটা বিশেষ পুরুষকে কেন্দ্র করে সমগ্র পুরুষজাতটার ওপর তোমার বিরাগ ফুটে উঠেছে রমলা। এ ধরনের লোক সংসারে অনেক থাকে। শেয়ালের মতন গৃহস্থের আনাচে-কানাচে তারা ঘোরে। সুযোগ পেলেই মানুষের সর্বনাশ করে। শুধু চেঁচামেচিতে কোন ফল হয় না। গৃহস্থকে সাবধান হতে হয়। তুমি ঠিক থাকলে, কারো সাধ্য কি তোমার কেশ স্পর্শ করে।

সেদিন সুলতার এই উপদেশগুলো রমলার মনে লেগেছিল। ভেবেছিল, সত্যিই তো, নিজে যদি ঠিক থাকে, কার সাধ্য তার সর্বনাশ করে। জয়ন্ত এত বড় সর্বনাশ করতে পেরেছে, শুধু রমলা অসাবধান ছিল বলে। নিজেকে রক্ষা করতে পারে নি। তার ছলনাকে সত্যি ভালবাসা ভেবেছিল। আলেয়াকে আলো। দোষ রমলারও কম নয়। জয়ন্তর মধ্যে সে তার মনের মানুষকে আবিষ্কার করেছিল, স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি রক্তমাংসের বদলে প্রবঞ্চনার কঙ্কালমূর্তিটা এভাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

সামনের দিকে চোখ পড়তেই রমলা ভ্রূ কোঁচকাল। গায়ে মাথায় কাপড় টেনে দিল ভাল করে।

সতীনাথ তর্কভূষণ এদিকে আসছেন। সম্ভবত ওরই কাছে।

ঠিকই তাই। তর্কভূষণ সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কেমন আছ মা?

রমলা কোন উত্তর দিল না। অনেক উঁচুতে আকাশের বুকে চক্রাকারে একটা চিল পাক দিচ্ছিল, সেই দিকে চেয়ে রইল।

তর্কভূষণ ছাড়বার পাত্র নন। ধর্মকথা তিনি শোনাবেনই, চোরা না মানলেও।

সামনের কাঠের টুলের ওপর বসলেন। গীতাটা রাখলেন কোলের ওপর। হিন্দুর মেয়ে তুমি, ঈশ্বর নিশ্চয় মানো? পুবাণের দেবদেবী?

রমলা এবার আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে মুখ ফেরাল। তর্কভূষণের দিকে চেয়ে বলল, ঈশ্বর আছেন বইকি, আপনারাই তো তাঁর ম্যানেজিং এজেণ্টস্! ঈশ্বর না থাকলে আপনাদের ব্যবসা যে মাটি হবে!

আ, ছি ছি মা, কি কথার কি উত্তর। তর্কভূষণ দাঁত দিয়ে জিভ কাটলেন, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। সর্ব-জীবে তাঁর সমান দয়া। পাপী-তাপীকে তিনি নিজের কোলে টেনে নেন। একবিন্দু অনুতাপের অশ্রুতে তাঁর অর্ঘ সাজালেই তিনি খুশী।

অন্যদিন রমলা চীৎকার করে ওঠে। তেড়ে যায় তর্কভূষণের দিকে। তিনি পালাতে পথ পান না। আজ কিন্তু রমলা শান্ত হয়ে বসে রয়েছে। দু-একটা কথাও বলছে তর্কভূষণের সঙ্গে।

নিজের আচরণ রমলার নিজের কাছেই আশ্চর্য লাগছে। এত ক্লান্তি এত অবসাদ স্নায়ু-কোষে-কোষে সঞ্চিত ছিল! আজ সময় বুঝে তারা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। তর্ক করার শক্তিটুকুও নিঃশেষিত, আক্রমণ করার উত্তেজনাও স্তিমিত।

তর্কভূষণ আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। বোধ হয় একটু উৎসাহিত হলেন। হয়তো ভাবলেন, সময় সন্নিকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। জমি প্রায় তৈরি, এইবার ধর্মের বীজ বোনা যেতে পারে।

তর্কভূষণ আরম্ভ করলেন, হিন্দুধর্ম জন্মান্তরে বিশ্বাসী। এক জন্ম বিফলে গেল, তাতে ক্ষতি নেই মা। শেষসময়ে পুণ্যচিন্তা পুণ্যকার্য করলে জন্মান্তরে এর ফল পাওয়া যায়। নরকভোগের মেয়াদ কমে। এ জন্মের পাপ পরজন্মে স্পর্শ করে না।

আচ্ছা ঠাকুরমশাই? শান্ত, অবিচল কণ্ঠে রমলা ডাকল।

বল মা'? তর্কভূষণ আরো একটু সরে বসলেন।

আপনি কত করে পান এর জন্য?

কিসের জন্য মা? তর্কভূষণ একটু যেন দমে গেলেন।

এই ধর্ম বিতরণের জন্য? বিনামূল্যে, প্রাণের তাগিদে এসব করেন এমন কথা বলবেন না। সে-কথা বিশ্বাসও করতে পারব না।

মূল্যটা পরের কথা মা। তোমাদের চিত্তশুদ্ধি করাই আমার প্রধান কর্তব্য।

রমলা হাসল, আজ যদি আপনাকে একটি পয়সাও দেবার ব্যবস্থা না থাকে, তা হলেও আপনি এসে রোজ গীতাপাঠ করে যাবেন?

জিভ দিয়ে তর্কভূষণ শুষ্ক অধর-ওষ্ঠ একবার ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন, তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, আমারও তো সংসার আছে মা। পরিবার প্রতিপালন করতে হয়। তাদের নিরম্বু উপবাসী রেখে ধর্মপাঠ করলে আমার চলবে কেন?

তা হলেই বুঝুন, ধর্ম আপনার অন্তরের বস্তু নয়, ব্যবসায়ের অঙ্গ মাত্র। বলতে পারেন আপনার ভেক।

তাতে আর তোমার ক্ষতিটা কি মা? তর্কভূষণ যেন একটু বিরক্ত হলেন।

লাভ ক্ষতি সব কিছু আমি পার হয়ে এসেছি। আমার কথা থাক। আপনার কথা বলুন।

আমার কথা?

হ্যাঁ, আপনি যে পাপ করছেন তার কি প্রতিকার? যে জিনিস নিজে অন্তর দিয়ে বুঝতে পারছেন না, সে জিনিস অন্যকে সত্য বলে বোঝাবার পিছনে প্রতারণা রয়েছে, সেটা অস্বীকার করতে পারেন? নিজে নিস্পৃহ হন, তবে নিষ্ঠা আসবে।

রমলার কথা শেষ হবার আগেই তর্কভূষণ দাঁড়িয়ে উঠলেন।

একটু দূরে পিনাকীবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একজন মেটের সঙ্গে কথা বলছিলেন, চেঁচিয়ে তাঁকে ডাকলেন।

পিনাকীবাবু, ও পিনাকীবাবু! একবার দয়া করে এদিকে আসুন।

তর্কভূষণের হাঁকডাকে, শুধু পিনাকীবাবুই নয়, আরো কয়েক-জন কয়েদী এসে দাঁড়াল। কয়েদীবা এসে জড় হল বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারল না, মেটের চীৎকারে আবার যে যার কাজে ছড়িয়ে পড়ল।

পিনাকীবাবু এসেই প্রথমে রমলার দিকে দেখলেন, তারপর তর্কভূষণের দিকে ফিরে বললেন, কি হল?

কদিন থেকে যা সন্দেহ করেছি তাই। তর্কভূষণ দারুণ হতাশায় ছুটো হাত নাড়লেন।

কিসের সন্দেহ? পিনাকীবাবু রমলার কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়ালেন।

তর্কভূষণ মুখে কিছু বললেন না, কেবল আঙুল দিয়ে নিজের মাথাটা দেখালেন, মাথার আর কিছু পদার্থ নেই।

রমলা সে স্কুলে থাকতে পারে নি। থাকা সম্ভব হয় নি।

গরমের ছুটি। হোস্টেল প্রায় খালি। সব মিলিয়ে জনচারেক শিক্ষিকা রয়েছে। শুয়ে, বসে সময় আর কাটতেই চায় না।

হঠাৎই কথাটা রমলার মনে পড়ল। এই ফাঁকে একবার কলকাতা গিয়ে টাকাগুলোর বন্দোবস্ত করে এলে হয়। থাকার প্রশ্ন নেই। সকালে গিয়ে বিকালে ফিরে আসতে পারে।

টাকা কটা মিছামিছি কারেন্ট-একাউন্টে ফেলে রাখার কোন মানে হয় না। তার চেয়ে বরং ফিক্সড-ডিপজিট কিংবা ক্যাশ-সার্টিফিকেট কিনে রাখাই ভাল। কথায় কথায় একবার স্থুলতাদিই বলেছিল, অবশ্য তার নিজের টাকা সম্বন্ধে। সেটা রমলা মনে রেখেছে।

সেজেগুজে ভ্যানিটি-ব্যাগ হাতে নিয়ে রমলা বেরিয়ে পড়ল। চৌরাস্তার মোড় থেকে একটা সাইকেল-রিক্সা নিয়ে নেবে।

গাড়ী সাতটা তেরোয়। কলকাতায় পৌঁছতে প্রায় সাড়ে এগারোটা। ব্যাঙ্কের কাজ দুটোর মধ্যে সেরে রমলা দুটো পঞ্চান্নর গাড়ীতে এখানে ফিরে আসবে। মোটামুটি এই ঠিক করেছিল।

ট্রেন আসতেই অপেক্ষাকৃত একটা খালি কামরা দেখে রমলা উঠে পড়ল। জানালার কোণে গিয়ে বসল। ইচ্ছা করেই সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কেটেছে, যাতে ভিড়ের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত না হয়।

কিন্তু ট্রেন ছাড়তেই রমলা যেন ভূত দেখল।

একটু দূরেই আদিত্যবাবু বসে। পায়ের কাছে ছোট একটা স্যুটকেস।

উপায় নেই, তা না হলে রমলা নেমে কামরা বদল করত।

চোখাচোখি হতেই আদিত্যবাবু একগাল হাসলেন।

কোথায় ?

রমলা ভাবল, একবার বলে বর্ধমান। বর্ধমানেই না হয় নেমে যাবে। পরের ট্রেন ধরে আবার কলকাতায় ফিরে যাবে। এমন একটা লোকের সাহচর্যের চেয়ে তাই ভাল। কিন্তু পরেই দ্রুত চিন্তা করে নিল। কেন এমনভাবে চোরের মতন নেমেই বা যাবে

কেন? কি করতে পারে লোকটা। এ কামরায় আরো লোক রয়েছে। একটু হৃদ্যতার ভান করবে, অন্তরঙ্গতার অপচেষ্টা, এর বেশী তো আর কিছু নয়।

রমলা সোজাসুজি চাইল আদিত্যবাবুর দিকে। বলল, একটু কলকাতায় যাচ্ছি নিজের কাজে।

এইটুকুই আদিত্যবাবুর পক্ষে যথেষ্ট। নীচু হয়ে সুটকেসটা তুলে নিয়ে একেবারে রমলার কাছে এসে বসলেন।

বললেন, ভালই হল। গাড়ীতে কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে। একলা একলা বড় বিশ্রী লাগে।

রমলা কিছু বলল না। জানলার দিকে আর একটু সরে বসল।

আদিত্যবাবুর ওই একটা মস্ত সুবিধা। আর কাউকে বিশেষ কথা বলতে হয় না। নিজেই অনর্গল বলে যেতে পারেন।

তাই করলেন।

আমার অবশ্য কলকাতায় যে বিশেষ কাজ আছে এমন নয়। তবু সারাটা দিন কাটিয়ে আসব। প্রথমে যাব ছিপের দোকানে।

ছিপ? আচমকা কথাটা রমলার গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ, ওই মাছ ধরবার ছিপ আর কি। আমার আবার এসব বিষয়ে ভয়ানক বাতিক। গোটা দুই হুইল কিনতে হবে, ভাল সুতো আর কিছু বঁড়শী। এখন গরমের সময় জল কম, মাছ একেবারে নীচেয় নেমে যায়। বর্ষার মুখে জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছ ধরার সীজন আরম্ভ হয়, বুঝলেন?

রমলা কিছু বোঝে নি। ভাল করে শোনেওনি কথাগুলো। স্কুলে চাকরি করতে এসেছে বলে মাছ ধরার কৌশলও সব জানতে হবে, এমন কোন অলিখিত চুক্তি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছিল না।

রমলা বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। কত দ্রুত ঝোপঝাড় মাঠঘাট, টেলিগ্রাফের তার পিছনে ছুটে যাচ্ছে, তাই দেখছিল।

তারে তারে রং-বেরঙের পাখীর দল। হাওয়ার তালে তালে তুলছে। একপাল লোক মেঠো পথ ধরে চলেছে। পিছনের পালকিতে ছোট একটা বৌ। দরজাটা একটু খুলে সবিস্ময়ে ট্রেনের দিকে চেয়ে রয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে বোধহয় আদিত্যবাবুর খেয়াল হল তাঁর কথাগুলো যাকে উদ্দেশ করে বলা তারই কানে যাচ্ছে না।

কি ব্যাপার, আপনি একটু যেন অন্যমনস্ক রয়েছেন?

রমলা আস্তে মুখ ফেরাল। ক্লান্ত গলায় বলল, মাথাটা বড্ড ধরেছে। একটু বরং ঘুমাবার চেষ্টা করি।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই রমলা চোখ বুজল।

আদিত্যবাবু তু'হাঁটুর ওপর হাত রেখে চুপচাপ বসে রইলেন।

রমলা যখন চোখ খুলল, তখন গাড়ী বর্ধমান স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে দারুণ সোরগোল। আদিত্যবাবু পাশে নেই।

একটু নীচু হয়ে রমলা দেখল। সীটের তলায় সুটকেস রয়েছে। বোধহয় ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মে নেমেছেন। ঝোলার মধ্যে খুব পুরোনো একটা পত্রিকা ছিল, সেটা বের করে রমলা পড়তে শুরু করল।

নিন, ধরুন।

গলার শব্দে পত্রিকা সরিয়ে রমলা মুখ তুলেই অবাক।

আদিত্যবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। একহাতে চায়ের কাপ, অন্য হাতে শালপাতার ঠোঙা।

একি?

বিশেষ কিছু নয়। এক কাপ চা আর বর্ধমানের বিখ্যাত সীতাভোগ আর মিহিদানা। ধরুন, বড্ড গরম লাগছে।

রমলা বিরক্তিতে ঘাড় নাড়ল, কেন আপনি এসব আনতে গেলেন? আমি বাইরের জিনিস একেবারে খাই না।

আদিত্যবাবু একটু অপ্রস্তুত হলেন, বাইরের মানে, স্টেশন

থেকে কেনা নয়। বিজয়তোরণের পাশে আমার একটা জানা দোকান আছে, সেখান থেকে নিয়ে এসেছি।

তা হলেও আমার চলবে না আদিত্যবাবু, ডাক্তারের বারণ। আমি বরং চায়ের কাপটা নিচ্ছি।

কৃতার্থ ভঙ্গীতে আদিত্যবাবু চায়ের কাপটা এগিয়ে দিলেন।

গাড়ী বর্ধমান ছাড়ার পর আদিত্যবাবু প্রশ্ন করলেন, আপনার মাথার যন্ত্রণাটা এখন কেমন?

রমলা মুখের একটা কাতর ভঙ্গী করে বলল, একটু কম। তবে কথা বললেই বাড়ে।

ও, তবে থাক। আপনার কথা বলে দরকার নেই।

আদিত্যবাবু পা গুটিয়ে আবার চুপচাপ বসলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ পারলেন না। কিছু সময় কেটে যেতেই বললেন, আপনার মতন মেয়ে যে কেন এ লাইনে এলেন।

কোন্ লাইনে?

এই মাস্টারির লাইনে। দূর, দূর, এখানে আছে কি। বকে বকে শরীর খারাপ করা। পরের ছেলেমেয়ের পিছনে জীবন নষ্ট। তার ওপর মাইনেও এমন কিছু বেশী নয়। দেহ মন দুইই যায়।

রমলা কোন উত্তর দিল না। একদৃষ্টে আদিত্যবাবুর দিকে চেয়ে রইল। সব কিছু কেমন একটু বেসুরো ঠেকছে।

তাহলে আমাদের মতন মেয়েদের কি করা উচিত? খুব আস্তে রমলা জিজ্ঞাসা করল।

আপনার মতন মেয়েদের বিয়ে-থা করে সংসারী হওয়া উচিত। এমন রূপ, এত বিদ্যা।

আনন্দের আতিশয্যে আদিত্যবাবু কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না।

আবার রমলার শিরায় শিরায় রক্তের স্পন্দন দ্রুততর হল।

সারা মুখ আবির-লিপ্ত। এরপর, এরপর কি করা উচিত লোকটাকে! অভদ্র ভাষণের কি উত্তর দেওয়া উচিত!

রমলা নিজেকে সামলে নিল। হাসবার একটু চেষ্টা করে বলল, বা, স্কুলের সেক্রেটারিগিরি করা ছাড়া আরো কাজ করেন আপনি?

আর কি কাজ? আদিত্যবাবুর মুখে অকৃত্রিম কৌতূহলের ছাপ।

কেন, ঘটকালি।

হাসতে গিয়েও আদিত্যবাবু হাসতে পারলেন না। একটু যেন বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

ট্রেন হাওড়ার কাছাকাছি আসতে আদিত্যবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোন্‌দিকে যাবেন? আমি সারাদিনের জন্য একটা ট্যাক্সি ভাড়া করব। আপনি আসতে পারেন আমার সঙ্গে। যেখানে যাবেন, নামিয়ে দেব।

অথৈ জলে তলিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে মানুষ যেমন বাঁচাব অসীম আগ্রহে খড়ের কুটোকেও আঁকড়ে ধরে, রমলা ঠিক তেমনিভাবে অসম্ভব এক কাহিনীকে জাপটে ধরল।

বলল, স্টেশনে আমাকে একজন নিতে আসবেন, তাঁর সঙ্গেই যাব।

আপনার কোন আত্মীয় বুঝি?

রমলা অদ্ভুত এক কাজ করল। মুখচোখে লজ্জারুণ ভাব ফুটিয়ে বলল, এখনও আত্মীয় হন নি, তবে শীঘ্রই হবেন।

অ্যাঁ, অ। আদিত্যবাবু কি বলতে গিয়েই থেমে গেলেন। আর একটি কথাও বললেন না। স্টেশনে গাড়ী থামতে স্যুটকেস হাতে নিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেলেন।

রমলা ক্লান্ত-পায়ে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে কিছুক্ষণ বসল। এই মিথ্যা কাহিনী কোন যাদুকরের ঐন্দ্রজালিকী স্পর্শে সত্য হয়ে

উঠতে পারে না? হাস্যোজ্জ্বল মুখে জয়ন্ত ঘোষাল তো এসে অপেক্ষা করতে পারে। আগের দিনের মতন পাশাপাশি দুজনে হাঁটতে পারে। গঙ্গার কূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে। অর্থহীন কথার বুদ্‌বুদ্‌ ছিটোতে ছিটোতে লক্ষ্যহীনভাবে এগিয়ে যেতে পারে দুজনে। মাঝখানের কয়েকটা দুঃসহ দিন মুছে ফেলে।

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে রমলা উঠে দাঁড়াল।

ব্যাঙ্কের কাজ শেষ করে রমলা যখন পথে পা দিল তখন তপ্ত নিদাঘের অগ্নিবাণে সারা কলকাতা শহর রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করছে। উত্তপ্ত লূ বইছে, পীচ গলে পথের ওপর যেন ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তৃষ্ণায় রমলার গলা শুকিয়ে কাঠ।

এদিক ওদিক চেয়ে রমলা একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে ঢুকল। সকালের আহারটা এখানেই সেরে নেবে।

চলতে চলতেই রমলা দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা কামরার পর্দাটা সরে যেতেই দেখা গেল।

ওদের সঙ্গেই কলেজে পড়ত, তবে আই. এ. পর্যন্ত। তার ওপরে আর উঠতে পারে নি। রেবা পাইন। কলেজ ছাড়ার পরও পথে-ঘাটে রেবার সঙ্গে রমলার দেখা হয়েছে। সব সময়েই রেবা সেজেগুজে ফিটফাট। যে দুঃসাহসিক ব্লাউজ পরে সে কলেজে যেত, তাতে সহপাঠীরা আনন্দ পেত বটে, কিন্তু সহ-পাঠিনীরা লজ্জায় মুখ তুলতে পারত না।

অনেকদিন পরে দেখা। রমলা দাঁড়াল। মৃদু গলায় ডাকল, রেবা।

রেবা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল, ডাক শুনে পিছনে ফিরেই চেঁচিয়ে উঠল, আরে, রমলা যে। আয়, আয়, ভিতরে আয়। কি খবর বল?

তবুও রমলা ইতস্তত করছে দেখে রেবা একহাতে পর্দাটা তুলে ধরে বলল, আরে নির্ভয়ে চলে আয়। আমি একলা রয়েছি।

রমলা ভিতরে ঢুকল।

তারপর, তুই তো আসানসোলে কোন স্কুলে মাস্টারি করছিস, না?

হ্যাঁ, তোকে কে বললে?

আরতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বুঝি কোচবিহার না কোথায় চলে যাচ্ছে। তারপর নতুন জীবন কেমন লাগছে বল?

নতুন জীবনই বটে। রমলা হাসল, দাঁড়া, কিছু খাবার অর্ডার দিই। সাত-সকালে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়েছি।

বেয়ারা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল অর্ডারের প্রত্যাশায়। রেবা রমলার হাতদুটো চেপে ধরে বলল, ঠিক আছে, আমি অর্ডার দিচ্ছি। আমারও সকালে কিছু জোটে নি। সাড়ে আটটার সময় মিস্টার সেন, মানে আমার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়িতে ছুটতে হয়েছিল। একটু আগে ছুটি পেলাম।

তোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর?

আমার মানে, ইউনিক ইণ্ডাস্ট্রিজের। ভদ্রলোক ছুটিতে আছেন, কিন্তু অফিসের ফাইল বাড়িতে যাচ্ছে, আর আমার ডাক পড়ছে। আমিও কদিন ছুটি নিয়েছি। ছুটি নিলে হবে কি, ছুটোছুটির কামাই আছে?

একটু থেমে রেবা বেয়ারাকে খাবার দেবার নির্দেশ দিল। দুজনের মতো। তারপর রমলার দিকে ফিরে বলল, কি রে, বললি না, মাস্টারি কেমন লাগছে?

চেয়ে চেয়ে রমলা দেখল। রেবার পরনে দামী শাড়ী, হাল-ফ্যাশানের ব্লাউজ। চুলে ডোনাট। কানে হালকা অথচ নয়ন-লোভন ইয়ারিং। ভালই আছে রেবা, বেশ সুখেই আছে।

তোর জয়ন্তর এপিসোডটাও শুনলাম। কি জানি ছেলেটাকে আমার বরাবরই হামবাগ মনে হত। তুই ওর মধ্যে কি ডেমিগড

দেখেছিলি, তুইই জানিস। এখন তো শুনলাম, বিয়ে-থা করে বিলেতেই রয়েছে। তাই না?

মাথা নীচু করে রমলা মাথা নাড়ল।

তা বলে তুই যেন আবার তপস্বিনী সেজে জীবন কাটাস নি।

আমার সাজপোশাক কি তপস্বিনীর মতন মনে হচ্ছে?

সাজপোশাক আর মানুষের কতটুকু। আবরণ তো ভড়ং মাত্র। রেবা দার্শনিকের সুর আনল কণ্ঠে। তোর মুখচোখের চেহারা দেখে কিন্তু খুব উদাসীন মনে হচ্ছে।

মুখচোখের আর দোষ কি। সারাটা দিনই তো পথে পথে কাটল।

বেয়ারা খাবার নিয়ে এল। দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এ চাকরি যদি ভাল না লাগে তো বল। কাঁটাচামচ একপাশে সরিয়ে রেখে রেবা জিজ্ঞাসা করল।

রমলা ভ্রূ কোঁচকাল। সেকি, শহরে হঠাৎ চাকরি এমন সহজ-লভ্য হয়ে গেল নাকি! রেস্তরাঁর কামরায় কামরায় অযাচিতভাবে তার বিতরণ চলছে।

কেন, হাতে আছে নাকি চাকরি? জল খেতে খেতে রমলা প্রশ্ন করল।

হাতে নেই। তবে চেষ্টা করতে পারি। আমাদের এখানেই মাঝে মাঝে লোক নেওয়া হয়। মিস্টার সেনকে বললে আমার কথা আশা করি রাখবেন।

বেশ তো, দেখ না। পাড়াগাঁয়ে আর ভাল লাগছে না। তা ছাড়া ছেলেমেয়ে পেটানোও আমার দ্বারা হয়ে উঠছে না। চাকরি ভাল হয় তো, এখনই ছেড়ে চলে আসি।

ঠিক আছে, তোর ঠিকানাটা দে। আমি একটা চিঠি লিখে দেব।

রমলা একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিল।

তুজনেই উঠে দাঁড়াল। রেবা বলল, এখন কোন্ দিকে যাবি?

হাওড়া স্টেশন।

চল তোকে নামিয়ে দিয়ে যাই।

নামিয়ে দিয়ে যাবি?

হ্যাঁ, আমার সঙ্গে গাড়ী রয়েছে, মানে, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের গাড়ী। কাজ করতে করতে খেতে এসেছি। খেয়ে আবার যেতে হবে ওঁর বাড়িতে।

এই যে বললি ছুটিতে আছিস।

অবশ্য এটা ঠিক অফিসের কাজ নয়। পারসোনাল কাজ। এর জন্য আলাদা মাইনে পাই।

বিল মিটিয়ে দিয়ে রেবা বাইরে এসে দাঁড়াল। চোখে কালো চশমা এঁটে নিল। তু হাতের তালি দিয়ে ফুটপাথের অপর পারে দাঁড়ানো ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

রমলাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, আমি সুযোগ পেলেই লিখব তোকে। তুই চলে আয়। আমি একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছি। একেবারে একলা। তুই এলে তুজনে একসঙ্গে থাকতে পারব।

ট্রেনে ওঠবার আগে রমলা ভাল করে একবার দেখে নিল। কিছু বলা যায় না, শনিব মতন আদিত্যবাবু হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন।

না, আদিত্যবাবু নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে রমলা কামরায় বসল।

দিন সাতেকের মধ্যেই চিঠি এল। রমলা ক্লাসে পড়াচ্ছিল, বেয়ারা এসে চিঠিটা দিয়ে গেল পড়াতে পড়াতেই রমলা আড়-চোখে চিঠির দিকে নজর দিল। খামের পাশে ইউনিক ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর নাম। রেবার চিঠি।

আশ্চর্য মানুষের মন! এই স্কুল ছেড়ে দেবার জন্য মনেপ্রাণে রমলা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। রেবার চিঠির জন্য দিন গুণছিল,

অথচ সেই চিঠি আসতে রমলার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সারা ক্লাসের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দিল। একরাশ কচি কচি মুখের সার। নিষ্পাপ দৃষ্টি মেলে রমলার দিকে চেয়ে রয়েছে। এদের ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ক্লাস শেষ হতেই করিডরে দাঁড়িয়ে চিঠিটা খুলল। খুলেই অবাক। রেবার চিঠি নয়, ইংরাজী চিঠি। তলায় এ. কে. সেনের সই। একেবারে রমলার নিয়োগপত্র এসেছে। বেতন দু'শ'। কাজ দেখে ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ধারিত হবে। যদি এ শর্তে রমলা রায়ের সম্মতি থাকে, তাহলে কোম্পানিকে তিন দিনের মধ্যে জানাতে হবে, আর কাজে যোগদান করতে হবে সামনের মাসে।

চিঠিটা অনেকক্ষণ ধরে রমলা উল্টেপাল্টে দেখল। একেবারে কোণের দিকে শুধু ইংরাজীতে লেখা, রেবা। সম্ভবত রেবাই চিঠিটা টাইপ করেছে।

টিচার্স-রুমে বসেই রমলা চিঠির উত্তর দিল। সে রাজী। সামনের মাসের প্রথমেই কাজে যোগদান করতে পারবে। রেবাকে ধন্যবাদ দিয়ে আলাদা একটা চিঠি লিখতে গিয়েই রমলার মনে পড়ল, রেবার ঠিকানাটা তার জানা নেই।

বসে বসে রমলা আর একটা চিঠি লিখল। এ স্কুলের সেক্রেটারিকে। পদত্যাগপত্র। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে এখানে চাকরি করা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়, সে কথাই লিখল। সেই চিঠি নিয়ে রমলা নিজে গেল আদিত্যবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

আদিত্যবাবু উঠছিলেন, রমলাকে ঢুকতে দেখে আবার বসলেন, আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য!

রমলা এ উচ্ছ্বাসের কোন উত্তর দিল না। হাতের চিঠিটা এগিয়ে দিল।

চিঠিটা পড়েই আদিত্যবাবুর মুখ পাংশু হয়ে গেল। মুখ তুলে আস্তে আস্তে বললেন, আপনি, আপনি, চলে যাচ্ছেন? কি

অসুবিধা হচ্ছে আমাকে বলুন। সামনের মাসে আপনাকে পাকা করার কথা আমরা চিন্তা করছিলাম।

সামনের চেয়ারে রমলা ভাল হয়ে বসল। একটা পায়ের ওপর পা তুলে।

না, অসুবিধা আর কি। অসুবিধা কিছু নয়। আমার আর চাকরি করার উপায় নেই।

উপায় নেই? কেন?

আমি চাকরি করি এটা বাড়ির লোকের ইচ্ছা নয়। রমলা কথার ফাঁকে ফাঁকে আদিত্যবাবুর মুখচোখের ভাবটা লক্ষ্য করল। এতদিনের ব্যবহারের যোগ্য প্রতিশোধ দিতে পারছে, এটা ভাবতেই তার মন খুশীতে ভরে উঠল।

বাড়ির লোক আপত্তি করছেন বুঝি?

হ্যাঁ, অবশ্য এখনও ঠিক বাড়ির লোক হন নি, তবে মাস-খানেকের মধ্যেই হবেন। উনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি কিছু একটা করতে চেয়েছিলাম। সেইজন্যই এই অজ পাড়াগাঁয়ে, এমনি বাজে জায়গায় চাকরিটা নিয়েছিলাম।

ফিরে না আসা মানে? উনি বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন, পাস করে সত্ত ফিরেছেন। সেদিন স্টেশনেও এসেছিলেন, ভাবলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, তা ভিড়ের মধ্যে আপনাকে আর খুঁজেই পেলাম না।

আদিত্যবাবুর অবস্থা ঠিক যেন চুপসে-যাওয়া বেলুনের মতন। একবিন্দু রক্ত নেই সারা মুখে। অপমানে, অবসাদে পাণ্ডুর।

আচ্ছা, চলি। যদি সময় পাই তো দুজনে একবার আসব এদিকে। আপনার মুখ থেকে সতীসায়রের গল্প শুনব।

সুইংডোর ঠেলে রমলা দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল। বিধ্বস্ত বিচূর্ণ আদিত্যবাবুকে পিছনে রেখে।

জোরে জোরে কয়েক পা গিয়েই রমলা গতি শ্লথ করল।

খুব কি জিতল রমলা? এই মিথ্যাভাষণে প্রতিষ্ঠিত হল তার হারানো মর্যাদা? আদিত্যবাবুকে আঘাত করার জন্য যে আয়ুধ সে নিক্ষিপ্ত করল, সে আয়ুধ যে তারই বুকের পাঁজরে গড়া একথা তার ভোলবার উপায় নেই।

তবু আদিত্যবাবু অন্তত এইটুকু বুঝুন, রমলা তাঁর নাগালের অনেক বাইরে। মধ্যবিত্ত আঁকশী দিয়ে এ ফুল আহরণ করা সম্ভব হবে না।

হোস্টেলে ফিরে রমলা সুতলাকেই কথাটা প্রথমে বলল, আমি এখানকার কাজ ছেড়ে দিচ্ছি সুলতাদি।

সুলতা আশ্চর্য হল না। স্বল্প হেসে বলল, এ আমি জানতাম রমলা।

কি জানতেন?

জানতাম যে তুমি থাকবে না। মফস্বলের এ খাঁচা তোমার আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট।

আপনাদের কথা কিন্তু আমার চিরদিন মনে থাকবে সুলতাদি।

না, তাও থাকবে না। আঁচল ভরে আমরা স্মৃতির ঝিনুক কুড়োই, তারপর জীবনের পথে দৌড়াতে দৌড়াতে অল্প অল্প করে সে ঝিনুক কোথায় কখন ছিটকে পড়ে আমরা খোঁজই রাখি না। হঠাৎ যখন খেয়াল হয়, তখন দেখি আঁচল শূন্য, একটা ঝিনুকও নেই।

রমলা একটু আশ্চর্যই হয়ে গেল। এভাবে সুলতা কখনও কথা বলে না। এত উপমা, এত অলঙ্কার দিয়ে। রমলার আশু বিচ্ছেদ সুলতাকে বুঝি সত্যিই বিচলিত করেছে।

খবরটা সারা হোস্টেলে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই এসে ঘিরে ধরল রমলাকে।

সবাই জানতে চাইল, কোন্ স্কুল, আর মাইনেটা কত।

.মাইনেটা কত রমলা বলল। স্কুল নয় অফিস, সেটাও জানাল।

কথাটা সুলতাই প্রথম বলল।

হাতে তো আর বেশী সময় নেই, স্কুলে একটা বিদায়-সভার আয়োজন করতে হয়।

পাগল হয়েছেন সুলতাদি, রমলা আপত্তি করল, আমার চাকরিই এখনও পাকা হয় নি, আমার আবার বিদায়-সভা!

কে একটি মেয়ে ফোড়ন কাটল, চাকরি পাকা না হলে কি হবে ভাই, সবার মনে তুমি আসন পাকা করে নিয়েছ। বিশেষ করে নতুন সেক্রেটারির হৃদয়ে।

অন্যদিন হলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু আজ আর রমলা একটুও রাগ করতে পারল না। আগে যে ভয়টা মুখোমুখি থাবা মেলে দাঁড়িয়েছিল, সে ভয়টা এখন শুধু অলীক দুঃস্বপ্ন। রাত কাটলেই, ঘোর কেটে যাবে। এখন এ নিয়ে পরিহাস করা চলে।

কিন্তু মেয়েরা কোন কথা শুনল না। শিক্ষিকারাও নয়। ছোটখাটো একটা বিদায়-সভার আয়োজন হল। মেয়েরা মালা গাঁথল, রমলার গলায় পরাল। গানও গাইল। সুলতা আর একজন শিক্ষিকা মামুলী বক্তৃতা দিল। অনেক ভেবেচিন্তে, থেমে থেমে রমলা একটা উত্তরও দিল। বিদায় কথাটার মধ্যেই বোধ হয় ব্যথার একটা রেশ লুকানো থাকে, তাই বলতে উঠে রমলার দুটো চোখ জলে ভরে এল।

সব শেষ হল। সামান্য একটু জলযোগেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। সবই হল, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আদিত্যবাবুকে ধারে-কাছে কোথাও দেখা গেল না। মিটিংয়ে তো আসেনইনি, নিজের অফিস-রুমেও নেই।

আবার নতুন জীবন শুরু হল রমলার।

ইউনিক ইণ্ডাস্ট্রিজ যত বড় রমলা ভেবেছিল, গিয়ে দেখল তার চেয়েও অনেক বড়। প্রচুর কেরানী, তার মধ্যে মেয়ের সংখ্যাও বড় কম নয়।

রেবা রমলাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।

রমলার ধারণা ছিল, পদবীটা যেমন জমকালো, মানুষটাও তেমনি রাশভারি হবে। কিন্তু চেম্বারে ঢুকে তার ভুল ভাঙল।

বয়স বছর পঁয়ত্রিশের এক সুশ্রী ভদ্রলোক। মিতবাক্, মার্জিত-রুচি। হাত তুলে রমলাকে নমস্কার করলেন।

রমলা সামনের চেয়ারে বসতে বললেন, রেবার কাছে আপনার সব কথা শুনেছি। তা ছাড়া আপনার বাবা ব্যারিস্টার রাজীব রায়ের সঙ্গে আলাপ হবারও একটা সুযোগ আমার হয়েছিল। আমাদের একটা কেস নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। কেসটা অবশ্য আমরা জিততে পারি নি, সেটা জেতবার কেসও ছিল না, কিন্তু মিস্টার রায় যেভাবে কেসটা কনডাক্ট করেছিলেন, তাতে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম।

রমলা কোন কথা বলল না। কাঁচ-ঢাকা টেবিলের ওপর হাত দুটো রেখে চুপচাপ বসে রইল।

উনি তো স্ট্রোকেই মারা যান, তাই না?

রমলা আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল।

Very sad, টেবিল থেকে পিন-কুশনটা তুলে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে মিস্টার সেন বললেন, আপনার পক্ষে তো খুবই sad loss. তা ছাড়া আপনি একটা ইম্পোস্টারের হাতে পড়েছিলেন, তাও শুনলাম।

ইম্পোস্টার?

জয়ন্ত ঘোষালকে আর কি বলা যায় বলুন? এভাবে একটা

জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন অধিকার তার নেই। অন্য লোক হলে জয়ন্ত ঘোষালকে সহজে ছেড়ে দিত না।

রমলা মাথা নীচু করে রইল। এসব কথা, এত কথা কেন বলতে গেল রেবা। যে ক্ষতটা বুকের নিভৃতে রমলা লালন করছে, তাকে এভাবে খোঁচা দেওয়ার কি প্রয়োজন! এসব এখন অতীত কাহিনী। পলিমাটি পড়ে পড়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। জয়ন্ত বলে কেউ কোনদিন রমলার জীবনে আসে নি, এটাই সে অবসর মুহূর্তে মনকে বোঝাতে চেয়েছে।

মাপ করবেন, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের কথা নিয়ে আলোচনা করাতে আপনি হয়তো বিব্রত হচ্ছেন। আমিও হয়তো আমার নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এসব ভাবলেও আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

চেয়ার ঘুরিয়ে মিস্টাব সেন কিছুক্ষণ বাইবের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর ফিবে বললেন, রেবা, তুমি মিস রয়কে তাঁর সীটটা দেখিয়ে দাও, আর কাজগুলো বুঝিয়ে দাও। আচ্ছা নমস্কার, কোনরকম অসুবিধা হলে জানাতে ভুলবেন না।

রমলা দাঁড়িয়ে উঠল। রেবার পিছন পিছন বাইরে চলে এল, তারপর দুজনে কাঁচ-ঢাকা পার্টিশনের এপাশে এসে দাঁড়াল।

এদিকটা প্রমীলাব রাজত্ব। অনেকগুলো মেয়ে এখানে ওখানে বসে রয়েছে। তাদের সাজপোশাক, প্রসাধনের মাত্রা দেখে মনে হয় মাইনেপত্র ভালই পায়।

রেবা একটা চেয়ারে বসে পড়ে, পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, এই তোর সীট। দশটা পাঁচটা ডিউটি। তুই তো আর স্টেনোগ্রাফার নোস, কাজেই যখন-তখন আমার মতন তোকে কর্তার বাড়ি ছুটতে হবে না।

রমলা চেয়ারে বসতে রেবা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, তারপর বস্‌কে কেমন লাগল বল?

রেবার কথার ধরনে রমলা একটু যেন বিস্মিত হল। চাকরি করতে এসেছে রমলা। পরিশ্রমের বদলে অর্থ নেবে। সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের। একটু শুধু মার্জিত ধরনের। কেমন লাগল সে প্রশ্ন অবান্তর।

তবু রমলা উত্তর দিল, কেন, ভালই তো লাগল। খুব ভদ্র।

আর দেখতে?

এবার রমলা ভ্রূ কুঞ্চিত করল, দেখতেও ভাল।

শুধু ভাল কি রে, বল, বেশ ভাল। বল, কন্দর্পকান্তি। তোর জয়ন্ত ঘোষালের চেয়ে অনেক ভাল।

দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে রমলা বিরক্তি চাপল, তারপর রেবার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, বেশ, তাই বললে যদি তুই সুখী হোস, তো তাই।

আমার আর সুখী অসুখী কি ভাই। আমার তো গায়ের রং কটা নয়, নাক-মুখ-চোখেরও বাহার নেই। রেবার গলায় যেন অভিমানের সুর।

রমলা প্রসঙ্গ বদলাল, ঠিক আছে, তোর দুঃখের কথা ছুটির পরে শুনব, এখন আমায় কি কাজ করতে হবে বলে দে।

কাজ তো সারাজীবনই করবি, এখনই এত ব্যস্ত কেন। প্রথম দিনটা একটু বিশ্রাম নে। কোথায় উঠেছিস বল। বললি যে আমার সঙ্গে থাকবি?

তোর ঠিকানা কি জানি যে তোর ওখানে উঠব। এখন ওয়াই. ডবলু. সি এ-তে উঠেছি।

ঠিক আছে, বিকেলে দুজনে একসঙ্গে বেরোব। ওয়াই.-ডবলু. সি.এ. থেকে তোর মালপত্র নিয়ে আমার ওখানে উঠব।

রমলা রাজী হল, তবু হেসে বলল, তোর আবার কোন অসুবিধে হবে না তো?

রেবা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, অসুবিধা একটু হবে

বৈকি ভাই। আমার এত কষ্টে সংগ্রহ করা নাগরগুলো তোকে দেখলে কি আর আমার কাছে আসবে!

রেবা আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারল না। বেয়ারা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বড়সায়েব সেলাম দিয়েছেন। খাতা নিয়ে যেতে হবে।

নিরিবিলি মনের কথা কি বলবার জো আছে। রেবা খাতা পেন্সিল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেয়ারার পিছন পিছন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বাবে গিয়ে ঢুকল।

রেবা উঠে যেতেই মৌচাকে যেন ঢিল পড়ল। চারদিকে কলগুঞ্জন। মেয়েরা মুখর হল। দু-একজন সাহস করে এগিয়েও এল রমলাব টেবিলের কাছে।

আজ থেকে জয়েন করলেন বুঝি?

রমলা ঘাড় নাড়ল।

ভাল অফিস। কর্তাদের মন যুগিয়ে চলতে পারলে উন্নতি অবধারিত।

দু-একজন মেয়ের হাসির ধরনটা রমলার ভাল লাগল না। সম্ভবত একেবারে খোদ বড়কর্তার মারফত অফিসে ঢুকেছে, ঈর্ষার কারণ তাই।

বমলা কোন উত্তর দিল না। কেবল হাসল।

রেবার সঙ্গে এক কলেজে আপনি পড়তেন, রেবা বলছিল।

হ্যাঁ।

তা হলে তো আপনার চাকরির নৌকা তরতর করে এগিয়ে যাবে। কোন চড়ায় ঠেকবার ভয় নেই। কেবল শক্তহাতে হালটা ধরে থাকুন। একটা মেয়ে হাসতে হাসতে বলল।

দূর থেকে রমলা দেখতে পেল, জেলারের সঙ্গে একজন লেডি-ডাক্তারও আসছেন। তার মানে রমলাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হবে। শরীরের খুঁটিনাটি সব।

এই শরীরের কি যত্ন! প্রত্যেকদিন নিয়ম করে স্নান, রোজ একবার করে ডাক্তারী পরীক্ষা। শরীর-যন্ত্রের কোথাও যেন একটু গলদ না থাকে। অথচ আর কটা দিন, তারপর এই শরীরের চিহ্নটুকুও কোথাও থাকবে না। দেহলোভী পৃথিবীর হায়নাগুলো হাজার চেষ্টা করলেও ছিনিমিনি খেলার জন্য মাংসের একটি টুকরোও পাবে না।

এ দেহে আর বুঝি কারো প্রয়োজন নেই, আর প্রয়োজন নেই বলেই তার এত তরিবৎ, এত পরিচর্যা।

দেহ আর মন এই নিয়েই তো মানুষ। দেহ গলিত হলে, দশজনের উপভোগ্য হলে, মনও কি বিষাক্ত হয়ে যায়? দেহ আধার, মন আধেয়। একটা দূষিত হলে, আর একটাও কি নষ্ট হয়?

জীবনের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি, রমলার এই যে বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী, নির্জীব কটাক্ষ, আসক্তিহীন ব্যবহার, এর মূল কি? এই নিস্পৃহতার কোথায় উৎস?

বাইরের পৃথিবী থেকে হিমশীতল কারাকক্ষে রমলার এই যে অবতরণ এ কি একদিনে সম্ভব! একটা অপরাধের জন্য! তিল তিল করে বহুদিন ধরে তার দেহ তার মন তৈরি হচ্ছিল এই নরকভোগের জন্য। মানুষের ঘৃণা, মানুষের অবিশ্বাস, মানুষের পাশবিকতা অঞ্জলি ভরে সারাটা জীবন রমলা সংগ্রহ করেছে। সেই পঙ্কিলতার বিষে নীলাভ হয়েছে দেহ, হৃদয় পাষাণ। বিবেক-বর্জিত, সুকুমার বৃত্তি নিশ্চিহ্ন, বন্ধুর কণ্টক-জর্জর পৃথিবীর পথের ওপর দিয়ে নিজের দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আদালতের এক প্রহসনের মধ্যে দিয়ে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে অস্থি আর মাংসের স্তূপটা। এবার প্রতীক্ষা। দেহের মৃত্তিকা মৃত্যুর মহান স্পর্শে কাঞ্চন হয়ে উঠবে।

আমদানী-রপ্তানীর অফিস। মাঝে মাঝে সায়েব-সুবোর আসা-যাওয়া। সেই উপলক্ষ্যে পার্টির আয়োজনও হয়। মিস্টার সেনের আদেশে রমলা হাজির থাকে পার্টিতে। অতিথি-অভ্যাগতের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখতে হয়। রেবাও থাকে। আরো দু-একজন মেয়ে।

পার্টির শেষে মিস্টার সেন গাড়ী করে মেয়েদের বাড়ি পৌঁছে দেন।

এমনি এক পার্টির শেষে রেবা আর রমলাকে নামিয়ে দিয়ে মিস্টার সেন চলে যেতে, রমলার খেয়াল হল। রেবা বাড়ির দেয়াল ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

একটু এগিয়ে রমলা দাঁড়িয়ে পড়ল, কি রে, থামলি কেন? রাত অনেক হয়েছে। ওপরে উঠবি তো।

রেবা নিরুত্তর।

কাছে গিয়েই রমলা নিঃসন্দেহ হল। বাতাসে সুরার গন্ধ। রেবা প্রকৃতিস্থ নেই। মোটরে আসবার সময় রেবা মিস্টার সেনের পাশে বসে ছিল। রমলা পিছনে। কাজেই কিছু টের পায় নি।

একি রে?

মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে ক্লান্ত দুটি চোখ মেলে রেবা চাইল। কোন উত্তর দিল না।

শক্তহাতে রমলা রেবার একটা হাত চেপে ধরল, তারপর তাকে টানতে টানতে ওপরে নিয়ে গেল। একটা হাত দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে, দরজার তালাটা খুলে রেবাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে রমলা বাতি জ্বালল।

শাড়ীটা খসে পড়েছে। এলোমেলো চুলের রাশ। রক্তাভ দুটি চোখ। রেবা চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে চুপচাপ বসে রইল।

রমলা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, নিজে যেতে পারবি বাথরুমে, না ধরে নিয়ে যাব?

রেবা হাসল, বিড়বিড় করে বলল, আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু, পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।

আশ্চর্য লাগল রমলার। পার্টির সময় অতটা খেয়াল করে নি। অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল। রেবাকেও ধারে-কাছে দেখেনি। পার্টি শেষ হতে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে যখন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, দেখেছে রেবা মোটরে বসে ঢুলছে। রাত অনেক হয়েছে বলে আর কথাবার্তা বলে নি। মিস্টার সেন আসতেই মোটরে এসে উঠেছে।

এর মধ্যে রেবা কখন আকণ্ঠ সুরা পান করেছে রমলার জানবার কথা নয়।

রেবাকে টানতে টানতে রমলা বাথরুমে নিয়ে গেল। রেবার পরনের শাড়ী খুলে পিছনে পড়ে রইল। ব্লাউজের অনেকগুলো বোতাম পট পট করে ছিঁড়ে গেল। রমলা কোন দিকে দেখল না। রেবার মাথাটা কলের নীচে চেপে ধরে কল খুলে দিল।

মাথা মুছিয়ে রেবাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রমলা পাশে শুল। প্রায় সারাটা রাত রেবা আবোল-তাবোল কথা বলল।

রমলাকে জড়িয়ে ধরে ইংরাজী গানের কলি গাইল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাদের যৌবন বৃথাই গেল সখি। মথুরা থেকে বনমালী আর বৃন্দাবনে এল না। নিজের অন্তরের ব্যথা অন্তরে চেপে এভাবেই জীবন কাটাতে হবে।

ভোরের দিকে রেবা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমাক। তাকে রমলা ডাকল না। রবিবার। অফিস যাবার বালাই নেই। রেবা বিশ্রাম করুক।

রেবা যখন উঠল, তখন রমলা স্নান শেষ করে খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে বেতের চেয়ারে বসেছিল।

রেবা রমলাকে আড়চোখে দেখে পাশ কাটাচ্ছিল, রমলা বুঝতে পেরে ডাকল, রেবা।

মাথা নীচু করে রেবা এসে একটু দূরে দাঁড়াল।

কালকেই প্রথম, না অভ্যাসটা অনেকদিনের?

রেবা কোন উত্তর দিল না।

কি রে, শুনতে পাচ্ছিস না?

আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে রেবা সামনের চেয়ারে বসল। মাথা নীচু করেই বলল, কালকের মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল।

তাহলে অভ্যাসটা পুরোনো?

রেবা চুপ।

নীতিকথা তোকে আমি শোনাবো না, সে স্পর্ধা আমার নেই, কিন্তু একটা কথা বলব, এই রাজকীয় অভ্যাসটা ছাড়তে পারলেই মঙ্গল, কারণ যে চাকরি আমরা করি, তাতে এ বিলাসিতা আমাদের সাজে না।

এতক্ষণ পরে রেবা মাথা তুলল। সোজাসুজি চাইল রমলার দিকে। বলল, জীবনটাকে উপভোগ করতে বাধাটা কিসের? জন্ম এমন মধ্যবিত্ত বংশে যেখানে ভাত ডাল ছাড়া আর বাড়তি কিছু চাওয়াই বিলাসিতার নামান্তর। বাবা বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে মারাই গেলেন। যে কটা পাত্র এল সবার হাতেই যৌতুকের ধারালো অস্ত্র। রূপহীনা বাঙালীর ঘরের মেয়ে বাধা-নিষেধের কাঁটাতারের মধ্যে মানুষ হতে লাগলাম। চারিদিকে হিতৈষীদের রক্তচক্ষু, কড়া পাহারা। সব বাঁধন ছিঁড়ে যখন সাবালিকা হলাম, তখন দেখলাম গ্রহণ করার হাত অনেক। তারা শুধু রক্তমাংসের দেহটাকে চায়। মনকে নয়। শকুনি-গৃধিনীর দল। সবকিছুর ওপর বিতৃষ্ণা এল। ভাবলাম, বেপরোয়া হয়ে যাই, একেবারে উচ্ছৃঙ্খল। ভয়েরও উর্ধ্বে উঠে যাই। দোহাই রমলা, তুই আর ভট্চাজ-মশাইয়ের মতন নীতিকথা শোনাস নি।

রমলা চেয়ে রইল। বোঝা গেল রেবার এখনও নেশার ঘোর কাটে নি। তবে সবটাই যে নেশার কথা, এমনও মনে হল না।

আজ এসব কথা মনে হলে রমলার হাসি পায়। রেবার মধ্যেই কি রমলার ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি ফুটে ওঠেনি! মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে নয় রমলা, তার বাপের সামর্থ্যেরও অভাব ছিল না। কিন্তু প্রথম যৌবনে যে আঘাত পেয়েছে, তাতেই ছিন্নমূল লতার মতন অবস্থা। পৃথিবীর সব রং বিবর্ণ, সব কিছু বিস্বাদ হয়ে এসেছে। এই তিক্ততাই মানুষের জীবনে অবসাদ আনে। শুধু দুঃখ ভোলার জন্য, বিস্মৃতির জন্য মানুষ আসবের শরণাপন্ন হয়।

রেবাও বোধহয় মানসিক যন্ত্রণা ভোলার জন্যই পানপাত্র মুখে তুলেছিল।

হাতের খবরের কাগজটা সরিয়ে রেখে রমলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বাড়ির পর বাড়ি। আকাশ দেখা যায় না, কেবল অট্টালিকার সার। এ তো শুধু শহরের বাইরের পরিচয়। কত সুখ, কত দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা এইসব অট্টালিকার অন্তরালে বাসা বেঁধেছে। কত অস্ফুট কামনা, বাসনা। বাইরে থেকে সাজপোশাকে আর মানুষকে কতটুকু চেনা যায়। রেবাকে দেখেও কি বোঝা যায় এত বড় ব্যথা সে অন্তরে গোপন করে রেখেছে।

দুপুরের দিকে রেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হল। পাশাপাশি খেতে বসল রমলার সঙ্গে।

সুযোগ পেয়ে রমলা বলল, এভাবে জীবনটাকে অপচয় করে লাভ কি বল?

জীবনটাকে অপচয়? ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়েও রেবা নামিয়ে রাখল, তোর সঙ্গে আমার মতে মিলবে না রমলা। সর্বস্ব একজনকে উজাড় করে দিয়ে সন্ন্যাসিনী সাজতে আমি পারব না। বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়। আমি জীবনটা উপভোগ করব। মনের মানুষ না জোটাতে পারি, আনন্দের সহচর যোগাড় করব। প্রতি মুহূর্তে বাঁচব।

তোর জীবন উপভোগের ধারণাটা তো চমৎকার। মদ খেয়ে

হৈ-হৈ করে বেড়ালেই জীবন উপভোগ করা হয় বুঝি? রমলার গলা ব্যঙ্গে ক্ষুরধার হয়ে উঠল।

তা নয় তো কি, তোর মতন নিজেকে বঞ্চনা করে, নিজের সঙ্গে প্রতারণা করে মুখ গুঁজে পড়ে থাকলে বুঝি জীবন ভোগ করা হয়? দোহাই তোর, বেদ-উপনিষদের কথা আওড়াস নি। ওতে মন ভরবে না। ঋষিদের যখন পদস্খলন হত, তখনই মনে হত তারা স্বাভাবিক। নয়তো কেবল মস্তিষ্ক-সর্বস্ব বুদ্ধির জট।

তোর কি হয়েছে বল তো?

কি হবে?

কাল থেকে জীবন সম্বন্ধে কেমন একটু বেহিসেবী হয়ে পড়েছিস।

কাল থেকে নয়, কিছুদিন থেকেই ভাবছি। এই যে সব বিদেশীরা আসে। কেমন জীবন বল তো? বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই, নীতিবাদের ধার দিয়েও যায় না। যে কটা দিন এদেশে থাকে, ব্রহ্মচর্য যে পালন করে না, সেটা তো বুঝতেই পারি। অথচ ব্যবসায়ে এক এক জন ধুরন্ধর। ছেলেবেলা থেকে নিষেধ-নীতির মধ্যে বেড়ে ওঠে নি বলেই, আজ এভাবে গড়ে উঠতে পেরেছে। সময়ে সময়ে বিশৃঙ্খল হওয়াও প্রয়োজন। নিয়মকানুনের বদ্ধ জলায় মশা-ই জন্মায়, প্রজাপতি হয় না।

ঠিক আছে, একটা বিয়ে কর, করে উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, যা ইচ্ছা হ'। আমি এভাবে তোকে টেনে হিঁচড়ে সিঁড়ি দিয়ে তুলতেও পারব না, সেবাও করতে পারব না।

রেবা হাসল, বিয়ে? আজকালকার ছেলেদের মতলব জানিস না। আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর। মালঞ্চ শুকিয়ে গেলেই প্রেমও শেষ। এরা সব মধুকরের জাত। নর্মসহচর, জীবনের কেউ নয়।

পরের দিনই মিস্টার সেনের রুমে রমলার ডাক পড়ল। রেবা পাশেই বসে ছিল। সাহস দিয়ে বলল, ভয় কি রে, চলে যা সোজা।

মিস্টার সেন প্যাণ্টের পকেটে দুহাত ঢুকিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিলেন, সুইং-ডোরের শব্দে ঘুরে দাঁড়ালেন।

আমায় ডেকেছেন?

বসুন, মিস রয়। কথা আছে।

রমলা চেয়ার সরিয়ে বসল।

নিজের চেয়ারে মিস্টার সেনও বসলেন।

সামনের শনিবার বাইরে যেতে হবে আপনাকে। অফিসের কাজে আমি লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। দরকারী ফাইলপত্র আপনার কাছে থাকবে। ওখানে একটা ফার্মের সঙ্গে আমাদের কথা চলছে। যদি পাকাপাকি চুক্তি একটা হয়ে যায়, তবে ওখানেই সই-টই সব করে আসতে হবে। এখনও দেরি আছে। আপনি তৈরি থাকবেন। ঠিক কটার গাড়ীতে যাব, আপনাকে পরে জানাব।

ঘাড় নেড়ে রমলা বাইরে চলে এল। চাকরি যখন করতে হবে, তখন 'না' বললে চলবে কেন। তা ছাড়া দেশে-বিদেশে কোম্পানির খরচে ঘুরে বেড়ানোও তো মন্দ নয়।

রেবাকে কথাটা বলতেই সে হেসে বলল, Wish you best of luck.

তার মানে?

মানে, এই অল্পদিনেই তো কর্তার বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছ। আগে এসব কাজে আমি যেতাম, কিংবা যমুনা নন্দী। যমুনা নন্দী এই অফিসেরই এক কেরানীকে বিয়ে করে চাকরি ছাড়ল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। আমার বিদ্যা ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত, কাজেই বড় কাজে, যেখানে ইংরেজী বিদ্যার প্রয়োজন বেশী, সেখানে আমি অচল। তাই তোমার আবির্ভাব।

কিন্তু কি করতে হয় বল তো রেবা, আমি তো কিছুই জানি না।

কিছু জানবার নেই। মিস্টার সেন সঙ্গে থাকবেন, সব কিছু নির্দেশ তিনিই দেবেন। তোকে শুধু মুখটা হাসি-হাসি করে অতিথি আপ্যায়ন করতে হবে। কর্তাকে যদি খুশী করতে পারিস, বরাত খুলে যাবে এটুকু বলতে পারি।

শনিবার সন্ধ্যার মুখে রমলাব বাড়ির সামনে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের গাড়ী এসে দাঁড়াল।

রমলা তৈরিই ছিল। অনেকদিন পরে সযত্নে রমলা প্রসাধন সেরেছে। রেবা যথাসাধ্য সাহায্য করেছে তাকে। রমলা সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় রেবা বলল, আমার ভাই উলু দিতে ইচ্ছা করছে।

কি অসভ্যতা করিস? অমন করলে আমি যাব না তা বলে দিচ্ছি।

রেবা আর কিছু বলল না। চুপচাপ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

মিস্টার সেন নিজে হুইল ধরেছেন। পাশে ড্রাইভার। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গাড়ী ফেরত নিয়ে আসবে। সুটকেস হাতে নিয়ে রমলা নামতেই ড্রাইভার তার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে লগেজ-কেরিয়রে রেখে দিল।

স্টেশনে নেমে মিস্টার সেন একটা টিকেট বের করে রমলার হাতে দিয়ে বললেন, আপনি লেডিজ সেকেণ্ড ক্লাসে চলে যান। কোন অসুবিধা নেই। সীট রিজার্ভ করা আছে। কাল লক্ষ্ণৌ স্টেশনে আমি আপনাকে নামিয়ে নেব।

সারাটা রাত রমলা ঘুমোতে পারল না। ট্রেনে তার একটুও ঘুম হয় না। অবশ্য ট্রেনে যে সে খুব বেড়িয়েছে, এমন নয়।

ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে একবার দার্জিলিং গিয়েছিল, আর একবার ওয়ালটেয়ার। তা ছাড়া চাকরি করতে আসানসোল গিয়েছে, কিন্তু ট্রেনে রাত কাটাতে হয় নি।

মিস্টার সেন নিজে পরের দিন তদারক করলেন সারাটা পথ। বেড-টি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রমলাকে খাওয়ালেন। বললেন, আমার কাছে কোন ফর্মালিটি নেই মিস রয়। আমি কাজ চাই। মানুষকে অভুক্ত, অসুখী রেখে কাজ আদায় করা যায় না, তা আমি খুব জানি। কটা দিন হয়তো একটু খাটুনি হবে, but I hope you won't mind it.

রমলা উত্তরে শুধু হাসল।

সেণ্ট্রাল হোটেলে পাশাপাশি দুটি কামরা নেওয়া হল। মিস্টার সেনের কামরাটা মাপে একটু বড়। আসবাবপত্রও বেশী।

খাওয়াদাওয়া সারতে প্রায় বিকাল। মিস্টার সেন বললেন, গোকুলজী কাল সকালে আসবেন, কাজের কথা বলতে। আজ আমাদের ছুটি। চলুন গোমতীর ধারটা একটু ঘুরে আসি। ও জায়গাটা আমার ভারি প্রিয়। আমি এলেই ওখানে গিয়ে বসি।

রমলা মিস্টার সেনের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখল। না, সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না। কোন অভিসন্ধির ছাপ নয়। নিছক বেড়াতে যাবার প্রস্তাব। সুলতা ঠিকই বলেছিল, পুরুষ-জাতটার ওপরেই রমলার কেমন একটা সন্দেহ জেগেছে। রাঙা মেঘ দেখলেই চমকে ওঠে।

রমলা রাজী হল।

মিস্টার সেন হাসলেন, হোটেলের বেয়ারাকে একটা টাঙ্গা আনতে পাঠিয়েছি। মোটর নয়। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। লক্ষ্ণৌতে এসে টাঙ্গাই চড়া উচিত, কি বলেন?

রমলা হাসল। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথায় লঘুতার রেশ।

টাঙ্গা এল। দুজনে চড়ে বসল। লালবাগ রোড ধরে,

হজরতগঞ্জ পার হয়ে টাঙ্গা বাঁ দিকে ঘুরল। ছত্রমঞ্জীল, তারপরই শীর্ণকায়া গোমতী।

টাঙ্গা থামিয়ে মিস্টার সেন নেমে পড়লেন। শাড়ী বাঁচিয়ে রমলা সাবধানে নামল।

আকাশে চাঁদের টুকরো। গোমতীর জলে হাজার টুকরো। চারদিকে অন্ধকার নেমেছে। দিনের কোলাহল স্তিমিত।

মিস্টার সেন একটা রুমাল বিছিয়ে গাছের তলায় বসলেন। ইঙ্গিতে রমলাকেও বসতে বললেন।

কিন্তু রমলার সাড়া নেই। একদৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকদিন আগের এমনি এক রাত্রির কথা তার মনে পড়ে গেছে। আর এক নদীর কূলে, আর একজন পুরুষের সান্নিধ্য। সেদিনই জয়ন্ত প্রতিজ্ঞা করেছিল, ফিরে এসে রমলাকে গ্রহণ করবে। পবিত্র এক বন্ধনে বাঁধা পড়বে দুজনে। জয়ন্তর সেই প্রতিশ্রুতি শুনে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ বুঝি শিউরে উঠেছিল, উদ্দাম হয়ে উঠেছিল স্রোতধারা। চাঁদও নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল ক্ষণেকের জন্য, আনন্দে আত্মহারা রমলা খেয়াল করে নি।

কি হল, বসুন। মিস্টার সেন আর একটু গলা চড়ালেন।

রমলা ঘাড় ফিরিয়ে বলল, বসছি। চাঁদের আলোয় নদীর স্রোতগুলো কেমন রুপোলী হয়ে যায় দেখেছেন।

একটু দূরে ঘাসের ওপর রমলা বসল।

রুপোলী না হয়ে, খাঁটি রুপো হলে, আরো খুশী হতাম, মিস্টার সেন হেসে উঠলেন, তা হলে নদীটা লিজ নিয়ে একটা কোম্পানি খুলে ফেলতাম, Silver Corporation নাম দিয়ে।

রমলাও হাসল।

এই জায়গাটা আমার ভারি ভাল লাগে, বিশেষ করে

কলকাতার কোলাহল থেকে এসে এ নির্জনতা খুব উপভোগ্য। এখানে মানুষ যেন নিজেকে খুঁজে পায়।

খুঁজে আর কোথায় পায়, এবার রমলা ব্যঙ্গের শায়ক ছাড়ল, আপনি তো রুপোর সন্ধানে রয়েছেন।

মিস্টার সেন সশব্দে হেসে উঠলেন। গাছের ডালে কতকগুলো টিয়া বসে ছিল, তারা চীৎকার করে উড়ে গেল।

কিছুক্ষণ কোন কথা হল না। আসবার সময়ে মিস্টার সেনের সম্বন্ধে রমলা ভুল ধারণা করেছিল ভেবে নিজেই লজ্জিত হল। মিস্টার সেন কোন অন্যায় সুযোগ নেবার সামান্য চেষ্টাও করছেন না। নিজের মনে বসে আছেন গোমতীর জলের দিকে চেয়ে। কোথাও কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শুধু টাঙ্গার ঘোড়ার অস্থির পা ঠোকার শব্দ ভেসে আসছে।

কথা বলতে গিয়েও রমলা পারল না। এ নীরবতা ভঙ্গ করা বুঝি পাপ।

একটু পরে মিস্টার সেনই বললেন, চলুন, ফেরা যাক। নাকি, কিছুক্ষণ বসবেন এখানে?

রমলা উঠে দাঁড়াল। বলল, না, চলি। নতুন জায়গা, তা ছাড়া চারদিক বড্ড নির্জন। বড় গা ছমছম করে।

মিস্টার সেন কিছু বললেন না। এগিয়ে এসে টাঙ্গার কাছে দাঁড়ালেন। রমলা উঠতে তিনিও উঠে তার মুখোমুখি বসলেন।

সে রাতে রমলা অনেকক্ষণ নিজের বিছানায় ছটফট করল। ঘুম এল না। সারাটা জীবন তো এভাবে চলবে না। কি করবে রমলা। একজনকে আশ্রয় না করে সে বাঁচতে পারবে না। জয়ন্তর যে পরিচয় সে পেয়েছে, তারপর তার মতন একজন প্রবঞ্চকের স্মৃতি সম্বল করে জীবন কাটানো যায় না। নিজের জন্য কি করবে রমলা। চিরদিন এইভাবে অফিস করে নিজের

যৌবন অপচিত করবে, তাও তো সম্ভব নয়। পথে-ঘাটে যেসব বয়স্কা কুমারীদের চোখে পড়ে, মাথায় কাঁচা-পাকা চুলের রাশ, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, ফাইল-সর্বস্ব জীবন। রমলাও তো একদিন তাদেরই সগোত্র হয়ে দাঁড়াবে। ফাইল, ইনক্রিমেণ্ট, অফিস-রাজনীতিব বাইরে তার অস্তিত্ব থাকবে না।

জয়ন্তর পর এসেছিল শান্তনু। ঠিক আসে নি, জীবনের পথে শুধু দেখা হয়ে গিয়েছিল এই মাত্র। তাকে রমলার ভাল লাগে নি। যে কোন আধুনিক মনেরই বোধ হয় এমন এক প্রাচীন-পন্থীকে ভাল লাগতে পারে না। কিন্তু একথা রমলা কখনই অস্বীকার করতে পারবে না, শান্তনুর ব্যক্তিত্ব তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। বিশেষ করে জয়ন্তর এই পলায়নী মনোবৃত্তির পটভূমিকায়।

লেডি-ডাক্তার এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন রমলার মুখোমুখি। হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, কেমন আছেন?

এই একটি প্রশ্নে রমলার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে যায়। মনে হয় সবাই ব্যঙ্গ করছে তাকে। ঘৃণা করছে। কেমন আছেন নয়, কেন আছেন? এই ঘৃণিত দেহ আর পঙ্কিল মন নিয়ে কেন এখনও রয়েছেন মনুষ্যসমাজে? আপনাকে অপসারিত করে দেবার নির্দেশ এসেছে। সমাজের কল্যাণের জন্য, মানবের কল্যাণের জন্য আপনাকে মুছে ফেলা প্রয়োজন, তাই বাঁচবার, ভাল থাকবার আপনার কোন এক্তিয়ার নেই।

রমলা কোন উত্তর দিল না। ভ্রূ কুঞ্চিত করে লেডি-ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইল।

আপনাকে একটু পরীক্ষা করব। এদিকে আসুন। রমলাকে পাশের ছোট ঘরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন।

প্রথম প্রথম রমলা আপত্তি করত। এখন আর করে না।

করে লাভও নেই। পরনের কাপড় সরিয়ে ফেলে রমলা সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল।

এতটার প্রয়োজন ছিল না। লেডি-ডাক্তার আবরণের ফাঁক দিয়েই পরীক্ষা করতে পারতেন। পরীক্ষা শেষ হতে রমলা কাপড়টা অঙ্গে জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

ভালই তো আছেন। বেশ ভাল।

এইটুকু ভাল থাকারই প্রয়োজন ছিল। অসুস্থ শরীর নিয়ে ফাঁসির রজ্জু বুঝি গলায় পরা যায় না। আইনগত আপত্তি আছে। একেবারে বহাল তবিয়তে ফাঁসির মঞ্চে উঠতে হয়। যাতে কেউ কখনও না অভিযোগ করতে পারে, উদ্বন্ধন ছাড়া অন্য কিছুতে আসামীর মৃত্যু হয়েছে।

লেডি-ডাক্তার কিন্তু উঠে গেলেন না। রমলার সামনে বসলেন।

কাউকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে আপনার? আপনজন কাউকে?

আপনজন। সবাই তো আপনজন। যে জীবিকার সঙ্গে রমলা উত্তরজীবনে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, তাতে পর কেউ নেই। যে আসবে সেই আপন। সেই ভাবেই তাকে সম্বর্ধনা জানাতে হবে।

যারা রমলার সবচেয়ে প্রিয়জন হবার ভান করেছিল, রমলার জন্য ইজ্জত দৌলৎ সবকিছু বাঁধা দিয়েছিল, আজ তারা রমলার কেউ নয়। রমলার নাম শুনলে তারা শিউরে উঠবে। কাছে আসা তো দূরের কথা, সভয়ে এড়িয়ে যাবে।

তাদের কাউকে আর রমলার প্রয়োজন নেই। এখন রমলার শুধু প্রয়োজন অনন্ত সুষুপ্তি। সব জ্বালা, সব যন্ত্রণার অবসান।

পরের দিন সকালেই গোকুলজী এসে হাজির হলেন। মিস্টার সেনের কামরায় বৈঠক বসল। রমলা সঙ্গে রইল। বিরাট চিনির

কারখানা শুরু করবেন গোকুলজী। ফৈজাবাদে। তার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার জন্য মিস্টার সেন টেণ্ডার দিয়েছিলেন। শুধু কাগজ-পত্রে আজকালকার ব্যবসা হয় না, মুখোমুখি সাক্ষাতের দরকার। গোল-টেবিল বৈঠক। সুবিধা অসুবিধা নিয়ে সরাসরি আলোচনা।

গোকুলজী বিস্তারিত আলোচনা করলেন। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে রমলা চায়ের কাপ ধরল তাঁর মুখের সামনে। কেকের প্লেট। মনে হল তাতেই যেন কাজ হল বেশী। গোকুলজী মিস্টার সেনের কথায় রাজী হয়ে গেলেন। কি ভাবে টাকাটা দেওয়া হবে তারও একটা খসড়া হল। মিস্টার সেনের পরিচিত ইঞ্জিনীয়ার নিজে গিয়ে যন্ত্রপাতি বসাবার বন্দোবস্ত করবেন।

সমস্ত আলোচনাটা রমলা কাগজে কলমে লিখে নিল। দু-জনের দস্তখত সুদ্ধ। কলকাতায় অফিসে ফিরে গিয়ে টাইপ করে গোকুলজীকে একটা কপি পাঠিয়ে দেবে।

গোকুলজী ফিরলেন লাঞ্চ সেরে।

মিস্টার সেন খুব খুশী। রমলাকে ডেকে বললেন, মিস রয়, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। এ কাজটার জন্য অনেকদিন ধরে আমি চেষ্টা করছিলাম। গোকুলজীকে দু-একবার কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছি, কিন্তু ওঁর যাবার সুবিধা হয় নি। আপনি খুব পয়মন্ত মহিলা। আজ আপনি আমার সঙ্গে ডিনার খাবেন।

রমলা হাসল। বেশ, তাই হবে।

সারাটা দিন মিস্টার সেন আর কামরা থেকে বেরোলেন না। বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

রমলা হোটেলের বেয়ারাদের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে নিজেই চলে গেল মার্কেটিং-এ। জিনিসপত্র কিনে যখন হোটেলে ফিরল, তখনও মিস্টার সেনের কামরায় দরজা বন্ধ। একবার ভাবল দরজায় টোকা দেবে কিন্তু সেটা অশালীন হবে ভেবে নিরস্ত হল। চা খেয়ে একলাই লনে পায়চারি করতে লাগল।

রাত সাতটা নাগাদ মিস্টার সেন বাইরে বেরোলেন। সারা মুখ থমথম করছে। মনে হয় অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছেন।

ঠিক পৌনে আটটায় বেয়ারা এসে খবর দিল সায়েব ডাকছেন।

রমলা যত্ন করেই সেজেছিল। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে দেখতে দেখতে দীর্ঘশ্বাস রোধ করতে পারে নি।

মিস্টার সেনের কামরায় ঢুকেই রমলা অবাক। রীতি-মতো ডিনার। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে মরশুমী ফুল। ঝকঝক করছে প্লেট গ্লাস। কেবল ডিনার-স্যুটের বদলে মিস্টার সেন ধুতি পাঞ্জাবি পরেছেন। এই সাজে তাঁকে অপূর্ব দেখাচ্ছে।

মিস্টার সেন আবাহনের ভঙ্গীতে দুটো হাত প্রসারিত করে বললেন, আসুন, মিস রয়, সুস্বাগতম্।

রমলা হাসল, কি ব্যাপার? আপনি যে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেছেন।

ইউনিক ইণ্ডাস্ট্রিজ বিরাট নয়, এটাই বা আপনি ভাবলেন কি করে?

ডিনারের মাঝখানে মিস্টার সেন বললেন, আপনার একটু অনুমতি চাই মিস রয়।

রমলা বিস্মিত হল, তবু বলল, কিসের অনুমতি?

মিস্টার সেন উঠে দেয়াল-আলমারি খুলে একটা বোতল আর একটা গ্লাস বের করলেন। হেসে বললেন, আমি সুরাসক্ত নই, তবে বিশেষ উপলক্ষ্যে একটু মুখে না ঠেকিয়ে পারি না।

কি বলবে রমলা! বললেই বা তার কথা মিস্টার সেন শুনবেন এ মনে করার কোন হেতু নেই। তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, এ শুধু সাধারণ শিষ্টাচার।

রমলা কাঠ হয়ে বসল। বসেই দেখল দু-এক পেগ করে

রক্তাভ পানীয় মিস্টার সেন গলায় ঢালতে লাগলেন। একটু একটু করে তাঁর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। দুটি চোখ অর্ধনিমীলিত।

ওরই মধ্যে একবার রমলা বলল, আমি উঠি মিস্টার সেন।

বসুন বসুন। একটু soft drink করতে তো আপত্তি নেই।

বেয়ারাকে ডেকে তিনি লেমনেড আনতে বললেন। নিজে গ্লাসে ঢেলে রমলার হাতে তুলে দিলেন।

দাঁড়ান একটু। মিস্টার সেন নিজের গ্লাসের সঙ্গে রমলার গ্লাসটা ছোঁয়ালেন, বললেন, লং লিভ ইউনিক ইণ্ডাস্ট্রিজ।

বার তিনেক মিস্টার সেন রমলাকে লেমনেডের গ্লাস এগিয়ে দিলেন। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল রমলা। ভয় হচ্ছিল যদি মিস্টার সেন মত্ততা শুরু করেন, এই বিদেশ-বিভুঁয়ে, কি করে তাঁকে রমলা একলা সামলাবে।

একটু পরেই কেমন একটা ঘুম-ঘুম অবসাদে রমলা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। চোখের সামনে সব যেন অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট। বেয়ারা টেবিলের ওপর থেকে কাঁচের বাসনপত্র সরিয়ে নিয়ে গেল তার শব্দ ক্ষীণভাবে কানে এল। সামনে মিস্টার সেনের কাঠামো। বাতিগুলো ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে এল।

ঘোর যখন কাটল তখন বোধহয় রাত অনেক। কামরার মধ্যে নীল বাতির শান্ত দ্যুতি। রমলার পরনের শাড়ি মেঝেয় লুটোচ্ছে। ব্লাউজের বোতাম খোলা। অন্তর্বাস ছিন্ন। সারা শরীরে একটা যন্ত্রণার আমেজ।

বিছানার ওপর রমলা উঠে বসল। একটু একটু করে সব কিছু মনে করার চেষ্টা করল। সন্ধ্যা থেকে সব ঘটনা। কামরার মধ্যে আর কেউ নেই। দেখতে দেখতেই খেয়াল হল, এটা রমলার কামরা নয়, মিস্টার সেনের ঘর। তারপরই সবকিছু মনে পড়ল। দু হাতে মুখ ঢেকে রমলা কেঁদে উঠল।

তার সব গেছে। কুমারীজীবনের সর্বস্ব। এক প্রতারক ছলনা করে তার মন হরণ করেছিল, আর আজ আর এক প্রবঞ্চক আর এক ছলনার আশ্রয় নিয়ে তার দেহ কলুষিত করেছে।

কান্নার শব্দ হতেই বাইরের বারান্দা থেকে মিস্টার সেন ছুটে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। একেবারে বিছানায় রমলার পাশে বসে সান্ত্বনার সুরে বললেন, ছি, কেঁদো না, ভয় কি। আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম। তুমি আজ থেকে আমার।

এই কি গ্রহণ করার পদ্ধতি! একটা কুমারীর চরম সর্বনাশ করে তার অন্তর জয় করার একি অপচেষ্টা! কিন্তু আশ্চর্য, তেমন ভাবে রমলা প্রতিবাদ করতে পারল না। আধো অন্ধকারে এক মদ্যপায়ীর নিবিড় আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত হতে হতে সে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ল।

কেন এমন হল? কেন এমন হয়। তবে কি অবচেতন মনে মিস্টার সেনের প্রতি তার আকর্ষণ জন্মেছিল? প্রণয়ীর হাতে নিজের সর্বস্ব তুলে দেওয়ার মধ্যে যেমন কোন লজ্জা থাকে না, সঙ্কোচ নয়, তেমনই সব হারিয়েও সারা শরীর ঘিরে কেমন একটা ভাললাগার সুর বেজে উঠল। ক্লান্ত, অবসন্ন রমলা এতদিনে বুঝি একটা আশ্রয় খুঁজে পেল।

তারপর আরো ছুদিন রমলা লক্ষ্ণৌতে ছিল। প্রতি রাত্রে মিস্টার সেনের আমন্ত্রণে রমলা তাঁর কামরায় এসেছে। তাঁর শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে। প্রতি রাত্রে মিস্টার সেন আশ্বাস দিয়েছেন, কলকাতায় ফিরে একটা ভাল দিন দেখে ছুজনে মিলিত হবে। সামাজিক বন্ধনে।

মিস্টার সেনের বুকে মাথা রেখে রমলা স্বর্গসুখ অনুভব করেছে। তৃষিত হৃদয় অমরত্বের স্বাদ পেয়েছে।

মিস্টার সেন রমলাকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে সাবধান

করে দিয়ে গেছেন, তাদের এই গোপন মিলন, গোপন প্রতিশ্রুতির কথা কাউকে জানাবার দরকার নেই। তা হলে অফিসে নানা কথা উঠবে। একেবারে কাজ সেরে তবে জানালেই হবে।

রমলা কাউকে বলে নি। এমনকি রেবাকেও নয়।

রমলা ফিরতে রেবা চটুল হেসে তার আপাদমস্তকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলেছে, কি রে, খুব যেন খুশী-খুশী দেখাচ্ছে? 'বস্'-এর সঙ্গে খুব ট্যুর করে এলি?

রমলা আমল্ দেয় নি। বলেছে, খুশী হবো নাই বা কেন বল, কোম্পানি এমন একটা কন্ট্রাক্ট বাগালো, তাতে খুশী হবো না?

তুই নিজে কিছু বাগাস নি? রেবার বুঝি সন্দেহ গেল না।

তোর মুখ বড় আলগা রেবা। যা ইচ্ছা বলিস। মিস্টার সেনের মতন গম্ভীর লোক আমি জীবনে দেখি নি। কাজ ছাড়া একটি কথাও বলেন না।

রেবা আর কিছু বলল না।

শুরু হল একটানা জীবন। অফিস আর বাড়ি। বাড়ি আর অফিস। সবই ঠিক আগের মতন। শুধু মিস্টার সেন রমলাকে নিজের কামরায় ডাকলেই রমলার বুকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন শুরু হয়। কপালে ঘামের মুক্তো জমে।

কামরা নির্জন থাকলে মিস্টার সেন রমলার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরেন।

ভীরু কপোতীর মতন রমলার সারা দেহ থরথর করে কেঁপে ওঠে। এদিক ওদিক চেয়ে বলে, আঃ ছাড়ো, কে দেখে ফেলবে।

মিস্টার সেন হাত ছাড়েন না। অদ্ভুতভাবে হাসেন।

মাঝে মাঝে অবসর সময়ে রমলা ভাবতে বসে। সেদিন সেই গোমতীর ধারে, নির্জন পরিবেশে রমলাকে কাছে টেনে মিস্টার সেন কেন নিজের মনের গোপন ইচ্ছাটা জানালেন না। সেটাই

তো সব দিক থেকে সুষ্ঠু হত। সব দিক থেকে সমীচীন। কিন্তু তা না করে, এভাবে একটা কুমারীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তার দেহ উপভোগ করে, প্রণয়-নিবেদনের এ রীতি রমলা সমর্থন করতে পারে না। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও রমলা মিস্টার সেনের ওপর রাগ করতে পারে না। তার সুন্দর সুঠাম চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠলেই, ক্রোধের সমস্ত বহ্নিটুকু বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়, পরিবর্তে প্রেমের বর্ষণ নামে। মানুষটা ধীরে ধীরে একাত্ম হয়ে যায়।

মাসখানেক পর লজ্জার আগল সরিয়ে রমলা কথাটা জিজ্ঞাসা করল। অফিসের পরে কাজের ছুতো করে রমলা মিস্টার সেনের কামরায় ঢুকেছিল। মিস্টার সেন বসে বসে একলা ফাইল ওল্টাচ্ছিলেন।

রমলা মনে করিয়ে দিল, আর কতদিন ব্যাপারটা এমনভাবে লুকিয়ে রাখবে?

ফাইল সরিয়ে মিস্টার সেন হাসলেন, বড্ড মুশকিলে পড়েছি রমলা। আরো মাস পাঁচেক বোধ হয় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

মাস পাঁচেক?

হ্যাঁ, একটু মুশকিলে পড়ে গেছি।

মুশকিল! রমলা চেয়ারে বসে পড়ল। আবার কি হল। কিছুই বলা যায় না। পদে পদে বিড়ম্বিত হচ্ছে। ভাগ্যের ভ্রূকুটি মাথা তুলে তাকে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। যখনই সুখ-শান্তির সামান্য আভাস দেখা যাচ্ছে, তখনই অমঙ্গলের কালো মেঘ সব কিছু আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

মানে, শুনলে হয়তো তুমি হাসবে। মিস্টার সেন নিজেই হাসতে শুরু করলেন।

কথাটা কি বল না। রমলা একটু অধৈর্য হয়ে উঠল।

মাস পাঁচেকের মধ্যে আমার বুঝি কি একটা ফাঁড়া আছে, কাজেই এর মধ্যে কোন শুভ কাজ করাটা উচিত হবে না। বিয়ে তো নয়ই। অন্য কেউ একথা বললে, বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু রাঘবাচার্য নিজে গণনা করে দেখেছেন।

তুমি এসব মানো?

রমলা আশ্চর্য হল। যে পরিবেশে রমলা মানুষ, সেখানে গ্রহনক্ষত্রের আনাগোনা কম। তান্ত্রিক, জ্যোতিষীরা তো একেবারেই অনুপস্থিত। রাজীব রায় পুরুষকার মানতেন। বলতেন, ভাগ্যের ঘাড়ে দোষ চাপায় ভীরুরা।

বললাম, যে, আর কেউ বললে মানতাম না, কিন্তু রাঘবাচার্যের গণনা অমান্য করার সাহস আমার নেই।

এরপর আর কিছু বলা চলে না। রমলা কিছু বললও না, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

মিস্টার সেনও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, কি হল, অভিমান নাকি?

না, অভিমান আর কি।

লক্ষ্মীটি, আর পাঁচটা মাস অপেক্ষা কর। রাঘবাচার্যের বিরুদ্ধে যেতে আমার সাহস হচ্ছে না।

বেশ, তাই হবে।

রমলা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দিন তিনেকের মধ্যে আবার ডাক এল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে। মধ্যে তিন দিন মিস্টার সেন অফিসের কাজে পাটনা গিয়েছিলেন। এবার একলা।

রমলা ঢুকতেই মিস্টার সেন সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বোসো। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। একবার আমার জীবনে এলে অবশ্য তোমার হুকুমই তামিল করতে হবে আমাকে। এখন তুমি আমার কথা শোন।

বল।

কাল সকালে সাড়ে দশটার মধ্যে এলায়েড এনটারপ্রাইজের কর্তাদের সঙ্গে একবার দেখা করবে। জার্মান আর মারোয়াড়ী মিলিয়ে এই ফার্ম করেছে। জার্মানি থেকে নতুন ডিজাইনের কতকগুলো বয়লার আর ইকনমাইজার আমদানি করছে ওরা। তার কতকগুলো আমাদের চাই।

কিন্তু এসব বিষয়ে আমি কি কথা বলব?

আরে, বেশী কথা বলতে হবে না। তোমার সুন্দর মুখখানি দেখলেই ওরা গলে যাবে। তুমি শুধু বলবে মিস্টার সেন পরে এসে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন, তার আগে কতকগুলো ইলাসট্রেটেড ক্যাটালগ আমাকে দিন। ব্যস, তাতেই কাজ হবে। ওরা ক্যাটালগও বাজারে বেশী ছাড়ছে না। যেটুকু আমদানী করছে, সবটুকুই সরকাব লুফে নিচ্ছেন। তা হলে আমরা যাব কোথায়!

তবু রমলা একটু আপত্তির সুর তুসল, আর কাউকে পাঠাও, যে এসব বিষয়ে জানে-শোনে। কি কথায় কি উত্তর দেবে, আমি মুশকিলে পড়ব।

মাভৈঃ। কোন মুশকিলে পড়বে না। জার্মানগুলো সুন্দর মুখের কদর খুব বোঝে। আমার তো ভয় হচ্ছে, তোমাকে হয়তো ফেরতই পাঠাবে না।

যাও, ইয়ারকি করতে হবে না। রমলা লজ্জায় অপরূপ হয়ে উঠল।

রমলা আপত্তি করল বটে, কিন্তু ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হল এলায়েড এনটারপ্রাইজে।

বিরাট অফিস। এনকোয়ারীতে একজন মেম বসে। তার কাছে রমলা প্রথম খোঁজ করল। সে নিয়ে গেল অফিস সুপারইনটেনডেণ্ট-এর কাছে। ক্যাটালগ দরকার শুনে তিনি মুখ

বেঁকালেন। এসব যন্ত্রপাতি আমরা বাইরে বিশেষ ছাড়তে পারি না, কাজেই ক্যাটালগও আমরা বাইরে ছড়াই না। সরকারের চাহিদা মিটিয়ে পাবলিককে দেবার মতন আমাদের কিছু বাকি থাকে না।

রমলা নাছোড়বান্দা। ক্যাটালগ একটা তার চাই-ই। পরে তার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এসে এ কোম্পানির কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলবেন।

অফিস সুপারইনটেনডেণ্ট অনেক ভেবে বললেন, আপনি বরং একবার আমাদের টেকনিকাল ডিরেক্টর মিস্টার বোসের সঙ্গে দেখা করুন। তিনি যদি বলেন, ক্যাটালগ আমরা দিতে পারি।

বেশ, আমি তাঁর সঙ্গেই দেখা করব। রমলা হাতের কার্ডটা বাড়িয়ে ধরল।

টেকনিকাল ডিরেক্টরের কামরায় কার্ডটা পাঠিয়ে দিয়ে রমলা ভিজিটার্স রুমে সোফার ওপর বসল। সামনে টেবিলে অনেকগুলো বই। তারই একটা তুলে নিল।

মিনিট পাঁচেক, তার বেশী নয়, তার মধ্যেই বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

বোস সায়েব সেলাম দিয়েছেন।

হাতের বই ফেলে রমলা উঠে দাঁড়াল। হাত দিয়ে চুলটা ঠিক করে নিল। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছল। ওরই মধ্যে ভ্যানিটি-ব্যাগের আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নিল, তারপর বেয়ারার পিছনে এগিয়ে গেল।

বেয়ারা একটা হাত দিয়ে দরজাটা খুলে ধরল, রমলা দ্রুতপায়ে বোস সায়েবের কামরায় গিয়ে ঢুকল।

ঢুকতে ঢুকতেই বলল, গুড মর্নিং স্যার।

বসুন।

গলার আওয়াজে রমলা চমকে উঠল। মুখ তুলে চেয়েই থমকে দাঁড়াল। আঙুলের ডগাগুলো থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

কি হল, বসুন।

শান্তনু বোসের আহ্বানে রমলা আস্তে আস্তে চেয়ার টেনে, বসে পড়ল।

আরো অনেক সুন্দর হয়েছে শান্তনু। আরো অনেক গম্ভীর। ছাই-রঙের এই সুটে তাকে চমৎকার মানিয়েছে।

আপনি এখানে? অস্পষ্ট কণ্ঠে রমলা বলল।

অন্নের জন্য নানা জায়গায় দাসত্ব করতে হচ্ছে। কিন্তু আপনি চাকরি-জীবন শুরু করলেন কবে থেকে? কথার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলেব ওপর রাখা কার্ডটার ওপব শান্তনু আর একবার চোখ বোলাল, ইউনিক ইণ্ডাস্ট্রিজ। এটা কি বাঙালীর ফার্ম?

হ্যাঁ, মিস্টার এ. কে. সেন এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আমি ঢুকেছি প্রায় বছরখানেক।

ও, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল শান্তনু, টেবিলের ওপর হাতটা ঠুকতে ঠুকতে বলল, আমি এর মধ্যে আর একবার বাইরে গিয়েছিলাম। বিলেতে, মাস চারেকের জন্য। এরাই পাঠিয়েছিল।

বমলা কিছু বলল না, মুখ তুলে শুধু শান্তনুর দিকে চাইল। শান্তনুর কথার ভঙ্গীতে মনে হল, বিলেত যাওয়ার কথাটা শুধু গৌরচন্দ্রিকা। আরো কথা তার বলার আছে।

ঠিকই তাই। খুব আস্তে, প্রায় নিজেকে বলার মতন করে শান্তনু বলল, জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল। মানে, জয়ন্ত ঘোষাল।

চেয়ারের হাতল দুটো শক্তহাতে ধরে না থাকলে রমলা বোধহয় মেঝেতে পড়েই যেত। মুখের শেষ রক্তবিন্দু কে যেন নিঃশেষে মুছে নিল। সারা শরীরে একটু জোর নেই। উঠতে গেলেই বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

আপনার সঙ্গে নিশ্চয় তাঁর যোগাযোগ নেই?

রমলা মাথা নীচু করে ঘাড় নাড়ল।

ভালই করেছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা কোন ভদ্র-মহিলার পক্ষেই খুব সম্মানজনক নয়।

কেন? কিছু বলতে চায় নি রমলা, কিন্তু হঠাৎই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রায়ই তাঁকে পথে-ঘাটে মাতাল অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এসব ব্যাপারে লণ্ডনের পুলিশ ভারি কড়া। বন্ধুবান্ধবরা বহুকষ্টে তাঁকে উদ্ধার করে। তার ওপর নতুন কোন বাঙালী বিলেতে গেলেই জয়ন্তবাবু খোঁজ নিয়ে ঠিক তাদের কাছে হাজির হন। সাহায্য প্রার্থনা করেন। শুনলাম, কোথায় কি একটা কাজ করতেন, নিজের দোষে সে চাকরি গেছে। এদিকে দুটি ছেলেমেয়ে। তাদের দিকে ফিরেও দেখেন না। এমন পরিবর্তন যে কি করে হল, সেটাই আশ্চর্য। এ ব্যাপারে আপনিও খুব শক পেয়েছেন মনে হয়। সেটাই স্বাভাবিক। আপনার বাবার কাছে শুনেছিলাম—

কি শুনেছিলেন, সে কথা থাক, রমলা বাধা দিল, জয়ন্ত ঘোষালের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। থাকতে পারে না। সে অধ্যায় আমি মুছে ফেলেছি। অন্য কথা বলুন।

রমলা নিজেই অন্য প্রসঙ্গ শুরু করল।

আপনার বাবা এসেছিলেন আমাদের বাড়ি, আপনার বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে। আমার যাবার ইচ্ছাও ছিল কিন্তু সেই সময় আসানসোলের এক স্কুলে চাকরি পেয়ে গেলাম বলে আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। বৌ কেমন হল বলুন।

শান্তনু হাসল। মৃদুগলায় বলল, বৌ সম্বন্ধে আমার নিজের মনে কোন ছবি কোনদিনই আঁকা ছিল না। কাজেই তার সঙ্গে মিলিয়ে ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে এমন তুলনা করার অবকাশ পাই নি। বাবা নিজে দেখেছেন। আমি বিয়ে করেছি।

আপনি দেখেন নি?

এখন দেখছি। শান্তনু আবার হাসল।

তবু বিয়ের আগে বৌকে একবার দেখলেন না?

তাতে লাভটা আর কি হত? অনেকদিন ধরে পাশাপাশি ঘুরে, মন-জানাজানির পালা শেষ করেও তো মানুষ ভুল করে।

কি ভেবে শান্তনু কথাটা বলেছিল কে জানে! হয়তো কিছু ভেবেই নয়। কিন্তু রমলার মনে হল এ কথার লক্ষ্য রমলা। এতদিন পরে সুযোগ পেয়ে শান্তনু মনের সব বিষটুকু ঢেলে দিল। বমলার আধুনিকতার প্রতি তির্যক কটাক্ষ। তার পূর্বরাগের অবমাননাকর পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

তর্ক করে লাভ নেই। তর্কে সমস্যার সমাধান হয় না। তা ছাড়া, রমলা পরাজিত। সর্বাঙ্গ তাব তীক্ষ্ণ শায়কে ক্ষতবিক্ষত। মাথা তুলে দাঁড়াবাব শক্তি নেই। যে জয়ন্তর ভরসায় শান্তনুর মতন পাত্রকে সে অবহেলায় দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, আজ বুঝতে পারছে সে জয়ন্ত মাটির পাত্রের চেয়েও ভঙ্গুর। তার ওপর নির্ভর করা যায় না।

রমলা বলল, ব্যক্তিগত কথায় আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করব না। আমি এসেছিলাম আপনাদের কোম্পানির একটা ক্যাটালগ নেবাব জন্য।

শান্তনু একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, আমাদের ক্যাটালগ তো বাইরের কাউকে দেওয়া হয় না। যতদূর মনে পড়ে আপনাদের কোম্পানি ক্যাটালগ চেয়ে একবার চিঠি দিয়েছিল, আমরা আমাদের অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও কেন তাঁরা আপনাকে পাঠালেন বুঝতে পারছি না।

রমলা দাঁড়িয়ে উঠল। অপমানে তার দুটো কান লাল হয়ে উঠেছে। হাত জোড় করে নমস্কার করে বলল, আমারই এখানে আসা ভুল হয়েছে। আপনি সত্যযুগের লোক, সেটা মনে ছিল

না। অফিসের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ আপনি কোনদিনই করবেন না, সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম। আচ্ছা, চলি।

একটু এগিয়েই রমলা ঘুরে দাঁড়াল। শান্তনুও উঠে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে দৃষ্টি রেখে বলল, আর একবার সম্ভবত আপনাকে বিরক্ত করতে আসব। কয়েক মাসের মধ্যেই। ইউনিক ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সেনের সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক। আমার অভিভাবক বলতে আমি নিজে। কাজেই নিমন্ত্রণপত্র দিতে আমিই আসব।

পথে নেমে রমলা ভাবতে শুরু করল। নিজের বিয়ের কথাটা ওভাবে বলার কি প্রয়োজন ছিল? শান্তনু জয়ন্তর কথা তুলল বলেই বুঝি রমলার মন পাল্টা আক্রমণের একটা সুযোগ খুঁজছিল। নাকি, শান্তনু নিজে বিয়ে-থা করে সুখে আছে এমন একটা ছবি রমলা বরদাস্ত করতে পারছিল না।

ভাবতে ভাবতে রমলার কিন্তু ভারি লজ্জা করতে লাগল। ছি, ছি, কি ভাবছে শান্তনু। চেয়ারে হেলান দিয়ে হয়তো মিটি-মিটি হাসছে। এমন একটা নাটকীয় ব্যাপার রমলা কি করে করল।

শান্তনুকে টলানো যায় নি। সেজেগুজে রমলা গিয়েছিল কাজ আদায় করতে। ভেবেছিল যেই থাক, একটু মিষ্টি হেসে, ঠিক রমলা কাজ উদ্ধার করবে। কিন্তু শান্তনু আলাদা ধাতুতে গড়া। তাকে কাবু করা রমলা কেন, যে কোন আধুনিকা মেয়েরই বুঝি অসাধ্য।

মিস্টার সেনের কামরায় গিয়ে রমলা চেয়ারে বসে পড়ল। মাথা নেড়ে বলল, হ্ল না।

দিলে না ক্যাটালগ?

না। তোমরা আগে ক্যাটালগ চেয়ে পাঠিয়েছিলে, তা তো বল নি আমায়।

বলব আর কি। ইন্দ্রের হুঙ্কারে হয় নি বলেই তো, মেনকাকে পাঠালাম সাজিয়ে-গুজিয়ে। যদি মুনিদের ধ্যানভঙ্গ হয়।

অন্য মুনি হ'লে কি হত বলা যায় না, কিন্তু এ মুনির কাছে কিছু হবার জো নেই।

কি রকম? মিস্টার সেন চেয়ারে কাত হলেন।

টেকনিক্যাল ডিরেক্টর মিস্টার শান্তনু বোস আমার জানা লোক।

জানা লোক? আর সেই তো সর্বেসর্বা। এসব ব্যাপারে তার ওপর কেউ কথা বলে না। জানা লোক, তাও কাজ বাগাতে পারলে না?

রমলা হাসল, শুধু নিছক জানালোক হলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু শান্তনুবাবু আমাব কাছের লোক হবারও চেষ্টা করে-ছিলেন একসময়ে।

Really! উৎসাহে মিস্টার সেন উঠে বসলেন, ব্যাপারটা বল, শুনি।

মুখরোচক কিছু নয়, ভদ্রলোক খুব ভালভাবেই আমার বাবার কাছে আমার পাণি প্রার্থনা করেছিলেন।

বল কি, তা পাত্র হিসাবে শান্তনু বোস তো সর্বাংশে কাম্য। তুমি ফিবিয়ে দিলে কেন?

লক্ষ্মীটি, এর বেশী আর জানতে চেও না। যখন তোমার হব, সব কিছু তোমায় জানাব। শুধু এইটুকু জেনে রাখো শান্তনুবাবুকে মন দিয়ে গ্রহণ করা তখন আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

তখন বুঝি অন্য ডালে বাসা বাঁধবার তালে ছিলে? মিস্টার সেনের কণ্ঠে কৌতুকের রেশ।

আমাকে তোমার সেই ধরনের মেয়ে বলে মনে হয় বুঝি? ডালে ডালে বাসা বেঁধে বেড়াই? রমলা দৃঢ়কণ্ঠে বলল।

মিস্টার সেন হাসি থামালেন না, তোমাদের কথা দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ।

রমলাও শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলল।

মাসখানেকের মধ্যে রমলা নিজের কাছে ধরা পড়ে গেল। স্নানের ঘরে বসন উন্মোচন করতেই দেহের পরিবর্তন প্রকট হয়ে উঠল। সর্বনাশ, উপায়! এ সম্ভাবনার কথাটা একেবারেই তার মনে হয় নি। রভস-লীলার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকটা কি করে সে উপেক্ষা করেছিল! ভাগ্য ভাল, রেবার কাছে ধরা পড়ে নি। অথচ দুজনে এক বিছানায় শুয়েছে। মাঝে মাঝে কৌতুকবশে রেবা সবলে রমলাকে জড়িয়ে ধরেছে। তার সামনে অসঙ্কোচে রমলা বেশ-পরিবর্তনও করেছে। খেয়াল করে নি রেবা। কিন্তু বেশীদিন তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না। তখন কি বলবে রমলা? একদিন মদ্যপান করার জন্য রেবাকে রমলা তিরস্কার করেছিল, এবার রেবা সেই তিরস্কার শতগুণ করে ফেরত দেবে।

মদ্যপানের চেয়েও এ অপরাধ যে কত ঘোরতর, কত মারাত্মক ভাবতেও রমলা শিউরে উঠল। এই মুহূর্তে মিস্টার সেনকে জানানো ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

অফিসে গিয়েই রমলা চেষ্টা করল, কিন্তু ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কামরায় খুব ভিড়। বাইরে থেকে একদল লোক এসেছে, তাদের নিয়ে মিস্টার সেন খুব ব্যস্ত। রমলা ভেবেছিল, লাঞ্চের অবসরে দেখা করবে। তাও হল না। দলবল নিয়ে মিস্টার সেন বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

রমলার এ চাঞ্চল্য রেবার দৃষ্টি এড়াল না। রমলার দিকে চেয়ে বলল, কি রে, এত ছটফট করে মরছিস কেন?

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। জলপাইগুড়ির সেই বরফ-ফ্যাক্টরীর মেশিন সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে। প্রথমে ওরা লিখেছিল, কাজ হবে ইথার-প্রসেসে, এখন বলছে অ্যামোনিয়া-প্রসেসে কাজ হবে। মুশকিলের ব্যাপার না?

চুলোয় যাক, ইথার আর অ্যামোনিয়া। তোর অত মাথাব্যথা কিসের ?

বা রে, এ অফিসে কাজ করছি আর এখানকার স্বার্থ দেখব না ? রমলা মুখচোখে অদ্ভুত সরলতার ছাপ আনল।

রেবা দুটো চোখ কুঞ্চিত করে রমলার দিকে চাইল, তারপর বলল, ওই তোর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কামরা খালি হয়েছে। এইবার যা।

রমলা দ্রুতপায়ে দরজা ঠেলে ভিতর ঢুকে গেল।

মিস্টার সেন ওঠবার আয়োজন করছিলেন, হঠাৎ সশব্দে রমলা ঢুকতে বললেন, কি ব্যাপার ? কেউ তাড়া করেছে নাকি ?

শোন, কথা আছে। রমলা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। আমার সর্বনাশ হয়েছে।

হেঁয়ালি ছেড়ে স্পষ্ট কথা বল। আমার একটু পরে একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

লোকের কাছে আমার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না কিছু-দিন পরে। একি তুমি আমার করলে !

একটু একটু করে কুয়াশা কেটে যাওয়ার মতন সমস্ত ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে উঠল। মিস্টার সেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে দুটো হাত প্যাণ্টের পকেটে ডুবিয়ে বললেন, কেউ জানতে পেরেছে ?

এখনও পারে নি, কিন্তু একটু অসাবধান হলেই রেবা পারবে। তা ছাড়া আরো পরে কার চোখে হাত চাপা দেব ?

হুঁ, মিস্টার সেনের গলা গম্ভীরতর হল। চাপা গলায় বললেন, ও আস্তানা তোমায় ছাড়তে হবে। রেবার সঙ্গে তোমার থাকা চলবে না।

কিন্তু কোথায় যাব ?

সে ভাবনা আমার। আজ রাত্রেই জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবে, কাল ভোরে আমার গাড়ী যাবে তোমাকে নিয়ে আসতে।

কিন্তু এভাবে হঠাৎ চলে আসার কি কৈফিয়ত দেব রেবাকে?

কিছু একটা বলতে হবে। এমন কিছু যাতে সাপও মরে, অথচ লাঠিও না ভাঙে। প্যাণ্টের পকেট থেকে হাত দুটো বের করে মিস্টার সেন টেবিলের কাঁচের ওপর রাখলেন। উত্তেজনায় হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে।

কিন্তু কি বলব, সেটা বলে দাও। অধৈর্য কণ্ঠে রমলা প্রশ্ন করল।

দাঁড়াও, ভাবতে দাও একটু। মিস্টার সেন উঠে জানালার ধারে দাঁড়ালেন। মিনিট পাঁচেক, তারপর রমলার কাছে ফিরে এসে বললেন, ঠিক আছে। তোমাকে অফিসে একটা প্রমোশন দিচ্ছি। মাইনেও কিছু বাড়বে আর সেই সঙ্গে কোয়ার্টারও পাবে। এখানকার অন্য অফিসাররা যা পায়। তাহলে, ও আস্তানা ছাড়া তোমার পক্ষে সহজ হবে।

রেবা, রেবা কি মনে করবে? রমলার কণ্ঠে দ্বিধাব মিশেল।

কে কি মনে করল অত দেখলে কি আমাদের চলে? তোমার কাজে-কর্মে বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স খুশী, কাজেই তোমার উন্নতি হল। এতে যদি কারো চোখ টাটায়, well, he or she can very well clear out.

একটু দাঁড়িয়ে থেকে রমলা বেরিয়ে এল। একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু এ ছাড়া রমলার ইজ্জৎ বাঁচাবার আর কোন পথ নেই। যেমন করেই হোক আপাতত রেবার সামনে থেকে সরে যেতেই হবে।

তারপর?

তারপরের চিন্তা মিস্টার সেনের, রমলার নয়।

রেবাকে গিয়ে কথাটা বলতেই রেবা ভ্রূ কোঁচকাল। রমলার আপাদমস্তক দেখল, তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, congratulations.

অন্যদিন হলে কি হ'ত বলা যায় না। হয়তো রমলা রেবাকে জাপটে ধরে তার অভিমান ভাঙাত, কিন্তু শরীরের এ অবস্থায় রেবার খুব কাছে যেতে তার সাহস হল না।

আস্তে আস্তে সরে গেল সেখান থেকে। বারান্দায় একটা চেয়ার পেতে বসে রইল।

পরের দিন খুব ভোরে মোটরের হর্নের শব্দে রমলার ঘুম ভেঙে গেল। জিনিসপত্র গোছানোই ছিল, বারান্দা থেকে হাত নাড়তে ড্রাইভার ওপরে উঠে এল। ড্রাইভার জিনিস নিয়ে নেমে যেতে, রমলা রেবার খাটের কাছে এসে দাঁড়াল।

আলুথালু বেশে রেবা অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

এই রেবা, রেবা। রেবার বাহুমূল ধরে রমলা নাড়া দিল।

কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর রেবা ক্লান্ত চোখ মেলল, কি, চেঁচাচ্ছিস কেন?

আমি চলে যাচ্ছি।

রেবা হাসল, যা, কিছুদিন নতুন জীবন ভালই লাগবে। এ পৃথিবীতে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকুই লাভ। তারপর ফুটপাত্ত তো আছেই।

রমলা দাঁড়াল। ভাল করে ঘুম ভাঙে নি রেবার। ঘুমের ঘোরেই বোধ হয় আবোল-তাবোল বকছে। এখন আর অপেক্ষা করার সময় নেই। অফিসে তো দেখা হবেই রেবার সঙ্গে।

সাবধানে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রমলা নেমে গেল।

সাহেবপাড়ার সাজানো বাড়ি। বাইরের ঘরটা রমলার খুব পছন্দ হল। শোবার ঘরে উঁকি দিতে গিয়েই থেমে গেল।

খাটের ওপর মিস্টার সেন বসে রয়েছেন। রমলাকে দেখে বললেন, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে রমলা।

রমলা খাটের ওপর গিয়ে বসল, বল?

আমি অনেক ভেবে দেখলাম, তোমার আর অফিসে গিয়ে কাজ নেই।

কেন?

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের স্ত্রী সেই অফিসেই কাজ করবে এটা আমার পক্ষে খুব সম্মানের নয়। তা ছাড়া তোমার শরীরের এ অবস্থায় অফিসে গেলে, জানাজানি হয়ে যাবে। তারপর তোমাকে বিয়ে করলে নানা দিক থেকে নানা কথা উঠবে।

রমলা কোন উত্তর দিল না। চুপচাপ মাথা নীচু করে বসে রইল।

তুমি বরং বাড়িতেই থাক। অফিসে একটা রেজিগনেশন দিয়ে দাও। আমি রোজ বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব। একজন বাবুর্চি রইল, একজন চাকর, তোমার কোন অসুবিধা হবে না বলেই আমার মনে হয়।

তুমি যা বলবে তাই করব। অফিসে যাবার সত্যিই আমার কোন ইচ্ছা নেই। শুধু তোমাকে দেখবার জন্য যেতে মন চাইত। তুমি যদি রোজ বিকেলে আমার কাছে আস, তাহলে তো যাবার দরকারই নেই।

এ উচ্ছ্বাসের কোন উত্তর মিস্টার সেন দিলেন না। পকেট থেকে কাগজ আর কলম বের করে রমলার সামনে রেখে বললেন রেজিগনেশনের চিঠিটা আজই দিয়ে যাও, তাহলে আর অফিসে কোন কথা উঠবে না। সবাই জানবে, তুমি ছেড়ে গেছ।

কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখতে গিয়েই রমলা থেমে গেল, একটা কথা?

কি?

রেবাকে বলেছি আমার প্রমোশন হয়েছে। আমি কোয়ার্টার পেয়েছি। সে কি ভাববে?

মিস্টার সেনের সারা মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। স্বরে

কর্কশতা। বললেন, কোথায় কোন্ পেটি কেরানী কি ভাববে সে চিন্তা করতে গেলে আমাদের চলে না। বিয়ের পরে যে সোসাইটিতে তুমি ঘোরাফেরা করবে, তোমার রেবা তার ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। নাও, আর দেরি করো না। আমি লেট্ হয়ে যাব।

রমলা খস্‌খস্ করে কাগজের ওপর লিখে গেল, তারপর পদ-ত্যাগপত্রটা মিস্টার সেনের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, এই নাও। এই মুহূর্ত থেকে আর তুমি আমার ম্যানেজিং ডিরেক্টর নও।

মিস্টার সেন কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে বাখতে রাখতে হাসলেন, এখন থেকে আমি তোমার একান্ত অনুগত্য ভৃত্য।

মিস্টার সেন চলে যেতে অনেকদিন পরে রমলা গুন্‌গুন্ করে গান ধরল। ঘুরে ঘুরে নিজেব জিনিসপত্র গোছাল। বেয়ারা আর বাবুর্চিকে ডেকে খাটটা সরিয়ে নিয়ে এল জানলাব পাশে। বিকেল হতে, বেয়ারাকে দিয়ে বেলকুঁড়ির মালা কিনে আনিয়ে নিজের খোঁপায় জড়াল।

সেদিন বিকালে কিন্তু মিস্টার সেন এলেন না।

মিস্টার সেন এলেন পরের দিন বিকালে। একলা নয়, সঙ্গে একজন লোক।

রমলা জানলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, সঙ্গে লোক দেখে সরে এল।

লোকটিকে বাইরের ঘবে বসিয়ে মিস্টাব সেন পর্দা ঠেলে ভিতরের ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

কিছু মনে কোরো না রমলা, কাল ঠিক ছুটির মুখে বাইরে থেকে একগাদা লোক এসে জুটল। তাদের সঙ্গে ছুটোছুটি করতে করতে রাত হয়ে গেল। তোমার কাছে আর আসা হল না।

আগের দিন বিকালে কেনা বেলকুঁড়ির মালাটা টিপয়ের ওপর পড়ে ছিল। সেই দিকে চোখ ফিরিয়ে রমলা ম্লান হাসল।

কি, রাগ করলে নাকি ? মিস্টার সেন অন্তরঙ্গ গলায় বললেন।

রমলা হেসে ফেলল, রাগ করব কেন, তুমি কিরকম কাজ-পাগলা লোক আমি জানি না ? কাজ পেলে তুমি পৃথিবী ভুলে যাও।

মিস্টার সেন এগিয়ে এসে রমলার আঙুলে মৃদু চাপ দিলেন।

তোমার সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে রমলা।

কি বল ?

তুমি কিছু মনে করবে না ? ভুল বুঝবে না ?

এমন ভাবে কথা বলছ কেন ? রমলা একটু উদ্বিগ্ন হল।

মিস্টার সেন রমলার একটা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে তুলে নিলেন। মোলায়েম গলায় বললেন অবুঝ হয়ো না। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন।

রমলা একটু সরে বসল।

আমি অনেক ভেবে দেখলাম রমলা, সমাজে বাস করে সমাজকে অতিক্রম করা যায় না।

এইবার রমলা ভয় পেল। কাতর কণ্ঠে বলল, তুমি কি বলতে চাও বল তো ?

আমি বলতে চাই তোমার আমার মিলন সহজ হবে, পবিত্র হবে। মাঝখানে অশুচি কিছু থাকবে না।

অশুচি ?

হ্যাঁ, আরো পরিষ্কার করে বলছি, আমাদের মিলনের মাঝখানে জারজ সন্তানের অস্তিত্ব থাকবে না।

মানে, মানে, তুমি বলতে চাও—রমলা প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ল।

হ্যাঁ, আমি তাই বলতে চাই। তুমি গেঁয়ো অশিক্ষিতা মেয়ে নও—সমস্ত জিনিসটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে, স্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখ। প্রেমের বন্ধনে বিকৃত লালসার পরিণতি ঘুরে ফিরে বেড়াবে সেটা দুজনের কেউই সহ্য করতে পারব না।

কিন্তু যে আসবে সেও তো আমাদের তুজনেরই।

তুজনেরই ঠিক, কিন্তু পবিত্র বন্ধনের ফল নয়। তাকে আমরা কখনই ক্ষমা করতে পারব না। আমাদের অসুস্থ মনোবৃত্তির নিরিখ হিসাবে, ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার পাপ হিসাবেই সে বেঁচে থাকবে। একরাত্রের পদস্খলনের ইতিহাস। তাই বলছি, সঙ্গে ডাক্তার এনেছি। আজ রাত্রেই তোমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাব। কত-ক্ষণেরই বা মামলা। দিন-তিনেক বিশ্রাম নিয়ে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিবে আসবে। তারপর দিনক্ষণ দেখে তোমাকে কাছে টানবার পক্ষে আর কোন বাধাই থাকবে না।

এবার মিস্টাব সেন রমলাকে আবেগভরে কাছে টেনে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করলেন নিজেব অধর দিয়ে।

সেই রাত্রেই বমলাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হল। মিস্টাব সেনের গাড়ীতে। মিস্টার সেন সঙ্গে রইলেন। ডাক্তারও।

অনেকক্ষণ মিস্টার সেন আব ডাক্তাব পরামর্শ করলেন নীচু গলায়। রমলা সোফায় বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে একটা কাগজ সই করতে হল তাকে। যদি অপারেশনের ফলে কোনদিন রমলার চৈতন্য না ফেরে, তাব সম্পূর্ণ দায়িত্ব রমলার। দোষেব ভাগ আর কারো নয়।

তারপর সব কেমন আবছা। কড়া ওষুধের গন্ধ। সাদা এপ্রন ঢাকা ডাক্তার আর নার্সের অস্পষ্ট ছবি। হাজার ভোল্টের বাতি। খুব ধীরে ধীরে কালো একটা যবনিকা নেমে এল চোখের সামনে।

যখন জ্ঞান হল তখন জানলার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো এসে বিছানায় পড়েছে। রমলা এদিক-ওদিক চাইতেই চোখাচোখি হল। বেতের চেয়ারে নার্স বসে আছে।

নার্স। খুব মৃতু গলায় রমলা ডাকল।

নার্স উঠে এসে বিছানার পাশে দাঁড়াল।

কি হয়েছিল? ছেলে না মেয়ে? রমলার ব্যগ্র কণ্ঠ।

যাকে রাখতে চাইলেন না, তার খবর জেনে আর কি করবেন। নার্স হাসবার চেষ্টা করল।

তবু, একবার বলুন।

এখন কিছু বোঝা যায় না। নিন, বিশ্রাম করুন। নার্স আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

আর কতদিন এখানে থাকতে হবে? ঘাড় ঘুরিয়ে রমলা জিজ্ঞাসা করল।

কাল বিকেলে আপনি ছাড়া পেয়ে যাবেন।

রমলা আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। অবসাদে শরীর ভেঙে পড়ছে। রাজ্যের ঘুম নামছে দু'চোখে।

নার্সের ডাকাডাকিতে একসময়ে রমলার ঘুম ভাঙল। চোখ খুলে দেখল নার্স মুখের সামনে দুধের কাপ ধরেছে।

চুমুক দিয়ে দুধটা খেয়ে রমলা বলল, বলতে পারেন, সকাল-বেলা কি মিস্টার সেন এসেছিলেন?

মিস্টার সেন, কই না। নার্স ঘাড় নাড়ল।

বিকেলে অফিস-ফেরত আসবেন বোধ হয়। নিজের মনে বিড়বিড় করে রমলা বলল। এখনও শরীরের ক্লান্তি ঘোচে নি। কেবল ঘুমাতে ইচ্ছা করছে।

আবার সন্ধ্যায় নার্সের ডাকে রমলা উঠে বসল। সামনে ডাক্তার দাঁড়িয়ে।

রমলা চোখ খুলতে ডাক্তার হাসলেন, কেমন আছেন মিস রয়?

মাথা নীচু করে রমলা বলল, ভাল।

ডাক্তার কাছে এসে পরীক্ষা করলেন, তারপর হাতের স্টেথস-কোপটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, আমি চলি। কাল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন। বেলা তিনটা নাগাদ আপনার ছুটি।

ডাক্তার পিছন ফিরতে রমলা ডাকল, শুনুন।

ডাক্তার থামলেন।

মিস্টার সেন কি আজ আসবেন? চেষ্টা সত্ত্বেও গলাটা বার দুয়েক কেঁপে উঠল।

মিস্টার সেন তো নেই এখানে।

নেই? কোথায় গেছেন? রমলা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

আজ সকালের প্লেনে মাদ্রাজ গেছেন। ফিরতে বোধ হয় দিন কুড়ি দেরি হবে।

দিন কুড়ি! রমলা নিশ্বাস ফেলল। অবশ্য মিস্টার সেনের আর কি দোষ। সমস্ত বন্দোবস্ত করেই গেছেন। তা ছাড়া, নিশ্চয়, হঠাৎ চলে যেতে হয়েছে। আগে থেকে জানলে রমলাকে বলে যেতেন।

পরের দিন বেলা বারোটা থেকেই রমলা সাজগোজ শুরু করল। সঙ্গে দামী একটা শাড়ী এনেছিল, সেটাই পরল। খুব ইচ্ছা করছিল একবার মিস্টার সেনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। যে অপবাদের ভয়ে তিনি রমলাকে গ্রহণ করতে ইতস্তত করছিলেন, সে অপবাদের উৎস অপসারিত। কোন বাধা নেই, কোন অসুবিধা নয়। একবার শুধু কাছে ডাকার আমন্ত্রণ।

যাবার মুখে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল। হাত তুলে নমস্কার করে রমলা বলল, চলি।

ডাক্তার কোন কথা বললেন না, শুধু একটা হাত তুললেন।

নার্সিংহোমের দারোয়ানকে দিয়ে রমলা একটা ট্যাক্সি ডেকে এনেছিল। তাতে চড়ে বসে বাড়ির নির্দেশ দিল।

মোটরে বসে বসেই ভাবতে লাগল, বাড়ির বাবুর্চি আর বেয়ারা কি মনে করবে। দুটো রাত রমলা কোথায় কাটিয়ে এল!

ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে রমলা বাড়ির দরজার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। দরজায় বিরাট এক তালা ঝুলছে।

খুব সম্ভব বাবুর্চি আর বেয়ারা টহল দিতে বেরিয়েছে। রমলা

যে আসবে একথা তাদের জানবার নয়। রমলা একেবারে কোণের দিকে দারোয়ানের ঘরের সামনে গেল। ছোট একটা টুলের ওপর বসে দারোয়ান সবে একটা গানের কলি শুরু করেছিল, রমলাকে সামনে দেখে থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করল।

তোমার কাছে বাড়ির চাবিটা আছে?

চাবি? না মাইজী। দারোয়ান সবিস্ময়ে ঘাড় নাড়ল।

সেকি, বেয়ারা বাবুর্চি নিয়ে বেরিয়েছে বুঝি?

না, দরোয়ান আবার মাথা নাড়ল, চাবি সায়েবের কাছে।

সায়েবের কাছে? সায়েব ফিরেছেন মাদ্রাজ থেকে? কবে ফিরলেন?

তা তো জানি না মাইজী। আপনি চলে যাবার পরের দিন সকালেই সায়েব আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে গেছেন।

সেকি, আমার সব জিনিসপত্র যে বাড়ির মধ্যে রয়েছে?

সে-সব সায়েব আমার কাছে রেখে গিয়েছেন। কথার সঙ্গে সঙ্গে দরোয়ান ঠেলা দিয়ে নিজের ঘরের দরজাটা খুলে দিল। ঠিক সামনে মেঝের ওপর রমলার স্যুটকেস, বাক্স, ময়লা কাপড়ের পোঁটলা।

রমলার দু-চোখ জলে ভরে এল। সেই আসন্ন সন্ধ্যায় রমলা যেন নিজের জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াল। করাল নিয়তি সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। নিয়ন্ত্রিত করছে তার ভাগ্য। উদ্ধার পাবার কোন উপায় নেই।

আর কোথাও বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা নেই, অন্ধকারের কোন আভাস নয়। মিস্টার সেনের নিজের ইজ্জৎ বাঁচাবার প্রয়োজনে রমলাকে নার্সিংহোমে পাঠানো হয়েছিল। দুজনের মিলনের পথের বিঘ্ন উচ্ছেদ করার জন্য নয়, মিস্টার সেনের মর্যাদা রক্ষার জন্য। আর কোন আয়ুধ নেই রমলার তূণীরে, মিস্টার সেনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কোন প্রমাণ। আর এক ছলনা, আর এক প্রবঞ্চনার জালে রমলা জড়িয়ে পড়েছে।

মাইজী !

দারোয়ানের কণ্ঠস্বরে রমলার সম্বিৎ ফিরে এল।

চোখ ফিরিয়ে দেখল, দারোয়ান হাতটা বাড়িয়ে ধরেছে। তার প্রসারিত হাতে একটা খাম।

সায়েব আপনাকে দিতে বলে গেছেন।

কম্পিত হাতে রমলা খামটা তুলে নিল। বোধ হয় মিস্টার সেন কোন চিঠি দিয়েছেন। ইনিয়ে-বিনিয়ে ক্ষমা চাওয়ার অর্থহীন প্রয়াস। কিংবা কোন কৈফিয়তের অন্তরালে নিজের আচরণের ত্রুটি ঢাকবার চেষ্টা।

খুব সাবধানে রমলা খামটা ছিঁড়ে ফেলল। সারি সারি অনেকগুলো নোট। ক্ষমাপ্রার্থনা নয়, আচরণের জন্য কোন সাজানো কৈফিয়ত না, রমলার কৌমার্য-হানির ক্ষতিপূরণ। এক কথায়, রমলার নারীত্বের মূল্যায়ন।

রমলা একবার মনে করল নোটগুলো খণ্ড খণ্ড করে সন্ধ্যার বাতাসে উড়িয়ে দেবে। তারপরই ভাবল, কি হবে তাতে। মিস্টার সেনের কতটুকু শাস্তি! রমলার অপমানের কালি তাতে একটুও ফিকে হবে না।

তার চেয়ে, রমলা নোটসুদ্ধ খামটা শক্তহাতে চেপে ধরল, মিস্টার সেনের সঙ্গে রমলা মুখোমুখি দেখা করবে। অফিসে, বাড়িতে যেখানে হোক। এই নোটের গোছা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবে তার মুখে। দরকার হলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সর্বনাশ করার প্রতিশোধ নেবে।

কিন্তু, এখন, এখন কি করবে রমলা! এই কুড়ি দিন কোথায় আস্তানা পাতবে! রেবার কাছে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। প্রাণ থাকতে রমলা তা পারবে না। কি বলবে রেবাকে? অফিসের উন্নতি, বাসা-বদলের মিথ্যা কাহিনী চাপবে আর কোন্ মিথ্যা দিয়ে!

এভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরোয়ানের সামনে হাস্যাস্পদ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, সেটুকু রমলা বুঝল। তাই ক্লান্ত, ভগ্ন গলায় বলল, আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পার?

একটু দাঁড়ান মাইজী। দরোয়ান পাশ কাটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

সে-রাতের কথা রমলা কোনদিন ভুলবে না। ক্লান্ত দেহ আর অবসন্ন মন নিয়ে পথে পথে অনির্দেশ যাত্রা। কোন আস্তানার ঠিক নেই, কোথায় যাবে তার কোন স্থিরতা নয়। এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে রমলা ঘুরে ঘুরে বেড়াল।

শেষকালে এক গলির মধ্যে হোটেলের যখন খোঁজ পেল, তখন রাত প্রায় দশটা। হোটেলটার চেহারা ভাল লাগল। তা ছাড়া আরো দু-একটি পরিবার কয়েকটা ঘর নিয়ে রয়েছে। নীচে খাবার ঘর থেকে ঘোমটা-মাথায় কয়েকটি বৌকেও রমলা দেখতে পেল।

হোটেলের খাতায় নাম, ধাম, পিতৃপুরুষের পরিচয়, এ শহরে আসার উদ্দেশ্য সব লিখে রমলা যখন নিজের কামরায় শুতে গেল তখন ঠিক এগারোটা। দুপুরের পর থেকে অভুক্ত, কিন্তু আশ্চর্য, ক্ষুধাতৃষ্ণাবোধ তার কিছুই ছিল না। আর কোন বোধ নয়, শুধু তীব্র একটা জ্বালায় দেহমন তপ্ত হয়ে উঠল।

পৃথিবীর সব পুরুষ কি এমনই সুবিধাবাদী! কোটি কোটি জয়ন্ত ছড়িয়ে আছে সারা গ্রহে। পিচ্ছিল একটা লালসার আবর্তনে সমস্ত পৃথিবী ঘুরছে। হৃদয় একটা অর্থহীন কল্পনা, ভালবাসা শুধু জৈবিক প্রয়োজনের বহিঃপ্রকাশ। জয়ন্ত আলগোছে তার দেহ ছুঁয়েছে। তার শেষ কপর্দক অপহরণ করেছে! মিস্টার সেনের অপরাধ আরও অনেক বেশী। তার নারীত্ব নিয়ে তিনি ছিনিমিনি খেলেছেন। নিঃশেষে তৃষ্ণা মিটিয়ে পানপাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন পথের ধুলোয়।

দুটো হাতে মুখ ঢেকে রমলা উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল।

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। ভেবেছিল কাঁদলে হয়তো মনের ভার কমবে। একটু হালকা হবে। কিন্তু তা হল না। বিষাদের তমসা-বলয় তাকে আরো দৃঢ়ভাবে বেষ্টন করে রইল। নিজেকে অপবিত্র, অশুচি মনে হল।

কিন্তু কেন, কেন এইভাবে বঞ্চনার পর বঞ্চনা তাকে ভোগ করতে হবে। জয়ন্ত, সতীপ্রসন্ন, আদিত্যবাবু, মিস্টার সেন সবাই শুধু তাকে প্রতারিত করারই চেষ্টা করবে। তাব অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে সারা গায়ে কালি ছিটিয়ে দেবে।

উত্তেজনায় রমলা বিছানার ওপর উঠে বসল। কি হয়, যদি কাল সে পুলিশেব আশ্রয় নেয়। কিভাবে মিস্টার সেন তার সর্বনাশ করেছেন, সে কথা তাদের বলে। তাদের আইনের দৃঢ়মুষ্টি মিস্টার সেনকে কি নিষ্কৃতি দেবে! পরিত্রাণ পাবে দুষ্কৃতকারী!

তারপরই কথাটা রমলার মনে পড়ল। প্রমাণ কই! প্রমাণ ছাড়া পুলিশ তার কথা বিশ্বাস করবে কেন? সবচেয়ে বড় প্রমাণ তো সে নষ্ট হতে দিয়েছে নার্সিংহোমে! কিন্তু তার শরীরের বর্তমান অবস্থা কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়! সন্তান অপসারিত, কিন্তু মাতৃত্বের চিহ্ন তো বমলাব সর্বদেহে। তা থেকে কিছু প্রমাণ হয় না?

কি প্রমাণ হয়। মনে মনে রমলা ভাবতে শুরু করল। এই-টুকু প্রমাণ হয় যে সে ভ্রষ্টা। অবাঞ্ছিত ভ্রূণকে পৃথিবীর আলো দেখতে দেয় নি। বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে তাকে ধ্বংস করেছে, কিন্তু এসবের জন্য মিস্টাব সেন দায়ী এমন প্রমাণ কি করে দেবে রমলা। মিস্টার সেন অক্ষত অস্পৃষ্ট থাকবেন। আইন তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

আইন হয়তো পারবে না। সব দিক ভেবে মিস্টার সেন কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কিসের বাধা! মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত তলব করতে তো কোন অসুবিধা নেই।

কেন তিনি এমনভাবে রমলার জীবনটা নষ্ট করলেন। তাঁর কোন ক্ষতি তো রমলা কোনদিন করে নি। তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, সেইজন্য এত কঠিন একটা শাস্তি রমলাকে মাথা পেতে নিতে হবে!

সারাটা রাত রমলা বিছানায় ছটফট করল। একতিল নিদ্রা এল না। একবিন্দু শান্তি নয়। সমস্ত পাঁজরগুলো কে যেন জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেই তাপে রমলার শরীর দগ্ধ হচ্ছে।

পরের দিন বেলা দশটা বাজতেই রমলা নীচে নেমে এল। শরীরটা এখনও দুর্বল। সিঁড়িতে নামতে গিয়ে পা দুটো টলমল করছিল।

ম্যানেজারের পাশে রাখা টেলিফোনটা তুলে ধরে রমলা ডায়াল করল। ম্যানেজার বসে বসে কিসের হিসাব করছিলেন, রমলা টেলিফোন তুলতেই আস্তে আস্তে সরে গেলেন সেখান থেকে।

রমলা মনে মনে ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানাল। সত্যিই তিনি পাশে বসে থাকলে তার কথা বলতে অস্বস্তিই হত।

মিস্টার সেন আছেন? খুব মৃদুগলায় রমলা জিজ্ঞাসা করল। নামটা উচ্চারণ করতেও যেন ঘৃণায় দেহ শিউরে উঠল।

না, তিনি বাইরে আছেন। আপনি কে কথা বলছেন?

আমি তাঁর এক আত্মীয়া। কবে তিনি ফিরবেন বলতে পারেন?

না, তা জানি না। তারের ও-প্রান্তে অপারেটরের কণ্ঠ।

আস্তে আস্তে রমলা টেলিফোন রেখে দিল। সত্যিই তা হলে মিস্টার সেন কলকাতায় নেই। ঠিক আছে, চিরদিন তিনি বাইরে থাকবেন না। একদিন এ শহরে তাঁকে ফিরতেই হবে। রমলা তাঁর প্রতীক্ষায় থাকবে।

বাইরে আসবার মুখেই রমলা ম্যানেজারের সামনে পড়ে গেল। ম্যানেজার দুটো হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, নমস্কার। এক মিনিটের জন্য একটু বিরক্ত করব আপনাকে।

বলুন। রমলা থমকে দাঁড়াল।

আপনার ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার কি আপনার রুমেই পাঠিয়ে দেব, না আপনি কমন ডাইনিং-হলে আসবেন ?

ছু-এক মিনিট রমলা একটু ভাবল। ডাইনিং-হলে আসা মানে একগাদা লোকের সামনে আসা। পুরুষরা দৃষ্টি দিয়ে লেহন করবে, মেয়েরা কৌতূহলী চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার আপাদমস্তক দেখবে। হোটেলে এভাবে একলা কেন রয়েছে রমলা। কলকাতা বিচিত্র শহর, এখানে মানুষের জীবনও বিচিত্র। রমলা যা নয়, এরা হয়তো তাকে তাই ভেবে বসবে।

তাই রমলা ম্যানেজারের দিকে ফিরে বলল, অনুগ্রহ করে আমার খাবার আমার রুমেই পাঠিয়ে দেবেন।

সারাটা ছুপুর রমলা চেয়ার নিয়ে জানালার ধারে বসে রইল। একমুহূর্তের জন্যও বিছানায় শুল না। চোখের পাতা বন্ধ করলেই বীভৎস সব ছবির সার এসে হাজির হয়। রমলাকে ভয় দেখায়। উৎপীড়ন করে।

চেয়ারে বসে বসেই রমলা চারপাশে লোকজনদের আনাগোনার শব্দ শুনল। গানের ছু-একটা কলিও কানে এল। ছেলেমেয়ে ঠ্যাঙানোর আওয়াজ। বেশ ঘরোয়া পরিবেশ। হোটেল বলে মনেই হয় না। অবশ্য ঘরোয়া পরিবেশের বিপদও আছে। এখনই গায়ে পড়ে হয়তো কেউ আলাপ করতে আসবে। রমলার পরিচয় জানতে চাইবে। হোটেলে থাকার কারণ।

চেয়ার থেকে উঠে রমলা দরজাটা বন্ধ করে দিল। বন্ধ দরজা ঠেলে কি কেউ আলাপ করতে আসবে ? কিছুই বলা যায় না। তবে সম্ভাবনা কিছু কম।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট সেরে রমলা বেরিয়ে পড়ল। একবার

ব্যাঙ্কে যাবে। মিস্টার সেনের দেওয়া অতগুলো টাকা এভাবে রাখা ঠিক হবে না।

প্রথমে রমলা ঠিক করেছিল ওই নোটের বাণ্ডিল সে মিস্টার সেনের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারবে। তার ইজ্জতের মূল্য যে কটা কাগজের টুকরোয় ধার্য করা যায় না, সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবে। অন্তত লম্পট এটুকু জানুক যে পৃথিবীতে একটি মেয়ে আছে যার মুখ টাকা দিয়ে বন্ধ করা যায় না।

কিন্তু একটু ভেবেই রমলা বুঝতে পেরেছে, উত্তেজনার মুখে যে নাটকীয় ঘটনাটা খুব মনোমতো ঠেকেছিল, তার কোনই দাম নেই। মিস্টার সেন হয়তো নোটের গোছাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নিজের পকেটে রাখবেন, তারপর বেয়ারা ডেকে এই অপ্রকৃতিস্থা নারীকে বের করে দেবেন। আদৌ তাঁর চেম্বারে ঢুকতেই দেবেন কিনা সেবিষয়েও রমলার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

টাকা ফেরত দেওয়া নয়, সামনাসামনি দেখা হলে কিছু বলবার আছে রমলার। বলতে না পারলে তার বুকের বোঝা হালকা হবে না। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু সে ঠিকও করতে পারবে না।

এমন সময় রমলা বাইরে বেরোল যখন পথে-ঘাটে পরিচিতের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশা কম। আর কাউকে তার তেমন সঙ্কোচ নেই। লজ্জায় পড়বে রেবা কিংবা শান্তনু বোসের সামনে পড়লে।

রেবাকে বলেছিল অফিসে তার প্রমোশন হয়েছে, তাই রেবার সান্নিধ্য ছেড়ে সে বড় কোয়ার্টারে আস্তানা পাততে চলেছে। এমন একটা ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই অফিসে তার পদত্যাগের কথাটা রেবা জানবে। কি এমন ব্যাপার হল যে, প্রমোশন জলাঞ্জলি দিয়ে, বড় কোয়ার্টারের লোভ ছেড়ে, রমলা একেবারে চাকরি থেকেই ইস্তফা দিল?

তবু রেবাকে কিছু একটা বোঝানো যাবে, কিন্তু শান্তনু, শান্তনুকে রমলা কি বলবে?

শান্তনুর অফিসে গিয়ে রমলা বলে এসেছে তার সঙ্গে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বিয়ে হবে। রমলা নিজে আসবে নিমন্ত্রণ-লিপি নিয়ে যথাসময়ে।

এইবার শান্তনুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলে কি বলবে রমলা। আবার নতুন কোন কাহিনী গড়ে এ কথাটা চাপা দেবে। এ শহরে থাকলে তুজনের দেখাসাক্ষাৎ হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। এড়িয়ে এড়িয়ে কতদিন চালাবে!

দিন দশেক পরে সাহস করে রমলা সোজা ইউনিক ইণ্ডাস্ট্রিজের অফিসে গিয়ে হাজির হল। দারোয়ানের কাছে খবর পেল মিস্টার সেন আগেব দিন ফিরেছেন। লোকজনের চোখ এড়িয়ে রমলা ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসল। বেয়ারার হাতে স্লিপ পাঠিয়ে দিল মিস্টার সেনের দরবারে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেয়ারা ফিরে এল। বলল, সায়েব খুব ব্যস্ত। দেখা হবে না।

এ তো জানত রমলা। তার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস মিস্টার সেনের নেই। কিন্তু রমলার তাঁকে দরকার। অন্তত মিনিট পাঁচেকের জন্য।

বেয়ারাকে রমলা বলল, সায়েবকে জিজ্ঞাসা করে এস, কবে আমি আসব। মিনিট পাঁচেকের বেশী তাঁর সময় আমি নষ্ট করব না।

এবার বেয়ারা ফিরল, আরো তাড়াতাড়ি। বলল, সায়েব বলে দিলেন আর কোনদিন আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন না। দেখা হবে না।

রমলার সমস্ত শরীর জ্বালা করে উঠল। এতক্ষণ বেয়ারাটা একটু সম্ভ্রম দেখাচ্ছিল। একসময়ে রমলা এই অফিসে কাজ করত, সেই হিসাবেই। মিস্টার সেনের কথার ধরনে বোধ হয় বুঝতে

পেয়েছে সে সম্ভ্রমটুকু দেখাবার আর প্রয়োজন নেই। বেয়ারা অর্থপূর্ণ হাসি হাসছে। ভঙ্গীতেও একটা অভদ্রতা।

টেবিলের ওপর থেকে ভ্যানিটি-ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে রমলা দ্রুতপায়ে আরক্তমুখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

উপায়! মিস্টার সেনের সঙ্গে কি করে রমলা দেখা করবে। অথচ একটিবার দেখা না হলে চলবে না। এভাবে তার জীবনটা বরবাদ করে দেবার কৈফিয়ত যাচাই করতে হবে।

ছুটির পর অফিসের বাইরে অপেক্ষা করলে কেমন হয়। মিস্টার সেন যখন গাড়ীতে উঠতে যাবেন, তখন সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু না, ভিড় জমে যাবে পথের ওপর। মিস্টার সেন যে-ধরনের মানুষ, অন্তত এখন তাঁর যে পরিচয় রমলা পেয়েছে, তাতে তিনি রমলাকে অপমান করতে ছাড়বেন না। ড্রাইভারের সাহায্য নেবেন। থানা-পুলিশ করতেও ইতস্তত করবেন না।

এভাবে নয়। অন্যভাবে মিস্টার সেনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাঁর বাড়ির ঠিকানা রমলার জানা নেই। একমাত্র পথ, অফিসে ফোন করা।

দিনকয়েক ভেবে রমলা অফিসে ফোন করাই ঠিক করল। সকালের দিকে মিস্টার সেনের চেম্বারে ভিড় কম থাকে। সেই সময় হয়তো কথা বলবার অবকাশ হবে।

ঠিক সাড়ে দশটা নাগাদ রমলা ফোন করল। ম্যানেজার ছিলেন না। বাইরের উঠানে দাঁড়িয়ে বাজারের হিসাব নিচ্ছিলেন। কথা বলবার চমৎকার সুযোগ।

মিস্টার সেনের ভারি গলা শোনা গেল, হ্যালো।

আমি, আমি রমলা। দ্বিধাজড়িত গলায় রমলা বলল।

রমলা ভেবেছিল নামটা কানে যেতেই মিস্টার সেন টেলিফোন নামিয়ে রাখবেন। একটি কথাও না বলে।

কিন্তু মিস্টার সেন তা করলেন না। খুব মৃদুগলায় বললেন,

আপনার পাওনাগণ্ডা তো মিটিয়ে দিয়েছি। আবার বিরক্ত করছেন কেন?

কিসের পাওনাগণ্ডা?

অফিসের। আপনার পদত্যাগপত্র পেয়েছি। আপনার মাইনের টাকাও পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। চেকে পাঠানো হয়েছিল। সে-চেক আপনি ভাঙিয়েছেন তার প্রমাণও আমাদের কাছে রয়েছে। আর কি দরকার?

থেমে থেমে শান্ত, নিরুত্তেজ গলায় রমলা বলল, অফিসের পাওনা পেয়েছি, কিন্তু জীবনের পাওনা বাকি আছে।

এটা অফিস। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত লোক। আপনার হেঁয়ালি শোনবার মতন যথেষ্ট অবকাশ আমার নেই।

একটু একটু করে রমলা উত্তেজিত হয়ে উঠল, কেন আপনি আমার এ সর্বনাশ করলেন? কি করেছি আমি আপনার? বলুন, এখন আমি কি করব?

মিস্টার সেনের গলা কিন্তু নিরুত্তাপ, এটা আমদানি-রপ্তানির অফিস। নষ্ট মেয়েদের পথনির্দেশ করার কোন সংস্থা নয়। আমাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে বিশেষ কোন সুবিধা হবে না। আবার যদি আপনি জ্বালাতন করেন, আমি পুলিশের সাহায্য নিতে বাধ্য হব।

মিস্টার সেন টেলিফোন রেখে দিলেন।

দুটো হাত অসম্ভব কাঁপছে। আঁচলটা টেনে চোখে চাপা দেবে সে-শক্তিও নেই। বুকের স্পন্দন দ্রুততর হচ্ছে। কি করবে রমলা! উঠে দাঁড়িয়ে কি করে সিঁড়ি বেয়ে নিজের রুমে যাবে।

সব পথ রুদ্ধ। নিশ্বাস নেবার মতন বাতাসটুকুও নিঃশেষ।

মিস্টার সেন খুব পাকা লোক। কোথাও নিজের হাতের ছাপ রাখেন নি। তাঁকে জড়াবার কোন উপায় নেই। কোন চিঠিপত্র কাগজের একটি টুকরোও কোথাও নেই। এই নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু

করতে গেলে অবমাননা আর অমর্যাদার গরল পান করে রমলাকেই নীলকণ্ঠ হতে হবে। প্রতিটি মানুষ তাকে আঙুল দিয়ে দেখাবে। ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক। যারা তার বংশপরিচয় জানে, তারা আরও হৈ-চৈ করবে। ওপরতলার নোংরামি নিয়ে ফলাও করে কাগজে ছাপাবে।

সবাই জানতে পারবে। শান্তনু, শান্তনুর বাবা, ডক্টর সৌরীন ঘোষালও। মিস্টার সেনের ছায়াটুকুও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। সব কালিটুকু অকপটে রমলাকে মাখাবে।

নিজের বিছানায় রমলা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। কান্না, কান্না, কান্না। এ ছাড়া রমলার আর কোন অবলম্বন নেই। সারাটা জীবন কান্নাই হবে তার সঙ্গী। এ অশ্রু কোনদিন বুঝি বহ্নির রূপ নেবে না।

ব্যারিস্টার রাজীব রায়ের মেয়ের একমাত্র পরিচয় সে নষ্ট স্ত্রীলোক। পরিণয়ের প্রলোভন দেখিয়ে যার দেহ কুক্ষিগত করা যায়। যার সম্ভ্রমের মূল্য কয়েকটা নোট। যা দিয়ে বিলাসের উপকরণ কেনা যায়, শাকসব্‌জি তরিতরকারি কেনা যায়, তাই দিয়ে একটা কুমারীর জীবনযৌবনও কেনা যায় অনায়াসে। পৃথিবীর বাজারে রমলার দেহমনের মূল্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

এরপর, এরপর কি করবে রমলা। কোন্ পথে যাবে। মিস্টার সেন বলেছিলেন, নষ্ট মেয়েদের পথ নির্দেশ করার দায়িত্ব তাঁর নয়। তবে কার কাছে রমলা গিয়ে দাঁড়াবে! কে দেবে ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্কেত!

রমলা কোন কিছুর কুলকিনারা পায় না। অশুচি দেহ নিয়ে আবার নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করতে হবে, ভাবতেও ঘৃণায় শরীর মন বিষাক্ত হয়ে উঠল। জীবনে নতুন কাউকে বরণ করার প্রশ্ন ওঠে না। যে প্রতারণায় রমলার নিজের জীবন জর্জরিত, সেই প্রতারণার মধ্যে দিয়েই আর একজনকে কাছে টানতে হবে।

নিজের কীটদষ্ট দেহের কথা তাকে বলা চলবে না, নিজের অতীত কাহিনীর বিন্দুমাত্র নয়।

কিন্তু নিজেকে কি করে বোঝাবে রমলা। আর একজনের আলিঙ্গনে ধরা দেবার সময়, শরীর সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে না? মনে হবে না, এ পাপ, এ অন্যায়?

আবার রমলা দরখাস্ত লিখতে শুরু করল। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে। এবার আর কলকাতায় নয়, বাইরে কোথাও চাকরি খুঁজতে হবে। এই শহর থেকে অনেক দূরে। কিছু একটা না জোটালে, কতদিন এভাবে এ হোটেলে পড়ে থাকবে। ইতিমধ্যেই আশপাশের বাসিন্দারা আড়চোখে রমলার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে শুরু করেছে। সোমত্ত বয়সের একটা মেয়ে এভাবে হোটেলে পড়ে আছে, এটাই বোধহয় যথেষ্ট দৃষ্টিকটু! তবু যদি দশটা-পাঁচটা রমলা অফিস করত, তা হলেও একটা যুক্তি ছিল। আজকাল বাসা পাওয়া দুষ্কর। অনেকেই হোটেলে এসে ওঠে।

কিন্তু সারাটা দিন রমলা রুমে বসে থাকে। নীচে থেকে সকলের পড়া হয়ে গেলে, খবরের কাগজগুলো তুলে নিয়ে আসে। পাতার পর পাতা উল্টে চাকরি-খালির বিজ্ঞাপন খোঁজে। বসে বসে দরখাস্ত লেখে। বিকেলের দিকে নিজে দরখাস্তগুলো ডাকে দিয়ে আসে। তারপর উত্তরের আশায় দিন কাটায়।

একটানা, নিস্তরঙ্গ জীবন।

আশপাশের রুমের লোকেদের কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বসে বসে রমলা ভাবল। কিছুই বলা যায় না। যদি কোথাও চাকরি জুটে যায়, আবার হয়তো একই ব্যাপারের পুনর্বিন্যাস চলবে। আর এক হায়েনার মুখোমুখি পড়ে যাবে। স্তোকবাক্যে, প্রশংসায় রমলার কাছে আসার ভান করবে। তারপর কাজ মিটে গেলে, লালসার পরিতৃপ্তি হলে এমনি করে মিস্টার সেনের মতন শানিত দংষ্ট্রা দেখাবে।

তাহলে এই যে শহরে এত মেয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করছে, কি করে এরা চলাফেরা করে! মর্যাদা বাঁচিয়ে, নিজেদের বাঁচিয়ে কিভাবে দিনযাপন করে! না, শুধু বুঝি রমলার ভাগ্য-লিপিই এইরকম। তার রূপ তার কাল। তার সৌন্দর্য তার সমাধি। সুন্দরী মেয়েরও তো অভাব নেই শহরের পথে-ঘাটে। সকলের দেহেই কি রক্তলোলুপ জন্তুর থাবা, গোপনে এক লজ্জা, এক কলঙ্ক কি সবাই বহন করছে।

সব পুরুষই কি দেহলোভী? সুন্দরী রমণী দেখলেই ছলছুতো করে কাছে এগিয়ে আসে?

তাই বা কেন। রমলার শান্তনুর কথা মনে পড়ল। রমলা তার অফিসে খুবই সেজেগুজে গিয়েছিল। ভেবেছিল যেই থাক, তাকে প্রলুব্ধ করে নিজের কাজ হাসিল করবে। খুশী করবে মিস্টার সেনকে।

কিন্তু পারে নি। সামান্য একটা ক্যাটালগ, অফিসের নীতি-বিরুদ্ধ বলে শান্তনু তার হাতে তুলে দেয় নি। তার মনভোলানো সাজসজ্জা থাকা সত্ত্বেও। রমলার জীবনে শান্তনুই বুঝি একমাত্র পুরুষ, যে লোভের ঊর্ধ্বে, ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে, অভিসন্ধির ঊর্ধ্বে নিজেকে রেখেছে। শান্তনুও রমলাকে চেয়েছিল, কিন্তু সে-চাওয়ার মধ্যে পবিত্রতা ছিল, অন্যায় কিছু ছিল না।

রমলা হতভাগিনী, এমন চাওয়ার মূল্য দিতে পারে নি।

সেদিন বিকালে একটা দরখাস্ত ডাকে দিয়ে রমলা সোজা ময়দানের দিকে হাঁটতে শুরু করল। অবারিত আকাশ, বাধাহীন প্রান্তর, অফুরন্ত উন্মুক্ত বাতাসের জন্য রমলার মন হাঁপিয়ে উঠছিল। ছোট প্রকোষ্ঠে, চাপা পরিবেশে নিজেকে যেন খুব ছোট, খুব সামান্য বলে মনে হয়। নিজের দুঃখ, বেদনা যন্ত্রণা খুব বড় হয়ে দেখা দেয় মনের সামনে।

কোথাও নির্জন নয়। ময়দানের বুকে হাজার মানুষের জটলা।

রমলার মনে হল এখানে বসলেই লোকেরা ফিরে ফিরে চাইবে। বিশ্রী দৃষ্টি দিয়ে তাকে বিদ্ধ করবে। আগে কোনদিন রমলার এমন হয় নি। নির্বিবাদে যেখানে খুশী গেছে, কলেজ-জীবনে সকলের সঙ্গে কথা বলেছে, মিশেছে। তখন পৃথিবী সম্বন্ধে রমলার সম্পূর্ণ অন্য ধারণা ছিল। এখন বুঝতে পেরেছে, পৃথিবীতে ন্যায়নীতির কোন বালাই নেই। মানুষ আত্মসর্বস্ব।

একজায়গায় ছোট ছোট শিশুর মেলা। ফুটন্ত ফুলের রাশ। সঙ্গে আয়ার দল এসেছে। তারা গোল হয়ে একজায়গায় বসে গল্প করছে। মাঝে মাঝে তাড়াও দিচ্ছে শিশুদের।

ঘন একটা গাছের ছায়ায় রমলা বসল। ভ্যানিটি-ব্যাগটা কোলে নিয়ে। ছোট্ট একটা ছেলে টলতে টলতে রমলার দিকে আসছিল, বমলা হেসে তাকে হাত নেড়ে আরো কাছে আসতে বলল। ছেলেটা কি ভেবে থেমে গেল। মুখে আঙুল পুরে বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে রমলাকে দেখল, তারপব আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বমলার কোল ঘেঁষে দাঁড়াল।

রমলা দুহাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিল। ফিরিঙ্গি শিশু খিলখিল করে হেসে উঠল।

তাকে কোলে বসাতে গিয়েই রমলা চমকে উঠল। বুকের মধ্যে অসহ্য একটা যন্ত্রণা। স্নায়ুমজ্জা শিরা অবসন্ন হয়ে আসছে। না, না, পারবে না রমলা। কোন শিশুকে কাছে টানতে পারবে না। তার অধিকার নেই। আত্মজকে যে দিনের আলো দেখতে দেয় না, নিশ্বাস নিতে দেয় না পৃথিবীর বাতাসে। গোপনে একটা প্রাণ, একটা প্রত্যাশাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, নিজের পাপের জন্য দোষী করে নিজের প্রেমের পুতলীকে, তার অন্য শিশু স্পর্শ করবার কোন অধিকার নেই। মাতৃত্ব স্বর্গের পবিত্র জিনিস, পৃথিবীর মাটি-কাদা মাখিয়ে সেই অপূর্ব অনুভূতিকে কলঙ্কিত করেছে রমলা, এ রাজ্যে তার প্রবেশ নিষেধ।

ছেলেটাকে ঠেলে দিয়ে রমলা দাঁড়িয়ে উঠল। ক্ষিপ্রপায়ে রাস্তা পার হয়ে এদিকের ফুটপাথে চলে এল।

সন্ধ্যার অপূর্ব মায়া সারা নগরীতে। রং-বেরঙের নিওন-আলোয়, সুগন্ধি ফুলের মায়ায় নগরীর নটীর রূপ। জমাট-বাঁধা লোকের সার হৈ-হল্লা শুরু করেছে। তাদের পাশ কাটিয়ে রমলা জোরে পা চালাল।

কিছুদুর গিয়েই থেমে গেল। তার আঁচলে টান পড়েছে। কে যেন টানছে তার শাড়ী ধরে।

একি অসভ্যতা! ঘুরে দাঁড়িয়েই রমলা অবাক হয়ে গেল।

একেবারে গায়ের ওপর রেবা। সারা মুখে উগ্র প্রসাধন। ঢুলুঢুলু ছুটি চোখ। মদিরার সুরভিতে বাতাস মথিত।

কি রে, তুই যে চিনতেই পারিস না? প্রমোশন তো অনেকেই পায় কিন্তু কেউ তোর মতন এমন বদলে যায় না।

রমলার ভয় হল। রেবা প্রকৃতিস্থ নেই। রাস্তার ওপরেই আবোল-তাবোল কি-সব বলে বসবে। লজ্জার পরিসীমা থাকবে না রমলার।

সে বলল, চল রেবা, কোথাও গিয়ে বসি। অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

রমলার শাড়ীর আঁচল রেবা আরো শক্তমুঠিতে ধরল। বলল, চল বারে গিয়ে বসি গে। প্রাণের কথা বলবার এমন জায়গা আর পাবি না।

রমলা ঘাড় নাড়ল, না, বারে নয়। তুই তো জানিস আমি ড্রিংক করি না। ময়দানে বসবি চল।

ড্রিং করিস না? সে কি রে? প্রমোশনের পরেও না? রেবা অদ্ভুতভাবে হাসল।

রেবার সে হাসির সামনে রমলার অস্বস্তি বোধ হল। খুব আস্তে বলল, কি বলছিস রেবা, তোর কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না!

কেন, এ তো সোজা বাংলা কথা, নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে একটু ড্রিংক না করলে শরীর মন ঠিক থাকবে কেন ?

এবার রমলা একটা হাত দিয়ে রেবার হাত চেপে ধরল, এই রেবা, কি পাগলামি করছিস ?

পাগলামি করতে যাব কেন ? তা ছাড়া মাতালও হই নি। ওই ক'ফোঁটা মদে আমার কিছু হয় না। আমিও যে প্রমোশন পেয়েছিলাম কিছুদিনের জন্য। তুই গিয়েছিলি লক্ষ্ণৌ, আর আমি কাশী। তারপর ওই বড় কোয়ার্টার আর নার্সিংহোমের কাহিনী। শুধু তুই চাকরিটা ছেড়ে দিলি, আমি তা পারলাম না। আমার দিকে অনেকগুলো মুখ যে চেয়ে আছে। আমার পিছনে অনেক বড় সংসার।

রেবা, তুইও। এর বেশী আর রমলা কিছু বলতে পারল না। কান্নার স্রোতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

আমাদের কিছু করবার নেই রেবা ? রমলার গলা কেঁপে কেঁপে উঠল।

কেন করবার নেই, রেবা হাসল। ব্লাউজের ভিতর থেকে চ্যাপ্টা একটা বোতল বের করে বলল, এইতো এমন জিনিস রয়েছে ভোলবার। যখনই সব কথা মনে পড়ে, মিস্টার সেনের সামনে গিয়ে দাঁড়াই, মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে, নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করি, তখন এই বিস্মৃতির ওষুধটা গলায় ঢেলে দিই। ভিতরটা পুড়ে যায়, কিন্তু ভাই সব ভুলিয়ে দেয়। নিজের পাপ, পুণ্য, সব অনুভূতি কোথায় তলিয়ে যায়। নে, চুমুক দিয়ে নে। আমি আড়াল করে রয়েছি।

রেবার দু চোখ বেয়ে জলের ধারা। নিওন-আলোয় মনে হল অগ্নিবন্যা।

ভীষণ চীৎকার। ভারি বুটের শব্দ। একটানা পাগলা-ঘন্টি

বেজে চলেছে। কয়েদীরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে সবাই। কে পালাল। এই উত্তুঙ্গ কারাপ্রাচীর পার হয়ে বাইরের জনতার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে নিজেকে। আইনের আগল পেরিয়ে মুক্তির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে।

পাগলা-ঘন্টির বিরতি নেই। যেন সমস্ত কারাগার নিবিড় বেদনায় আর্তনাদ করে উঠছে। কে পালাল! কে পালাল!

সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল রমলার। রেবার সেদিনের বেদনার্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আজকের পাগলা-ঘন্টির আওয়াজ মিশে গেল। এক স্থর। এক বেদনা। কেউ একটা নেই। কিছু একটা নেই।

নিঃস্ব, অসহায় মৃত্যুপথযাত্রিণী রমলা নিরুদ্ধ একটা বেদনায় যেন ফেটে পড়ল। চীৎকার করে কেঁদে উঠল। একটা হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল আকাশে বাতাসে।

পাগলা ঘন্টি একভাবে বেজে চলেছে। বিরতি নেই। আইনের আগল পেরিয়ে, পাহারার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কে পালাল। এ তো মুক্তির জয়ধ্বনি নয়, সমস্ত কারাগৃহ যেন নিরুদ্ধ বেদনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তার কবল থেকে কে সরে গেল।

প্রহরীরা উন্মত্তের মতন দিগ্‌বিদিকে ছুটেছে। সঙ্গীন উঁচিয়ে সবাই চলেছে কারা-প্রাচীরের দিকে। টর্চের আলো দিনের বিভ্রম আনছে।

কেবল একজন ছাড়া। একটি প্রহরীর সর্বদা সজাগ নজর রমলার ওপর। দিনে রাতে পালা বদল করে চলে এই অতন্দ্র প্রহরা।

রমলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। কান পেতে শোনে। এক সময় কোলাহল স্তিমিত হয়ে আসে। পাগলা ঘন্টি থেমে যায়। কয়েদীর দল ফিরে এসে স্থানে স্থানে জোট বাঁধে।

কি হল? শব্দ কিসের? কাছের এক কয়েদীকে রমলা জিজ্ঞাসা করল।

সাধারণতঃ রমলা কোনো কথা বলে না। কোন কৌতূহল নেই, উদ্বেগ নয়, আবেগও না। কিন্তু আজ এ প্রশ্ন না করে রমলা পারল না। জেলের নিস্তরঙ্গ জীবনে কি করে এই উত্তাল আবর্তের সৃষ্টি হোল।

এক কয়েদী পালাবার চেষ্টা করছিল। দেয়ালে পেরেক পুঁতে পুঁতে। পারেনি ধরা পড়ে গেছে।

পারেনি? গভীর অবসাদে রমলা মাথা নাড়ল। পারেনি পালাতে? ধরা পড়ে গেছে? তাই হয়। পালানো যায় না, কেউ পালাতে পারে না। ভাগ্যের বেড়া, নিয়তির কবল থেকে কারো উদ্ধার নেই।

রমলাও নিজের অদৃষ্টলিপি মুছে, পারেনি নতুন পথের সৃষ্টি করতে। ভাগ্যকে লঙ্ঘন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। উর্ণনাভের মতন নিজের জালে আটকা পড়ে থরথর করে কেঁপেছে।

হোটেলে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরল। চেনা অচেনা গলি বেয়ে বেয়ে। হোটেলে ফেরার কথাই রমলা ভুলে গেল। সারাটা জীবন যদি এভাবে ঘোরা যেত! কোথাও একটুও না থেমে! তাহলে বুঝি সারা গায়ে এত শ্যাওলা মাখত না রমলা। পঙ্কিলতার পঙ্কে এতটা ডুবত না।

হোটেলে ঢুকেই রমলা থেমে গেল। নীচের ঘর থেকে গান বাজনার আওয়াজ আসছে।

রমলা পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই ম্যানেজারের মুখোমুখি পড়ে গেল।

মাপ করবেন, একটা কথা আছে।

আমার সঙ্গে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বলুন!

মিস্টার হাজরার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই বোধহয়? উনি এই হোটেলের বারো নম্বর রুমের বাসিন্দা। একটা অভিনয়ের আয়োজন করেছেন সেই উপলক্ষেই এই ভোজ। আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলাম, দেখলাম ঘর বন্ধ।

খুব মৃদু গলায় রমলা বলল, মাপ করবেন। আমার শরীরটা ভাল নেই। ভীষণ ক্লান্ত। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।

ম্যানেজারের পাশে কেতাদুরস্ত পোশাক-পরা একটি ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। সামনে ঝুঁকে পড়ে বললেন, একটু যদি বসতেন মিস রয়। আমাদের আয়োজন খুব সামান্য। আপনাদের মতন লোকের শুভেচ্ছাই আমাদের পাথেয়।

ইনিই বোধহয় মিস্টার হাজরা। হাবে ভাবে পোশাকে সেই রকমই মনে হচ্ছে। এ যজ্ঞের হোতা।

কেমন একটা অবিশ্বাস বাসা বেঁধেছে রমলার মনে। কোন পুরুষকে আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না। এদের মুখ নেই, কেবল নিস্পৃহ একটা মুখোস রয়েছে মুখ ঢেকে। জনে জনে সৌজন্যের অবতার। তারপর অন্তরঙ্গ হলে, কুক্ষিগত করতে পারলে, মুখোসের আবরণ খসে পড়ে। লালসার বিকৃত চেহারাটা প্রকট হয়। শান্ত নরম থাবার অন্তরাল থেকে নখের সার বের হয়।

আজ আমাকে মাপ করবেন। শরীরটা খুব খারাপ। রমলা মিস্টার হাজরার সামনে থেকে সরে সিঁড়ির ওপর পা রাখল।

মিস্টার হাজরা নাছোড়বান্দা।

বেশ কথা দিন, আমাদের রিহার্সালে আসবেন, আমরা রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় করছি। মাস খানেকের মধ্যে। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ খুব প্রয়োজন।

মুখে রমলা কিছু বলল না। ঘাড় নেড়ে ওপরে উঠে গেল। দরজা খুলে নিজের কামরায় ঢুকে বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ল।

রমলাকে দেখলে বুঝি মনে হয় অভিনয় সম্বন্ধে খুব ওয়াকিব-হাল ব্যক্তি। রিহার্স্যালে খুঁটিনাটি তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞা? নয় তো মিস্টার হাজরার এভাবে অনুনয় করার হেতু?

হেতু এক। পুরুষরা বার বার যে কারণে রমণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, কৌশলে তার সান্নিধ্য কামনা করে, তার অন্তরে প্রবেশ করার চাবিকাঠির খোঁজ করে।

রমলা মন ঠিক করে ফেলল। কাল থেকে ব্যস্ততার অভিনয় করতে হবে! সকালে খাওয়া দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়বে, ফিরবে রাতের অন্ধকারে। অফিসে অফিসে টহল দেবে। কিংবা বেলভেডিয়ারে লাইব্রেরিতে কোন বই নিয়ে সময় কাটাবে। সারাটা দিন রমলা চুপচাপ কামরায় বসে থাকে, তাই বোধহয় সবাই ভেবেছে তার অফুরন্ত সময়। রিহার্স্যালে নষ্ট করার মতন অঢেল মুহূর্ত্ত।

বিছানা থেকে উঠতে গিয়েই রমলার নজর পড়ল। ঘরের মাঝখানে মেঝের ওপর একখানা খাম।

তাড়াতাড়ি নেমে রমলা খামটা তুলে নিল। হোটেলের বেয়ারা বোধ হয় দরজার তলা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে। কার চিঠি? রমলাকে আবার কে চিঠি লিখল?

খামটা হাতে তুলে নিতেই রমলার সন্দেহ গেল। এক কোণে লেখা ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে রমলা এই অফিসেও একটা দরখাস্ত দিয়েছিল। নিশ্চয় তার দরখাস্তের উত্তর এসেছে।

দ্রুত হাতে রমলা খামটা খুলে দিল। ঠিক তাই। রমলার আবেদনের উত্তরে জানান হচ্ছে যে, আগামী বুধবার সকাল দশটা থেকে দুটোর মধ্যে তাকে এই অফিসের সহকারী ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। রমলা আসার সময়, যদি প্রয়োজন মনে করে, পুরনো প্রশংসাপত্র যেন সঙ্গে আনে।

রমলা খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

নিষ্কৃতি। জীবনের একঘেয়েমির হাত থেকে পরিত্রাণ। অন্তত সারাটা দিন আবর্তিত হবে অফিসকে কেন্দ্র করে।

পিছনের সবকিছু মুছে ফেলে আবার এগিয়ে যাওয়া।

এই বুঝি জীবন। বার বার মুহূর্ত দিয়ে মুহূর্ত মুছে আমাদের অগ্রগমন শুরু হয়। ফেলে-আসা সুখ-দুঃখ, ব্যথা বেদনা স্মৃতিমাত্র হয়ে থাকে। বর্তমানকে আঁকড়ে ধরে আমরা অতীতকে ভুলি!

এইবার, এতক্ষণ পরে রমলার মনে পড়ল বিকেল থেকে তার পেটে কিছু পড়েনি। কিছু মুখে দেওয়া দরকার। সারাটা রাত উপবাসী থাকলে দুর্বল হয়ে পড়বে।

রমলা উঠে দরজা খুলে এদিক ওদিক দেখল। এখনও নীচে গান চলছে। কেন পান্থ এ চঞ্চলতা! লোকজন সব একতলায়। বেয়ারারাও ওখানে জড় হয়েছে। এখন ডাকলেও হয়ত কারো সাড়া পাওয়া যাবে না।

তবু রমলা ঘরের কোণের বোতাম টিপল। একবার। দুবার। বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজার গোড়ায় একজন বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

ডাকলেন দিদিমণি?

হ্যাঁ, রাতের খাওয়া কিছু পাওয়া যাবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পাওয়া যাবে বৈ কি।

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল, রমলা তাকে আবার ডাকল, শোন।

বেয়ারা ফিরল।

হোটেলের কোনো খাবার আছে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি। ভোজ থেকে কিছু আনতে হবে না।

না দিদিমণি, হোটেলের আলাদা রান্নাও হয়েছে। রুম নম্বর তেইশ, ষোল, এগারো, আট এঁরা সবাই তো হোটেলের রান্নাই খেয়েছেন। ওঁদের তো ভোজে নিমন্ত্রণ হয় নি।

ঠিক আছে। আমার জন্যে তাড়তাড়ি করে কিছু নিয়ে এস। রাত অনেক হল।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে রমলা অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট। কিসের অফিস কে জানে। কারা মালিক তাও জানবার উপায় নেই। অবশ্য এতসব খবরে রমলার প্রয়োজনই বা কি? রথের চাকার কি দরকার জেনে, কে সারথী।

নীচে থেকে করুণ এক গানের আমেজ ভেসে আসছে। ক্লান্ত রাগিণী। একটি মেয়ে গাইছে। একসময়ে যখন রমলা কলেজে পড়ত তখন গান খুব ভালবাসত। নিজেও অল্প-স্বল্প গাইত। গীটারে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাজাত। অভিনয়ও করেছে।

সে-সব দিন বিস্মৃতির অতলে উধাও। দুর্যোগের মেঘভারে টলমল করছে রমলার জীবন। পদে পদে শঙ্কা, পদে পদে সঙ্কোচ। জীবন এত বিতৃষ্ণা আনে তা রমলার জানা ছিল না।

বুধবার সকালেই রমলা সাজগোজ সেরে নিল। এ চাকরি তার চাই। কোনদিন ভাবেনি জীবনটা দরখাস্তনির্ভর হবে। দশটা পাঁচটা চাকরির আশায় তৃষিত চাতকের মতন অপেক্ষায় থাকতে হবে।

ইন্‌টারভ্যুর সেই এক ইতিহাস। সামনের বেঞ্চে মেয়েদের পাল। বিচিত্র চেহারা, বিচিত্র বেশ। আড়চোখে রমলা একবার তাদের ওপর নজর বুলিয়ে নিল। চেনা জানা কেউ নেই তো! থাকলেই এখন হাজার কৈফিয়ত দিতে হবে। ব্যারিস্টার রাজীব রায়ের একমাত্র সন্তান চাকরির জন্য অফিসের চৌকাঠে মাথা ঠুকে বেড়াচ্ছে কি ব্যাপার!

একেবারে কোণের দিকে গিয়ে রমলা বসল। ডাক এল প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর।

মাঝারি কামরায় দুটি মাত্র লোক। একটি বিরাট বপু

মাড়োয়ারী। মাথায় এগারো প্যাঁচের পাগড়ী। পাশে কৃশদেহ কৃষ্ণবর্ণ মাদ্রাজী। *

রমলা ঢুকতে দুজনেই কিছুক্ষণ মুখ তুলে চেয়ে দেখল। কেন দেখল তা রমলার অজানা নয়। পথে-ঘাটে বার বার বহু মুগ্ধ দৃষ্টির মুখোমুখি হয়েছে। নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সচেতন। এই রূপই তার কাল, তাও সে খুব ভাল করে জানে।

পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করল, তারপর পূর্ব অভিজ্ঞতা। মাড়োয়ারী প্রশ্ন করল, আর উত্তরটা মাদ্রাজী দ্রুতহাতে লিখে নিল। প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে নানা প্রশ্ন। এমন কি জীবনে বিয়ে করার বাসনা আছে কিনা তাও জিজ্ঞাসা করল। প্রশ্নের উদ্দেশ্যও বুঝিয়ে বলল। চাকরি করতে করতে হঠাৎ চলে গেলে আমাদের খুবই অসুবিধা হবে।

রমলা হাসল। বলল, জন্ম মৃত্যু আর বিবাহ এই তিনটের কথা কি কেউ বলতে পারে স্যার। কখন কার বিয়ের মুকুল ফোটে কে জানে।

ঘাড় নেড়ে মাড়োয়ারী রমলার কথায় সায় দিল। ঠিক কথা। খুবই মূল্যবান কথা।

ওঠার সময় মাদ্রাজী শুধু একটা প্রশ্ন করল, আপনাকে যদি নিয়োগ-পত্র দেওয়া হয়, কবে আপনি কাজে যোগদান করতে পারেন ?

সেই দিনই। কিছু মাত্র না ভেবে রমলা উত্তর দিল।

ইন্টারভ্যুর পর রমলা বেশ একটু আশা নিয়েই ফিরল। যে ভাবে কথাবার্তা হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে চাকরিটা হয়ে যেতে পারে।

একটা একটা করে সাতদিন কেটে গেল। ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট থেকে কোন চিঠি নেই। পোস্টম্যান এলেই রমলা ছুটে বেরিয়ে যেত। দিনে চার পাঁচবার লেটার বক্স হাতড়াত, কিন্তু বৃথা।

অনেক ভেবে চিন্তে রমলা ঠিক করল একদিন গিয়ে দেখা করবে। এতে আর অন্যায়টা কি। অনেক সময়ে পোস্টের গোলমালে চিঠি ঠিক সময়ে হাতে আসে না। ঠিকানাটাই ভুল লিখল কিনা কে জানে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই রমলার নজরে পড়ে গেল। সামনেই বড় একটা টেবিলে সেই মাদ্রাজী। চারধারে কাঠের বেড়া, কেরানীকুলের সঙ্গে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করছে।

স্লিপ দিয়ে রমলা ঢুকে পড়ল।

আপনার হয় তো মনে নেই, কিছুদিন আগে আমি ইন্টারভ্যু দিয়ে গিয়েছিলাম। আপনাদের মনোনয়ন কি হয়ে গেছে?

মাদ্রাজী একবার রমলার দিকে চেয়ে, চোখে চোখ পড়তেই অন্যদিকে মুখ ফেরাল। আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ মিস্, লোক আমাদের নেওয়া হয়ে গেছে।

ওঃ হয়ে গেছে। বিরক্ত করলাম বলে কিছু মনে করবেন না।

রমলা হাতজোড় করে নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল।

একটু বসবেন দয়া করে। মাদ্রাজীটি খুব বিনয়নম্র স্বরে বলল।

রমলা আশ্চর্য হল, কিন্তু বসল।

কথাটা জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত হবে কিনা ভাবছি। খুব দ্বিধান্বিত কণ্ঠ।

আপনি অসঙ্কোচে বলুন।

এর আগে আপনি ইউনিক ইণ্ডাস্ট্রিজে কাজ করতেন?

সে কথা তো আপনাদের বলেছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বলেছেন, কিন্তু সেখান থেকে কি কোন ঝগড়া-ঝাঁটি করে চলে এসেছেন?

কেন বলুন তো?

না, মানে, আমরা মিস্টার সেনকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা

করেছিলাম, সেটা আমাদের রেওয়াজ। তিনি খুব বিশ্রী রিপোর্ট দিয়েছেন।

লিখিত ভাবে? রমলার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে এল।

না, টেলিফোনে। আমাদের ডিরেক্টারের আপনাকে নেওয়ার মত হয়েছিল, কিন্তু মিস্টার সেনের রিপোর্টটা শুনে আর সাহস করলেন না।

মিস্টার সেনের রিপোর্টের ধরনটা একটু শুনতে পাই না? আপনাকে কথা দিচ্ছি এ নিয়ে আমি কিছু করব না। আর আমরা কিই বা করতে পারি? আমাদের শক্তি কতটুকু?

মাদ্রাজী মাথা নীচু করে রইল। হাতের পেন্সিল দিয়ে প্যাডের ওপর হিজিবিজি কাটল। কোন উত্তর দিল না।

কি হল বলুন? আপনার ভয়টা কিসের?

না, এই নিয়ে আপনি আবার মিস্টার সেনের কাছে যাচাই করতে যাবেন। আমরা মুশকিলে পড়ব, কারণ তিনি খবর দিয়েছেন, সেটা গোপনীয় বলে ধরে নেওয়াই অফিসের প্রথা। আমাকে আপনি মাপ করুন।

রমলা বুঝল যেটুকু বলেছে, এর চেয়ে বেশী একটি কথাও আর বের করা যাবে না। মিস্টার সেন কি বলেছেন সেটা আন্দাজ করতে রমলার একটুও অসুবিধা হল না। মিস্টার সেনরা এই ধরনের কথাই বলে থাকেন। নইলে নিজেদের ইজ্জত বাঁচে না।

তা হলে, রমলা কি করবে! যেখানে যাবে, সেখানেই শকুনের এই দীর্ঘ ছায়াটা গিয়ে পড়বে। তার মুখের অন্ন কেড়ে নেবে। পাখার দাপটে রাজ্যের কাদা গায়ে ছিটোবে। কোথাও রমলাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না।

রোদ উপেক্ষা করে একটা পার্কে গিয়ে বসল। কি সে করতে পারে? তার কি করবার ক্ষমতা আছে। কতটুকু। মিস্টার সেনের পাপ নিজের দেহে ধারণ করেও নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে

ফেলেছে। বিপদে ফেলবার, লোকচক্ষে হেয় করবার কোন উপায় রাখেনি।

কি হয় রমলা যদি পুলিশের শরণ নেয়। নার্সিংহোমের খাতাপত্র পুলিশ নিয়ে নেয় নিজের হেপাজতে। তা হলে মিস্টার সেনকে জড়াবার কি কোন পন্থা থাকে না? নিজের নির্বুদ্ধিতায় রমলার নিজের ওপর ধিক্কার এল। পাগলের মতন কি সে আবোল-তাবোল ভাবছে। কি প্রমাণ হবে তাতে!

শুধু প্রমাণ হবে নষ্টচরিত্র এক কুমারী অযাচিত মাতৃত্বের পাপ এই নার্সিংহোমে নামিয়ে রেখেছিল এক রাত্রে। এইটুকু খবব রমলাকে গ্রেপ্তার করার পক্ষে যথেষ্ট। হয় তো নার্সিংহোমেব ডাক্তারকেও নাড়া-চাড়া দিতে পারে। কিন্তু কোন দড়ি দিয়েই মিস্টাব সেনকে বাঁধা যাবে না। তিনি নিজেকে এ সবের অনেক অনেক উর্ধ্বে রেখেছেন। হাঁসের পালকের মতন জল ছুঁয়েও জলের রেখার চিহ্ন নেই কোথাও।

এ অস্ত্রে মিস্টার সেনকে ঘায়েল করা সম্ভব নয়।

তবে পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে রমলা সারাটা জীবন বুঝি পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। ক্লান্তিতে শরীব ভেঙে এলেও দুদণ্ডের জন্য কোথাও বসতে পারবে না। মিস্টার সেন অদৃশ্য একটা চাবুক হাতে নিয়ে কেবল তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। এ অফিসে যা হয়েছে অন্য অফিসেও যে সে ব্যাপার হবে না, তাব কোন স্থিরতা নেই।

একমাত্র উপায় মিস্টার সেনের সঙ্গে সন্ধি করা। রমলার বান্ধবী রেবা যেমন করেছে। সর্বস্ব খুইয়ে নতজানু হয়ে নিজের ইজ্জত ফেরত চেয়েছে। মর্যাদা বাঁধা দিয়ে মুখের অন্ন কিনছে। কিন্তু প্রাণ গেলেও রমলা এমন কাজ করতে পারবে না।

পর পর চার জায়গায় রমলা চেষ্টা করল। একই ব্যাপার। আগে যেখানে চাকরি করেছে, সেখানকার কর্তারা রমলার সম্বন্ধে

ভাল রিপোর্ট দেয়নি। এক জায়গায় রমলা আগের অফিসের কথাটাই চেপে গিয়েছিল, কিন্তু তাতেও সুবিধা হয়নি। অনভিজ্ঞা কেরানী নেবার উৎসাহ তাদের কম।

তার মানে এ শহরে রমলার অন্ন জুটবে না। মিস্টার সেন তার জীবনের শনি। তিনি থাকতে রমলার কোন ভালো বাসা বাঁধবার আশা নেই।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে টানতে টানতে রমলা যখন হোটেলে গিয়ে পৌঁছল, তখন তার আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। ট্রামে, বাসে উঠতে পারেনি। কিছুটা পথ হেঁটে এসেছে, কিছুটা রিক্সায়।

শারীরিক ক্লান্তির চেয়েও মানসিক অবসাদ তাকে যেন আরো দুর্বল করে তুলেছে। সামনে পুঞ্জীভূত অন্ধকার, রন্ধ্রহীন। আশার জোনাকিও নেই। এই ভাবে রমলার সারাটা জীবন কাটবে? এক রাতের ভুলের খেসারত দিতে হবে একটা জীবনের পরমায়ু দিয়ে?

মনে মনে রমলা ভাবে, এমন যদি হত, তাস ভেঙ্গে আবার নতুন করে খেলা শুরু করার মতন, জীবনের ভুল-ভ্রান্তি শুধরে নিয়ে, পিছু হেঁটে হেঁটে আবার নতুন করে যাত্রা আরম্ভ করা যেত।

তা হলে রমলা খুব সাবধানে পথ চলত। পুরুষদের এড়িয়ে, লোভ আর প্রলোভনের পাশ কাটিয়ে, নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা করত।

সিঁড়িতে ওঠার আগে নীচে বেতের চেয়ারে রমলা বসল। এতগুলো ধাপ ওঠবার আগে একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

বসেই রমলা সচেতন হল, তার পাশের চেয়ার খালি নয়। একটি ভদ্রলোক বসে আছেন।

নমস্কার, মিস রয়।

মুখ না ফিরিয়েও রমলা বুঝতে পারল মিস্টার হাজরা রয়েছেন পাশের চেয়ারে। নিতান্ত সৌজন্যবশে রমলা প্রতি-নমস্কার করল।

একটা কথা ছিল মিস রয়। মিস্টার হাজরা চেয়ারটা টেনে সোজা হয়ে বসলেন।

ক্লান্ত গলায় রমলা বলল, বলুন।

আমি বড় বিপদে পড়েছি।

এতক্ষণ পরে রমলা মুখ ফিরিয়ে মিস্টার হাজরার দিকে সোজা-সুজি দেখল। বোধ হয় দৃষ্টি দিয়ে মিস্টার হাজরার বিপদের পরিমাণ জরিপ করার চেষ্টা করল। তাঁর বিপদ কি রমলার চেয়েও বেশী! রমলার মতন পরের চালের আগুন নিজের ঘরে টেনে এনেছে। সেই আগুনে শুধু তার বাড়িই নয়, নিজের মুখও পুড়িয়েছে। এখন মুখ লুকিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর উপায় নেই।

আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন। মিস্টার হাজরার কণ্ঠে অসহায় কাকুতি।

কি ব্যাপারটা বলুন তো? রমলা ভ্রূ কোঁচকাল।

আপনি বোধ হয় জানেন, আমরা 'বিসর্জন' এর মহলা দিচ্ছিলাম। আর সাতদিন বাদে আমাদের অভিনয়, হঠাৎ নর্মদার বাবা বদলি হয়ে যাচ্ছেন গৌহাটি। কাল সকালেই চলে যাবেন। তা হলে বুঝুন আমার অবস্থা। বেশ কিছু টিকেট বিক্রিও হয়ে গেছে। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। আমি কি করি বলুন তো?

আপনার কথাটা কিন্তু এখনও আমি ঠিক বুঝলাম না।

মানে, নর্মদা রানী গুণবতী সাজছিল। সে চলে গেলেই তো অন্ধকার। এই সাত দিনে আমি গুণবতী পাই কোথা থেকে? অথচ ঠিক দিনে অভিনয় না করতে পারলে, একরাশ টাকা তো নষ্ট হবেই, লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

কিন্তু আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?

আপনি সবই পারেন। দয়া করে যদি গুণবতীর রোলে অভিনয় করতে রাজী হন।

আমি অভিনয় করব ? রমলা ক্লান্তি ভুলে চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

দেখুন, আমি আপনার অভিনয় দেখেছি। প্রথম দিনই আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি।

তার মানে ?

আমি আপনাকে সব বলছি। আপনি তো স্কটিশে পড়তেন। উৎসবে, অনুষ্ঠানে অভিনয় করতেন, গীটার বাজাতেন। প্রফেসর বিজয় চক্রবর্তীর আমি খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। তার খাতিরে আমি আপনাদের সব ব্যাপারেই গিয়েছি। আপনার দেবযানী, গুণবতী আর যোগাযোগ-এ কুমু আমার অপূর্ব লেগেছে। এই সাত দিনে আপনিই পারেন আমাকে উদ্ধার করতে। দয়া করে রাজী হয়ে যান। এই বে-ইজ্জতীর হাত থেকে, অপমানের হাত থেকে আমাকে বাঁচান।

কয়েক মুহূর্ত। কয়েকটা মুহূর্ত রমলা চুপ করে রইল। মুখে রং মেখে কড়া আলোর সামনে দাঁড়িয়ে একদিন রমলা অভিনয় করেছে, এ কথা তার নিজেরই মনে নেই। সেই প্রাণোচ্ছ্বলা রমলা কবে মরে গেছে। আজ অফিসের দরজায় দরজায় ভিক্ষার ঝুলি বাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তারই প্রেত মূর্তিটা। আজও মুখে রং মাখছে রমলা, অভিনয় করছে, কিন্তু সে রং অমাবস্যাকেও লজ্জা দেয়। আর অভিনয় করছে পাগলিনীর। এক মুষ্টি অন্ন, একটু ইজ্জত ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে !

মন্দ নয়। চাকরির আশা কম। অন্তত পূর্ব-অভিজ্ঞতার খোঁজ যারা নেবে, তারা রমলাকে চাকরি দিতে পারবে না। আর একেবারে আনকোরা সাজলে আশা আরও কম।

তার চেয়ে সৌখীন নটীর জীবনই বা মন্দ কি। হাততালির সুরে বাঁধা চড়া জীবন। রং, ফুল, আলো। জীবনের অন্ধকার দিকটা নিঃশেষে মুছে যাবে।

রমলা গম্ভীর গলায় বলল, কিন্তু আমি তো বিনা পয়সায় নামতে পারব না।

কি যে বলেন, মিস্টার হাজরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, বিনা পয়সার প্রশ্নই ওঠে না। নর্মদাও তো টাকা নিয়েই অভিনয় করত। বলুন, আপনার কী দাবি।

একটু ভাবল রমলা, তারপর বলল, কাল সকালে বলব।

আঃ বাঁচালেন আমাকে। কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব। কাল সাড়ে আটটায় আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

মিস্টার হাজরা লঘুপায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন।

আবার শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এল কারা প্রাচীরের এপারে। অত উন্মাদনা, অত চীৎকার, সব শান্ত।

দেয়ালে হেলান দিয়ে রমলা ভাবতে লাগল।

একটু আগে যে কয়েদীটা পালাবার চেষ্টা করেছিল, এই কারাজীবন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াস, তার কি হল? এই মুহূর্তে সে কি করছে? নিশ্চিন্তে ধরা দিয়েছে আইনের নির্মম নাগপাশে। মনে কোন ক্ষোভ নেই? হতাশার চিহ্নমাত্রও নয়।

মানুষের শক্তি কতটুকু? অমোঘ, বিরাট একটা বিধানের কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া আর কি উপায়ান্তর আছে? নিঃশেষে নিজেকে সমর্পণ। আলোড়ন নয়। চঞ্চলতা নয়, নিজেকে ধরা দেওয়া সেই প্রবল শক্তির কাছে।

রমলাও ঠিক তাই করল। এত দিন সে নিজের পথ নিজে কেটে নেওয়ার মিথ্যা চেষ্টায় সময় নষ্ট করেছিল। দেখল, একটি পাও এগোতে পারেনি। নিয়তিকে মাঝখানে রেখে বৃত্তাকারে কেবল ঘুরেছে।

এবারে নিশ্চিন্তে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে কালপ্রবাহে। সলিল

সমাধি কিংবা তটে উত্তরণ, ভাগ্য যেটুকু দেয়, যা দেয়, তাই রমলা আঁচল পেতে নেবে।

পরের দিন বিকেলেই রিহার্সাল শুরু হল। মিস্টার হাজরার নিজের রুমে। পুরো নাম প্রদীপ হাজরা। আশা রাখেন প্রদীপ একদিন মশাল হয়ে জ্বলে উঠবে। সেই দিনের অপেক্ষায় রয়েছেন।

ভদ্রলোক অক্লান্তকর্মী। ঘণ্টা চারেক একটানা মহলা চলল, তার মধ্যে প্রদীপ হাজরা এক মুহূর্তের জন্য বসলেন না।

রমলার অভিনয় দেখে প্রশংসায় ফেটে পড়লেন। বললেন, সুপার্ব, অপূর্ব। নর্মদা অভিনয় করছিল বটে কিন্তু রানীর মর্যাদাটুকু ফোটাতে পারছিল না। বলি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিরোধ, কিন্তু তা বলে সে বিরোধ কি বস্তির কলহের আকার নেবে? চলা-ফেরায়, কথার মধ্যে একটা আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলতে হবে।

রমলা নিজেই বুঝতে পারল তার অভিনয় ভাল হচ্ছে। মনে হল, যেন সে অভিনয়ই করছে না। সত্যিকারের বিরোধ বেধেছে রাজ্যেশ্বরের সঙ্গে। যে রাজ্যেশ্বর তার হৃদয়েশ্বর।

অভিনয় করতে করতে রমলার কেমন গোলমাল হয়ে গেল। গোবিন্দমাণিক্য আর মিস্টার সেন কেবলই মিশে যেতে লাগলেন। বলি নয়, বিরোধ বেধেছে যেন সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিয়ে। গোবিন্দমাণিক্যের বেশে মিস্টার সেন রমলার সামাজিক প্রতিষ্ঠা লুপ্ত করে দিতে চান। রমলা সামাজিক মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ-পরিকর।

অভিনয়ের সঙ্গে জীবন মিশে যাচ্ছে বলেই বুঝি রমলার ভূমিকা এত প্রাণবন্ত হচ্ছে, এত বাস্তবের অনুগামী।

মহলা শেষ হতে প্রদীপ হাজরা জোড়হাতে রমলার সামনে দাঁড়ালেন। দেখুন, মানুষ চিনতে আমি ভুল করিনি। সেই কত বছর আগে আপনার অভিনয় দেখেছিলাম, এখনও ঠিক মনে আছে।

রমলা কোন কথা বলল না। চুপচাপ বসে রইল। স্বপ্নেও ভাবে নি, যা একদিন শখের বস্তু ছিল, তাই জীবন ধারণের উপাদান হয়ে উঠেছে। ব্যারিস্টার দুহিতাকে নটীর রূপ নিতে হবে।

বসে বসেই রমলা চেয়ে চেয়ে দেখল। আশপাশে আরো গোটা কয়েক মেয়ে। হাবে ভাবে ভদ্রঘরের বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু বলা যায় না। ওদেরও হয়তো রমলার মতনই দশা। অফিসের চৌকাঠে মাথা ঠুকে ঠুকে কপাল ফুলিয়েছে। এদিক ওদিক সব দিক বন্ধ! তাই নেমে নেমে এসেছে রঙ্গমঞ্চে। সমাজের দেওয়া চড়া রং ঢাকবার জন্য মুখে আরো গাঢ় রং মেখেছে। গরল পান করে অমৃত পানের কপট চেষ্টা। নিজেদের মর্মমূল পুড়িয়ে দর্শককে আনন্দ দান।

কিন্তু এই ভাল। অফিসে কাজ করার ছুতোয় নটীগিরি করার চেয়ে সোজাসুজি পাদপ্রদীপের আলোয় আত্মপ্রকাশ ঢের বেশী কাম্য। এখানে কোন ছলনা নেই, সৎ সাজার অপচেষ্টা। অন্ততঃ কাউকে দোষারোপ করার অবকাশ নেই।

নিউ এম্পায়ার ভাড়া দিয়ে নাটক নামল। প্রদীপ হাজরা করিৎকর্মা লোক। হলের জনসমাগম দেখে মনে হল টিকেট বিক্রি বেশ ভালই করেছেন। বাছা বাছা দর্শক। সোসাইটির ওপরের স্তরের সবাই।

নামবার মুখে রমলা দ্বিধাগ্রস্ত হল। দর্শকদের মধ্যে মিস্টার সেন থাকতে পারেন। কিছুই আশ্চর্য নয়। তাঁদের মতন লোকেরাই তো ঐ ধরনের অনুষ্ঠানে ভিড় করেন। সত্যিকারের নাট্য-রসিক যাঁরা তাঁরা প্রবেশ মূল্যের নাগাল পান না।

থাকুন মিস্টার সেন, তাতে রমলার কোন অসুবিধা নেই। মিস্টার সেন শুধু তাকে অস্বীকারই করেন নি, টেনে পথের ধুলোয়

নামিয়েছেন। রমলা কপর্দকহীনা, তাই যে জগতে কাঞ্চনই কৌলীন্যের নামান্তর, সেখানে সে অসহায়। সব অপমান, লাঞ্ছনা নীরবে পরিপাক করে মাথা নীচু করে চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু কিছু বলা যায় না। এই হয়তো শেষ নয়। অনবরত চাকা ঘুরছে। ওপরের মানুষ নীচে নেমে আসছে। পদদলিত যারা তারা একদিন উঠছে সম্মানের শিখরে।

রমলারও দিন সম্ভবত আসবে। তখন মিস্টার সেনের সব কিছুর বিচার হবে।

সে জন্য নয়। অন্য একটা কথা ভেবে রমলা চিন্তিত হল। সীটে বসে পাঁ নাচাতে নাচাতে মিস্টার সেন হয়তো পার্শ্ববর্তিনীকে বলবেন, রমলার মতন মেয়েদের এই পরিণতি। তিনি নিজের অফিসে চাকরি দিয়েছিলেন, ভদ্রভাবে বাঁচবার সুযোগ, কিন্তু রমলা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেনি। এ ধরনের মেয়েরা করেও না। কাদা মাখতে একেবারে নীচের তলায় গিয়ে পৌঁছায়।

দু এক মিনিট। তারপরই সব ঠিক হয়ে গেল। করতালির পর করতালি। একলা গুণবতী নয়, জয়সিংহও। প্রত্যেক দৃশ্যেই তারা সম্বর্ধিত হল। এ অনুভূতিও রমলার নতুন নয়। কলেজে থাকতে বহু গুণমুগ্ধ দর্শক জুটেছিল। অভিনয়ের শেষে তারা ঘিরে দাঁড়াত রমলাকে। অনেক দিন ধরে ক্লাশে ক্লাশে প্রশংসার গুঞ্জন চলত।

আজও অনেকটা তাই। অভিনয়ের শেষে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিরাট এক ফুলের তোড়া নিয়ে স্টেজে ঢুকলেন। প্রদীপ হাজরা পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ইনি আমাদের প্রেসিডেন্ট কে. ডি. সোম। ব্যারিস্টার।

রমলা মুখের রং তুলছিল সেই অবস্থাতেই এসে দাঁড়াল। হাতজোড় করে।

অপূর্ব তোমার অভিনয়। তুমি আমার মেয়ের বয়সী, তোমাকে আর আপনি বলব না। আশা করি কিছু মনে করবে না।

রমলা বিব্রত হল। সেকি কথা। আমি সত্যিই আপনার মেয়ের সমান।

খুব চমৎকার লাগল মা। শুধু তোমার সংলাপ নয়। তোমার চলাফেরা সবই খুব চরিত্রোপযোগী। যাকে বলে, ম্যাজেস্টিক। ত্রিপুরার রানীর উপযুক্ত।

মিস্টার সোম কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে প্রদীপের দিকে ফিরে বললেন, কই এ মেয়েটিকে তো আগে তোমাদের দলে দেখিনি। কয়েক মাস আগে যখন 'শেষরক্ষা' অভিনয় করলে, তখনও তো এ ছিল না।

না, মিস রয় এই প্রথম আমাদের দলের সঙ্গে অভিনয় করলেন। তবে ওঁর অভিনয় ওঁর কলেজে আমি আগে দেখেছি। স্কটিশচার্চ কলেজে। আপনি বোধ হয় মিস রয়ের বাবাকে চিনতে পারবেন।

ওর বাবাকে? কি নাম বল তো?

ব্যারিস্টার রাজীব রায়। রমলা বলার আগেই প্রদীপ হাজরা বললেন।

আমাদের রাজীব রায়ের মেয়ে তুমি? মিস্টার সোম বিস্ময়ে ভ্রূ দুটো তুললেন, আহা বড় স্যাড ডেথ। খুব নাম করছিল রাজীব। এমন কিছু বুড়ো হয়নি। হঠাৎ স্ট্রোকে মারা গেল।

জিভটা তালুতে ঠেকিয়ে সোম সহানুভূতিসূচক শব্দ করলেন।

রমলা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

তোমাদের বালিগঞ্জের বাড়িতেই আছ তো? আমি অবশ্য ঠিকানা জানি না। রাজীব আমাকে কয়েকবার যেতে বলেছিল। আমিও ওই দিকেই থাকি। চল তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।

রমলা খুব মৃদুকণ্ঠে বলল, আমি আর ওখানে নেই।

রমলার হাবেভাবে কণ্ঠস্বরে মনেই হয় না, এই মেয়েটি একটু

আগে আসর মাতিয়ে রেখেছিল। ঝড়-লাগা ঝাউপাতার মতন তার সর্বদেহ এখন কাঁপছে।

প্রদীপ হাজরা এগিয়ে এলেন। বললেন, মিস রয় আমাদের হোটেলেই থাকেন।

ওঃ, মিস্টার সোম একবার প্রদীপ হাজরার দিকে আর একবাব রমলার দিকে চেয়ে দেখলেন। কি মনে করলেন কে জানে। হয়তো ভাবলেন, ব্যারিস্টার রাজীব বায়ের মেয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে হোটেলে থাকে কেন? তাও আবার প্রদীপ হাজবার সঙ্গে এক হোটেলে। বলা যায় না, প্রদীপেব সঙ্গে রমলার সম্পর্কের একটা সূত্র আবিষ্কার করার জন্যই হয়তো বার বার দৃষ্টি বোলালেন দুজনের সর্বাঙ্গে।

আচ্ছা চলি আমি। এই ফুলের তোড়াটা রেখে গেলাম। প্রত্যেক বার শ্রেষ্ঠ অভিনয়েব জন্য আমি একটা কবে ফুলেব তোড়া দিই। এবার এটা তোমার প্রাপ্য।

নামতে নামতে মিস্টার সোম প্রদীপের দিকে চোখ ফেরালেন, সুযোগ সুবিধামত রমলাকে নিয়ে একদিন আমাদের বাড়ি যেও প্রদীপ। কোন এক ছুটির দিন হলেই ভাল হয়। আমাকে ফোন করে যেও।

প্রদীপ হাজরা ঘাড় নাড়লেন।

মিস্টার সোম সাবধানে নেমে বাইরে চলে গেলেন।

একটা বড় স্টেশনওয়াগনে সকলে ফিরল। রমলা ছাড়া সকলেই যে যার বাড়িতে থাকে। তাদের সকলকে নামিয়ে গাড়ী হোটেলে এল।

দরজায় ম্যানেজার অপেক্ষা করছিলেন। রমলা নামতেই তিনি এগিয়ে ফুলের তোড়াটা হাতে নিলেন। বেয়ারাকে ডেকে বললেন, রমলার ঘরে দিয়ে আসতে।

রমলার দিকে চেয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ম্যানেজার বললেন, খুব

চমৎকার হয়েছিল আপনার পার্ট। যেমন মানিয়েছিল, তেমনি কথা বলার ভঙ্গী।

কিছু একটা বলা উচিত, এই ভাবেই রমলা বলল, সে কি, হোটেল ছেড়ে আপনিও গিয়েছিলেন থিয়েটারে?

ম্যানেজার হাসলেন, বিকেলটা ছুটি নিয়েছিলাম। আমি মিস্টার হাজরার সব অভিনয়েই গেছি।

তারপর গলাটা খাদে নামিয়ে ম্যানেজার বললেন, আপনার জন্য কি এক কাপ গরম দুধ ওপরে পাঠিয়ে দেব?

না, না, আমার আজ রাত্রে আর কিছু দরকার হবে না।

প্রদীপ হাজরা রমলার পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে উঠল। দরজা পর্যন্ত গিয়ে বলল, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না, মিস রয়। অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। কাল এক সময়ে বলব।

এই ধরনের কথা শুনলেই রমলা চমকে ওঠে। এ যেন দেহের দুয়ারে সিঁধকাটা। কথার ফুলঝুরি জ্বালিয়ে অন্তর্লোক দেখার চেষ্টা। ঠিক এই ভাবে সাবধানী বিড়ালের মতন পা ফেলে ফেলে পুরুষ অগ্রসর হয়; অতর্কিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের অবস্থা। আর ঠকবে না রমলা। জীবনে সঞ্চয়ের ঘর শূন্য। অপবাদের কোঠা ভরে উঠেছে। দেহের কোষে কোষে আর অবাঞ্ছিত ময়লা জমতে দেবে না।

কোন কথা না বলে রমলা চাবিটা বেয়ারার হাত থেকে নিয়ে তালাটা খুলল। বাতি জ্বালল। বেয়ারাটা বেরিয়ে গেল।

রমলা উঠে দরজায় খিল দিয়ে দিল। পোশাক ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎ মুখ তুলেই থেমে গেল।

সামনের ড্রেসিং টেবিলের দর্পণে কোমর পর্যন্ত প্রতিচ্ছায়া। মুখের রং এখনও সম্পূর্ণ রমলা ওঠাতে পারে নি। দু-গালে লালচে আভাস। চোখের কোণে কাজলের রেশ। রক্তিম অধর।

চেয়ে চেয়ে রমলার আর সাধ মেটে না। দলিত, অবহেলিত সত্তা নয়, রমলা যেন রাজেন্দ্রানীর মহিমায় সমুজ্জ্বল।

অনেকক্ষণ পরে রমলা উঠে দাঁড়াল। রাত অনেক হয়েছে, কিন্তু ঘুম আসছে না। মুখের রং তুলতে ইচ্ছা করছে না। পোশাক বদলাতেও না। রং মুছে গেলে আটপৌরে শাড়ী জড়ালে আবার সেই অভাগিনী রমলার রূপ প্রকট হয়ে উঠবে। যে রমলা শ্যাওলার মতন এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে শুধু ভেসে বেড়াচ্ছে। রাজ্যের কাদা মেখে।

কিন্তু সারারাত তো আর এ ভাবে বসে থাকা যায় না। রমলা আস্তে আস্তে বাথরুমে ঢুকল।

বেরোল প্রায় এক ঘণ্টা পর। বাইরে ঝড় উঠেছে! জানালাগুলো খোলাই ছিল। ঘরের পর্দা বেপরোয়া ভাবে উড়ছে।

বিছানার কাছে গিয়েই রমলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

উদ্দাম হাওয়ায় ফুলের তোড়া থেকে ফুলের পাপড়ি খসে সারা বিছানায় ছড়িয়ে পড়েছে। রজনীগন্ধা, জুঁই আর গোলাপ।

এ বিছানায় রমলা কি করে শোবে। ঝড়ের রাত তার জন্য এমন ফুলশয্যা রচনা করে রাখবে তা সে কল্পনাও করেনি।

হাত দিয়ে পাপড়িগুলো রমলা মেঝের ওপর ফেলে দিল। তার জীবনে কোনদিন ফুলশয্যার রাত আসবে না। সে সৌভাগ্য অর্জন করার যোগ্যতা সে হারিয়েছে। নিজের ভুলে। যৌবনের অন্ধ কামনায়।

রমলার যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা অনেক। রোদ বিছানার ওপর এসে পড়েছে।

চোখে আলো পড়তেই রমলা ধড়মড় করে উঠে বসল। রাত্রে জানালাগুলো বন্ধ করার কথা মনেও হয়নি। সম্ভবত রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগও বেড়েছে। ফুলের তোড়াটা ড্রেসিং

টেবিলের ওপর থেকে মেঝের ওপর পড়েছে। সারা ঘরে ছিন্ন ফুলের রাশ।

রমলা উঠে পড়ল। ফুল মাড়িয়ে মাড়িয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল। দরজার বাইরে বেয়ারা বেড-টি রেখে গেছে।

প্রদীপ হাজরা এলেন অনেক পরে।

রমলা বিছানার ওপর চুপচাপ বসেছিল। পর্দার ওপার থেকে প্রদীপ হাজরা বললেন, আসতে পারি, মিস রয়!

রমলা হাত দিয়ে অগোছাল শাড়ীটা ঠিক করে নিয়ে বলল, আসুন।

প্রদীপ হাজরা ভিতরে এলেন। হাতে ফাইল।

তবু ভাল। একটু আগে কামরাটা পরিষ্কার করে গেছে। নয় তো সারা মেঝেতে ফুলের পাপড়ি পড়ে থাকলে ভদ্রলোক মনে করতেন কি।

শরীর ভাল তো? প্রদীপ হাজরা একটা চেয়ার টেনে বসলেন। হেসে বললেন, আজকের কাগজ দেখেছেন?

না, এখনও নীচে নামিনি।

সব কাগজেই আপনার জয় জয়কার। আমি ভাবছি কাগজগুলো আর আপনাকে দেখাবো না।

কেন, বলুন তো?

দেখলে আর আপনি দরিদ্র হাজরার দলে পড়ে থাকবেন না। চারদিক থেকে ডাক আসতে আরম্ভ হবে, দেখুন না।

অন্য সময় হলে এ ধরনের রসিকতা রমলা বরদাস্ত করত, এমন ভরসা কম। কিন্তু আজ সব কিছু যেন ভাল লাগছে। নতুন রূপ নিয়েছে পুরোনো বিবর্ণ পৃথিবী। এতদিন রমলা ঘৃণার পাত্রী ছিল, প্রবঞ্চনা আর প্রতারণার লক্ষ্য। আজ চাকা ঘুরেছে। লোকে স্তুতিবাদ শুরু করেছে। এ স্তুতিবাদ তার দেহকে কেন্দ্র করে নয়, তার সৌন্দর্যের জন্যও নয়, এ প্রশংসা তার অভিনয় শক্তির জন্য।

এতদিন পথে-ঘাটে বাহবা পেয়েছে তার যৌবন, কলেজ ছাড়ার পরে এই প্রথম প্রশংসা পেল তার বিশেষ কোন গুণ।

একটা কথা ছিল মিস রয়। আমি ভাবছি কোন একটা হল ভাড়া নিয়ে আমরা রীতিমত অভিনয় করব। সপ্তাহে একবার। তার জন্য আপনার সাহায্য দরকার।

আমার সাহায্য?

হ্যাঁ, সাহায্য আর সহানুভূতি। আমার সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করতে হবে। এর মধ্যে আপনি আর কোথাও যেতে পারবেন না। অবশ্য আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও নিশ্চয় আমি দেখব। কথা দিন।

আমাকে আপনি অন্তত তিনটে দিন ভাবতে দিন।

তিনটে দিন?

হ্যাঁ, নিজের গলায় নিজে ফাঁস পরাবার আগে অন্তত তিনটে দিন চিন্তা করা দরকার বই কি। খুব বেশী সময় চেয়েছি কি?

কি ভেবে রমলা কথাটা বলেছিল, আজ এতদিন পরে তাব সেটা মনে নেই। কিন্তু নিজের গলায় ফাঁস পরার উপমাটা কেন সে বলেছিল, আরো সহস্র রকমের উপমা থাকতে?

একদিন ফাঁসির রজ্জু গলায় চেপে বসবে এমন একটা সম্ভাবনাব ইঙ্গিত বহন করেছিল সে-দিনের বাণী? অবচেতন মনে ভবিষ্যতের ছায়াপাত হয়েছিল?

জানে না, রমলা, কিছু জানে না। কিন্তু অবতরণের সেই বুঝি শুরু। প্রশংসা আর স্তুতির ধাপ বেয়ে বেয়ে নরকে পদক্ষেপ। দেউলে শরীর আর রিক্ত মনকে পসবা করে নতুন ব্যবসার পত্তন।

গোটা তিনেক বই পর পর অভিনীত হল। রমলা শুধু নায়িকা নয়, পরিচালিকাও। ভূমিকা বণ্টন থেকে শুরু করে অভিনয়ের খুঁটিনাটি সব কিছু তাকে দেখতে হত। এর জন্য পারিশ্রমিকের মাত্রাও কিছু বেড়েছিল।

কিছুদিন পর অল্পবয়সী এক যুবককে প্রদীপ হাজরা ধরে নিয়ে এলেন।

আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই রমলা দেবী।

রমলা বসে বসে একটা হালকা নভেল পড়ছিল, প্রদীপ হাজরার কথায় বই মুড়ে উঠে বসল।

শ্যামবর্ণ চেহারা কিন্তু চোখ মুখের ডৌলটি চমৎকার। বিশেষ করে ঠোঁটের বঙ্কিম ভঙ্গী। বয়সে রমলার চেয়ে বছর কয়েকের ছোটই হবে। রমলার মনে হল ঘরের মধ্যে যেন জলভরা শ্রাবণের একখণ্ড মেঘ এসে ঢুকল। কমনীয় কান্তি, ভীরু স্বভাব।

কে ইনি? রমলা তুটো চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে বলল।

অরুণ রায়। নাট্যকার।

রমলা ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবল। ইদানীং অভিনয়ে নামার পর থেকে তু একটি নতুন নাটক পড়তে শুরু করেছে। আধুনিক ধাবার। কিন্তু অরুণ রায়ের নামটা শুনেছে বলে মনে করতে পারল না।

অরুণ রীতিমত অপ্রস্তুত হল। মেঝের দিকে চেয়ে মৃতুকণ্ঠে বলল, কেন লজ্জা দিচ্ছেন প্রদীপদা। আড়াইখানা নাটক সম্বল করে কি আর নাট্যকার হওয়া যায়!

আড়াইখানা? রমলা বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, শেষ নাটকটা মাত্র অর্ধেকটা লেখা হয়েছে। তাও নাটক তুটোই পাণ্ডুলিপি, একটাও ছাপানো হয় নি।

প্রদীপ চেয়ারে চেপে বসে বললেন, হোক পাণ্ডুলিপি, লেখার এমন জোর আমি দেখিনি। তুমি লিখে যাও অরুণ, আমি তোমার বই মঞ্চস্থ করব। রমলা দেবীকে একদিন একটা বই শোনাও। তোমার "রঙের খেলা" বইটা নিয়ে এস একদিন।

অরুণ বোধ হয় সমর্থনের আশায় রমলার দিকে চোখ ফেরাল।

রমলা হাসল, বেশ তো নিয়ে আসবেন একদিন। আমি অবশ্য নাটকের ভালমন্দ কিছুই বুঝি না।

অরুণ বাধা দিল, একি আপনি আপনি করছেন কেন? আমাকে 'তুমি' বলে ডাকবেন। আমি আপনাকে দিদি বলব।

রমলা বিস্মিত হল। দিদি! দিদি বলে ডাকবে অরুণ। পুরুষজাতটাকে দেখে দেখে রমলার ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল গোটা জাতটার ওপর। সবার মুখে এক সুর। প্রকাশ্যে এমন ভাব দেখায় যেন নারী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু একান্তে পেলেই নিজ মূর্তি ধরে। লালসার উগ্র চেহারা নিস্পৃহতার আবরণ সরিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু তারা তো কেউ দিদি বলে সম্বোধন করেনি। বলেছে মিস রয়। রমলা দেবী কিংবা কোন সম্বোধনই নয়।

রমলার আপন ভাই নেই, বোন নেই। কেউ কখন তাকে দিদি বলে ডেকেছে এমন মনে করতে পারল না। কিন্তু এই ডাকের জন্য অন্তরের অন্দরে কোথায় একটা তৃষ্ণা লুকানো ছিল।

বেশ, সে অরুণের দিদিই হবে। অরুণ তার ছোট ভাই। পুরুষের সঙ্গে এই নতুন পরিচয়ের পরমায়ু কতদিন থাকে, তাই সে দেখবে।

বেশ তো, আমি তোমাকে অরুণ বলে ডাকব, তুমি দিদি বল।

অরুণ সলজ্জ হাসি ফোটাল মুখে।

প্রদীপ হাজরা কিন্তু ছাড়লেন না। অরুণের পিঠ চাপড়ে বললেন, ব্রাভো অরুণ, প্রথমদিনেই কেল্লা মাৎ। হিরোইনের সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললে।

অরুণ প্রদীপ হাজরার কথায় কোন উত্তর দিল না। রমলার দিকে ফিরে বলল, আজ আসি দিদি, সামনের রবিবার আসব বই নিয়ে।

তুমি আর কি কর অরুণ, এ-দেশে শুধু লিখে তো পেট চলে না। বিশেষ করে শুধু নাটক লিখে?

আমি একটা মাড়োয়ারীর গদীতে হিসেব লিখি দিদি। পাটের হিসাব।

বিয়ে থা করনি বুঝি?

না দিদি, পাটের হিসেবই লিখি, পাটরানী আনার মুরোদ হয় নি।

রমলা হাসল। অরুণ বেরিয়ে যেতে প্রদীপ হাজরা চেয়ার টেনে রমলার কাছে বসলেন।

জানেন মিস রয়, এটি আমার আবিষ্কার। এর লেখা একটা বই এক শৌখীন দল করেছিল। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। বইটা ভাল লাগতে নাট্যকারের সঙ্গে আলাপ করে ফেললাম। সেই থেকে অরুণ প্রায়ই আমার কাছে আসা-যাওয়া করে। আমাদের 'বিসর্জন' অভিনয়ের সময় ও ছিল না এখানে। আমার নিজেব খুব ইচ্ছা ওব একটা বই নামাবার। অবশ্য যদি আপনার পছন্দ হয়।

রমলা কোন উত্তর দিল না। বসে বসে প্রদীপ হাজরাকে লক্ষ্য করল। এই একটি পুরুষকে এখনও সে ভাল করে চিনে উঠতে পারেনি। মাঝে মাঝে মনে হয় আত্মভোলা লোক। দুনিয়ায় অভিনয় ছাড়া আর কিছু বোঝে না। প্রদীপ হাজরার কাছে রমলা তাঁর নাটকের সাফল্যের একটা উপাদান মাত্র। তার বেশী নয়। রমলার সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী কৌতূহলও কোনদিন প্রদীপ হাজরা দেখান নি।

তবে জোর করে কিছু বলা যায় না। দারুণ শীতে বিষধর কুণ্ডলী পাকিয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। তখন মনে হয় তার ফণা নেই, বিষ নেই। শান্ত, নিরীহ জীব। কিন্তু গ্রীষ্মের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ ভুজঙ্গম রুদ্র মূর্তি ধরে। আওতার মধ্যে যাকে পায়, তাকে ছোবলে ছোবলে রক্তাক্ত করে তোলে।

পুরুষজাতও ঠিক তেমনি। যতক্ষণ সুযোগ না পায় ভাল-মানুষীর ভান করে। নিজেকে বিশ্বাসের পাত্র করে তোলে। তারপর একদিন দু'টো চোখ লালসায় রঙীন হয়ে ওঠে, ইন্দ্রিয়ের বেগে সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপে। ছদ্মবেশ খুলে পড়ে যায়।

একদিন ঠিক এমনি ভাবেই হয় তো প্রদীপ হাজরাও জেগে উঠবেন। তার আগে রমলাকে সাবধান হতে হবে। অতর্কিতে কেউ না আক্রমণ করে।

জয়ন্ত ঘোষালকে রমলা খুব কাছ থেকে দেখেছে। তার হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন করে জয়ন্ত দূরে সরে গিয়েছে। রমলার সে নির্বুদ্ধিতার প্রতিকার বুঝি কোনদিন হবে না। তারপর আদিত্য-বাবু লোভের হাত বাড়িয়ে ধারে কাছে ঘোরাঘুরি করেছিলেন, সুবিধা করতে পারেন নি। সবশেষে চরম সর্বনাশ করলেন মিস্টার সেন। সে কথা ভাবতে গেলে রমলার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কামড়াতে ইচ্ছা করে। কোন উপায় নেই। অপমানের কালি মেখে অন্ধকার বিবরে আত্মগোপন করা ছাড়া রমলার আর গত্যন্তর নেই।

'রঙের খেলা' বইটা আমার মনে হয় আপনার ভালই লাগবে। আমার তো লেগেছে। একটি বড় ঘরের মেয়ে ধাপে ধাপে কি ভাবে নরকের অন্ধকারে নেমে এল, তারই কাহিনী।

অ্যাঁ, রমলা আচমকা চেঁচিয়ে উঠল। সব যেন তার গোলমাল হয়ে গেল। কার কথা প্রদীপ হাজরা বলছেন? কোন্ মেয়ে নেমে এল পঙ্কিলতার গহ্বরে? কার জীবন নিয়ে নিয়তি চরম পরিহাস করল?

আপনি অন্য কিছু ভাবছিলেন বোধ হয়, প্রদীপ হাজরা মনে করিয়ে দিলেন, আমি অরুণের 'রঙের খেলা' বইটার কথা বল-ছিলাম। গল্পটা হচ্ছে—

থাক, থাক, রমলা বাধা দিল, এখন কাহিনীটি বলবেন না, তাহলে রবিবার শুনতে ভাল লাগবে না।

প্রদীপ হাজরা থামতে রমলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। নীচে নামার কাহিনী আর সে শুনতে পারে না। এমন কোন চারণ কবি নেই এ দেশে, যে অধঃপতিত মেয়েদের বন্দনা গান গায়। তাদের উন্নীত করতে সাহায্য করে!

*

রবিবার বিকেলে অরুণ এল। বগলে বই। পিছনে প্রদীপ হাজরা।

বিকেলের গা ধোয়া শেষ করে, রমলা প্রসাধন করছিল, বাইরে থেকে অরুণ ডাকল, দিদি।

যাই ভাই। চুলটা ঠিক করে রমলা উঠে দাঁড়াল। কি জানি কি মোহ আছে এই সম্বোধনে, অরুণের কণ্ঠস্বরে রমলা নিজের অতীত ভুলে যায়। বিস্মৃত হয় নিজের পদস্খলনের ইতিহাস।

তিনজন গোল হয়ে বসল। অরুণ আর প্রদীপ হাজরা চেয়ারে। রমলা বিছানার এক ধারে।

অরুণ পড়তে শুরু করল। ভারি চমৎকার কণ্ঠস্বর। মনে হল অভিনয় সম্বন্ধেও বেশ বোধ আছে। রমলা তন্ময় হয়ে শুনল। একবার শুধু মাঝখানে বেয়ারার হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে সামনে রেখেছিল। কে কত চামচ চিনি খাবে, সেটা জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিল।

শেষ হল রাত নটায়।

বই বন্ধ করে অরুণ বলল, কেমন লাগল দিদি বলুন?

রমলা প্রদীপ হাজরার দিকে আঙুল দেখাল, প্রদীপবাবুকে জিজ্ঞাসা কর।

প্রদীপ হাজরা হাসলেন, আমি তো বহুবার আমার মত দিয়েছি অরুণকে। নতুন করে আর কি বলব।

অরুণ রমলার দিকে ফিরল, দিদি, তবে আপনি বলুন।

ছোট ভাইয়ের লেখা আমার তো ভাল লাগবেই।

না, না, দিদি, আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। অরুণ সবেগে ঘাড় নাড়ল।

অরুণের ধরন দেখে রমলা হেসে ফেলল, না ভাই, ভালই লেগেছে। সত্যিই ভাল লেগেছে, কেবল একটা কথা।

বলুন ?

মেয়েটাকে আত্মহত্যা করালে কেন ভাই ? ওকে শোধবাবার, ভাল করার আর কি কোন পথ ছিল না ? মরে যাওয়াটা তো খুব সাধারণ ব্যাপার। এ যেন কোন অঙ্গে ব্রণ হলে অঙ্গচ্ছেদ করা। এতো সমস্যার সমাধান হল না ভাই। ব্রণটা নির্দোষে সারানো যায় কিনা, সেই ব্যবস্থা করা উচিত।

কিন্তু ও মেয়ের বেঁচে থেকে লাভ ? সমাজ তো ওকে নেবে না। সংসার চাইবে না। অরুণ একবার শেষ চেষ্টা করল।

রমলা থমথমে গলায় বলল, এমন সমাজ গড়ে তোল ভাই, যে সমাজে ওরকম অভাগীর স্থান হয়। এমন সংসার সৃষ্টি কর, যে সংসার পাপীকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফেরাবে না। সবাই যদি দূরে সরে থাকে, তবে অবাঞ্ছিতকে কে কাছে টানবে! তাকে সংশোধন করার ভার কে নেবে! ধুলো কাদা মুছিয়ে বুকে টেনে নেবার মানুষ তৈরি কর।

অরুণ মুখ তুলে অবাক হয়ে গেল। প্রদীপ হাজরা সবিস্ময়ে দেখলেন, রমলার দু চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। আঁচল দিয়ে সে জলধারা মোছার রমলা কোন চেষ্টা করছে না।

আপনি কাঁদছেন দিদি ? অরুণ আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল।

এতক্ষণে বুঝি রমলার খেয়াল হল। ক্ষিপ্রহাতে চোখের জল মুছে বলল, আমরা শক্তিহীন, চোখের জল ফেলা ছাড়া আমরা আর কি করতে পারি, ভাই।

অরুণ ব্যাপারটা কিছু বুঝতেই পারল না। অনেক ভাবল, তার কি কোথাও কোন অন্যায় হয়ে গেছে? শুধু একটা নাটকের বিষয়বস্তু কাউকে এতটা বিচলিত করতে পারে, তা অরুণ ধারণাও করতে পারে নি।

সত্যি ভাই অরুণ, তোমার নাটকটা আমার খুবই ভাল লেগেছে। কেবল আমার মনে হয়েছে শেষ দিকটা একটু বদলানো দরকার। শুধু ভেঙে পড়ার কাহিনী কেন, একটা মেয়েকেও অন্তত মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে দাও। পঙ্কেই শেষ কেন, পঙ্কজার রূপও ফোটাও।

ঠিক আছে দিদি, অরুণ খাতাটা কোলের ওপর তুলে নিল, সামনের রবিবার শেষের কয়েকটা দৃশ্য বদলে আনব।

শোন, শোন, রমলা বলল, আমি বলছি বলেই বদলে এনো না যেন। তুমি যদি নিজে বোঝ বদলানো দরকার, তবেই পরিবর্তন করবে, বুঝলে?

বদলানো দরকার তা আমি খুব বুঝেছি দিদি। অরুণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

বুঝেছ?

হ্যাঁ, যে বই শুনে দিদির চোখের জল পড়ে, সে বই বদলাতে হবে বৈকি।

কথাটা বলেই অরুণ হেসে উঠল, কিন্তু রমলা হাসতে পারল না। নির্নিমেষনেত্রে অরুণের দিকে চেয়ে রইল।

মাসখানেকের মধ্যেই বইটা সকলের সামনে পড়া হল। রমলারই নির্দেশ। শুধু পড়াই নয়, কিছু কিছু ভূমিকা বণ্টনও হল। প্রদীপ হাজরা নিজে সে ভার নিলেন।

শেষ দিকটা অরুণ অনেকখানি বদলেছিল। অভাগিনী মেয়েটা নার্সের জীবন গ্রহণ করল। অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ। এই জীবিকার মধ্যে নতুন করে বাঁচবার সঙ্কেত পেল, নতুন জীবনের শান্তিমন্ত্র।

পরের দিন থেকেই মহলা শুরু হল। অরুণের আক্ষেপের অন্ত নেই।

রমলাকে বলল, আমি চাকরি ছেড়ে দিই দিদি। আপনারা রিহার্স্যাল দেবেন, আর আমি বড়বাজারে বসে কলম পিষবো? পাট আর বস্তার হিসাব করবো?

রমলা হাসল, চাকরিটা এখনই ছেড়ো না ভাই। তোমার আরো দু একখানা বই মঞ্চস্থ হক। পেশাদার রঙ্গমঞ্চ নিক তোমার খানকয়েক বই, তখন চাকরি ছাড়লেই হবে। তুমি রবিবার রবিবার আসতে পার। একটু আগেই এস। এক সঙ্গে চা খাব। তারপর রিহার্স্যালে বসব।

অরুণ রাজী। বেশ তাই হবে। রবিবার প্রাণভরে মহলা দেখব।

যত কথা সব রবিবার। অরুণ বলত, রমলা শুনত, কিংবা রমলা জিজ্ঞাসা করত, উত্তর দিত অরুণ।

তুমি যে রবিবার এত রাত করে যাও, বাড়িতে কিছু বলে না অরুণ। চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে রমলা প্রশ্ন করল।

অরুণ হেসেই খুন। আমাকে আবার কে কি বলবে? আমার আছে কে? এক উকিলের বাইরের ঘরে শুয়ে থাকি। গ্রাম সুবাদে আত্মীয়তার সম্পর্কে।

তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?

না দিদি। মা গেছে যখন আমার বয়স আট। বয়স যখন পনরো, বাপকে হারিয়েছি। এক বুড়ী দিদিমা বুকে করে মানুষ করেছে। গাঁয়ের স্কুলের মাস্টারি করেছি, স্টেশনে স্টেশনে ওষুধ ফেরি করেছি, তারপর ঘুরতে ঘুরতে এই শহরের পাঁকে এসে আটকেছি দিদি। দিনের বেলা পরের হিসাব লিখি, আর রাতের বেলা নিজের হিসাব মেলাই।

নিজের হিসাব?

মানে, লিখি। নাটকের পর নাটক লিখে চলেছি। আমার একদিন নাম হবে না দিদি?

হবে বৈ কি, ভাই। একদিন তুমি এ দেশের সেরা নাট্যকার হবে। নিজে গরল পান করে তুমি সকলকে অমৃত পরিবেশন করছ। তোমার মৃত্যু নেই। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছি অরুণ।

কি দিদি?

তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের অদ্ভুত মিল। আমিও তোমার মত খুব ছোট বেলায় মাকে হারিয়েছি। বাবাকে হারিয়েছি অবশ্য অনেক পরে। তারপর একটার পর একটা দুর্ঘটনা গুঁড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে আমাকে। বাড়ি ঘর সব গেল, একজায়গায় চাকরি করতাম, তাও বরাতে টিঁকল না। এখন মুখে রং মেখে, চড়া আলোর সামনে পরের লেখা সংলাপ বলছি। নিজের দুঃখ-বেদনা ঢেকে, হাসি-কান্নার অভিনয় করছি।

জানেন দিদি, আপনার কথা মনে হলেই আমার মনের সামনে অপূর্ব এক ছবি ভেসে ওঠে।

কি ছবি ভাই?

পরণে লালপাড় শাড়ী, সীমন্তে সিঁদুর, হাতে প্রদীপ। আঁচল আড়াল দিয়ে সাবধানে এগিয়ে চলেছেন তুলসী মঞ্চের দিকে। আপনি এমন একটা ছবি হতে পারেন না দিদি?

কথাটা রমলা বুঝল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বুকের দ্রুত স্পন্দন প্রশমিত করার চেষ্টা করল। কি করে সে অরুণকে বোঝাবে এমন একটা ছবির ওপর তারও লোভ কম ছিল না। ওভাবে তুলসী মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাওয়া হয় তো নয়। কিন্তু ঠিক ওই রকম কালো ঘন চুলের মাঝখানে সিঁদুরের রেখা। হাতে শঙ্খবলয়। মনের মানুষকে নিয়ে মনের মতন সংসার পেতে বসা।

কিছুক্ষণ পরে রমলা বলল, সংসার পাতবার লোভ আমারও কম ছিল না ভাই, কিন্তু জানো তো, এ জিনিস একজনের ইচ্ছায় গড়ে তোলা যায় না। প্রথম জীবনে যার কাছে গিয়েছিলাম, তার থেকে শুধু বঞ্চনাই পেলাম। তারপর পুরুজাতটার ওপরই ঘৃণা জন্মে গেল। মনে মনে ভাবলাম আজীবন কুমারী থাকব।

অরুণ আর কিছু বলল না। বোধ হয় বলবার মতন কিছু সে খুঁজেও পায় নি। তবে এটুকু রমলার চোখ এড়াল না। ব্যথায় অরুণের মুখটা করুণ হয়ে উঠেছে, রমলার মনের ব্যথাব ছোঁয়াচ লেগে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। কারা প্রাচীরে অন্তরালে অদৃশ্য। পশ্চিমদিগন্তে শুধু মেঘের ওপর রংয়ের ছটা। নানা রং। লাল, কমলা, হলুদ, জাফরানী, জরদ। এত রং আছে পৃথিবীতে। অথচ বমলার সারা-জীবন শুধু একটা রংয়েই স্পর্শ পেয়েছে। নিকষ কালো রং।

কয়েদীরা সাব বেঁধে ফিরে চলেছে। সাবা দিনের কাজ শেষ। এবারে যে যার কোটবে ঢুকবে। নিশ্চিন্ত নিদ্রায় একরাশ মানুষ যেন একবাশ শব হয়ে যাবে। কিংবা সবাই শব হবে না। প্রহরের পর প্রহর ছটফট করবে। অতীত জীবনের বিকৃত, বীভৎস সব ছবি মনের পটে ভেসে উঠবে। তাদের চোখ বন্ধ করতে দেবে না।

ঠিক যেমন রমলার হয়েছে। দিনের বেলা তবু একরকম। রাত হলেই রমলা একলা। একলা ঠিক নয়, কারাপ্রাচীরের ওপারের জীবন রমলার সামনে এসে দাঁড়ায়। সারা জীবনের বোঝা নিয়ে। হিসাব-নিকাশ করে কি পেয়েছে আর কি পায়নি তার চুলচেরা বিশ্লেষণ।

রমলা চেষ্টা করেছিল। ভালভাবে বাঁচবার, জীবনটা সূর্যমুখী

করে তোলবার কম আগ্রহ তার ছিল না। কিন্তু পারে নি। যতবার আবর্জনা থেকে মাথা তুলে উঁচু হয়ে দাঁড়াবার প্রয়াস করেছে, এক অদৃশ্য শক্তি তাকে টেনে নামিয়েছে পঙ্কের মধ্যে। কাদা ছিটিয়ে ছিটিয়ে সারা শরীর কলঙ্কিত করেছে। কি করবে রমলা !

আজ এতদিন পরে তার কলুষিত দেহটা টেনে এনে চরম শান্তির অপেক্ষায় এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। এ দেহ রমলার নিজের নয়। এটা সমাজেরই বিকৃত গলিত শব। যে সমাজ শক্তিমানের বিরুদ্ধে, অর্থবানের বিরুদ্ধে, একটি আঙুল তুলেও আপত্তি জানাতে পারে না।

•

কলেজ জীবনে অভিনয় করতাম, স্বপ্নেও ভাবিনি, সেদিনের নেশা আজকের পেশা হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু একদিন তো বিতৃষ্ণা আসবে দিদি। শুধু রং মেখে, দর্শকদের হাততালি কুড়িয়ে মেয়েদের জীবন কি চলে, বিশেষ করে আপনার মত মেয়ে যাঁর রক্তে ঘর বাঁধবার নেশা ?

জানি না ভাই। ক্লান্তি এখনও আসেনি। এখনও অবসন্ন হইনি। এ পর্যন্ত মন্দ লাগছে না। হৈ-চৈ-এর মধ্যে দিয়ে দিনগুলো তো কেটে যাচ্ছে।

মহলার সময় হতে তুজনেই উঠে পড়ল। প্রদীপ হাজরা অপেক্ষা করছিলেন। দলের সবাই ছিল। আরো কয়েকটি মেয়ে আছে। তু একজন অফিসে কাজ করে, অফিসের পরে বাড়তি রোজগারের আশায় এ দলে ভিড়েছে। আবার তু একজন মনেপ্রাণে অভিনেত্রী। সারাটা দিন স্টুডিয়ো মহলে ঘোরে ছুটকো-ছাটকা পার্টের আশায়। কখনও পায়, কখনও পায় না। অবসর সময়টুকু শখের থিয়েটারের দলে এসে জোটে।

এ বইতে রমলা নায়িকা। নায়িকা জীবনের সঙ্গে রমলার

ছন্নছাড়া জীবনের কোথায় মিল আছে। ঠিক একই প্রবঞ্চনা আর নিগ্রহের কাহিনী। ফুটিয়ে তুলতে তাই বুঝি রমলার কোন অসুবিধা হল না।

প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে নিজের অভিনয়ের পরে রমলা অরুণের পাশে গিয়ে বসে বলল, ঠিক হচ্ছে তো অরুণ? তোমার কল্পনা রূপ পাচ্ছে?

আর লজ্জা দেবেন না দিদি, অরুণ মাথা নীচু করে বলেছে, আমি ভাবছি আমার আঁকা চরিত্রের সঙ্গে আপনি নিজেকে মিশিয়ে ফেললেন কি করে। দুঃখের জায়গাগুলোয় আপনার অভিনয়ের তুলনা নেই।

দিনের পর দিন মহলা চলল। এ বইতে রমলা প্রাণ দিয়ে খাটতে শুরু করল। শুধু নিজের জন্য নয়, অরুণের জন্যও। বই যদি উতরে যায়, তা হলে নাট্যকার হিসাবে অরুণের খ্যাতি হবে। শৌখীন দলে তার নাটকের চাহিদা বাড়বে। হয়তো নাটক ছাপাবার প্রকাশকও ছুটে যেতে পারে।

তাছাড়াও রমলা শুধু নায়িকা নয়, পরিচালিকাও। অন্য সকলের ভূমিকাও দেখে দিতে হয়। ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে দেয়।

কয়েক দিন পরেই ব্যাপারটা ঘটল।

চা পান শেষ করে রমলা বসে বসে খবরের কাগজটা ওলটা-চ্ছিল। হঠাৎ একটা খবর নজরে পড়তেই চমকে ওঠল। অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরোল ঠোঁট দিয়ে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। শরীরটা রীতিমত অসুস্থ হয়ে উঠল।

খবরের কাগজটা সরিয়ে রেখে কিছুক্ষণ রমলা চুপচাপ বসে রইল। ভাবতে লাগল নিজের মনে। এমন একটা সংবাদে তো রমলার উল্লসিত হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কেন তার দু চোখে

জল ভরে এল? তার ধারণা ছিল, সম্পর্কের শেষ সূত্রটাই ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু অলক্ষ্যে কোথায় একটা যোগসূত্র বুঝি আজও রয়ে গেছে।

মিস্টার সেন নেই। ইউনিক ইণ্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টার। উল্কার মতন রমলার জীবনে যিনি এসে, তার সুখ শান্তি ভবিষ্যৎ সব ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। তিনি মারা গেছেন মোটর দুর্ঘটনায়। পাশে একটি মেয়ে ছিল। সেও আহত হয়ে হাসপাতালে। মেয়েটি হয়তো আর এক রমলা। সুখের হাতছানিতে ভুলে কিংবা চাকরির উন্নতির আশায় ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে সঙ্গ দান করছিল।

রমলা চোখে আঁচলচাপা দিয়ে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল।

চোখের জল মুছতে মুছতেই মনে পড়ল, সেদিন রবিবার। দুপুর বেলাই অরুণ এসে হাজির হবে। তার সামনে চোখের জল ফেললে নিস্তার নেই। প্রশ্নবাণে অতিষ্ঠ করে তুলবে।

রমলা নিজেকে বোঝাল। এ এক রকম ভালই হল। পথে-ঘাটে আচমকা দেখা হয়ে যাওয়ার কোন আশঙ্কা রইল না। তাছাড়া এবার শান্তনু বোসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও মুখ লুকিয়ে পালিয়ে যাবার দরকার হবে না। মিস্টার সেনই যখন নেই তখন তাঁর ঘরনী হবার প্রশ্ন আর উঠবে না। সরে গিয়ে মিস্টার সেন রমলাকে মুক্তি দিয়ে গিয়েছেন।

তবু যত খুশী, যত উচ্ছল হওয়া উচিত, ততটা উৎফুল্ল রমলা হতে পারল না। এ কেনর উত্তরও রমলার অজানা নয়। কিন্তু স্মৃতির এ-অর্কিডের সঙ্গে মনের মাটির বুঝি আর কোন যোগাযোগ নেই। মিস্টার সেনের স্বরূপ জানতে পারার পর থেকে রমলা প্রাণপণে মুছতে চেষ্টা করেছে সে রাতের কাহিনী।

অরুণ আসবার অনেক আগেই রমলা নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। ইজিচেয়ারে একটা বই হাতে করে শুয়ে পড়েছে। পড়ার ভান করেছে কিন্তু মন দরজার দিকে। অরুণকে সত্যিই

রমলার খুব ভাল লেগেছে। রুক্ষ ধূ ধূ মরুভূর প্রান্তে নিবিড় খর্জুরকুঞ্জের শীতলতার মতন। অবিশ্বাসী, লম্পট পুরুষের পালের মধ্যে এমন স্নিগ্ধ সম্বোধন, এমন সংবেদনশীল মন নিয়ে আর কেউ রমলার সামনে আসে নি।

রমলার জীবনে শান্তি, হোক তা ক্ষণেকের এই অরুণই এনে দিয়েছে।

দরজায় সাবধানী করাঘাত, তারপব রমলার অনুমতি পেয়ে আস্তে আস্তে অরুণ ভিতরে ঢুকল।

আর দিন পনরো, দিদি।

কিসের ভাই ?

কেন, আমার নাটক মঞ্চস্থ হবার।

তুমি বুঝি দিন গুনছ ?

গুনব না ? জীবনে বলতে গেলে প্রথম আমার নাটক মঞ্চস্থ হবে। এযে নাট্যকারের পক্ষে কতখানি তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না দিদি। আর একবার হয়েছিল, কিন্তু সে নিতান্ত বাজে দল।

যতদিন এগিয়ে আসছে, আমার কিন্তু ভাই তত ভয় করছে।

ভয় করছে, কেন ?

তোমার বইটা নায়িকা-প্রধান। সব কিছু নির্ভর করবে আমার ওপর। আমি যদি তলিয়ে যাই, তো গোটা নাটক ডুববে। তুমি তা হলে আমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না।

না দিদি, আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। দুঃখের পার্ট আপনি চমৎকার ফোটাতে পারেন।

দুঃখ যে আমার নিত্য সঙ্গী ভাই, তাই বোধ হয়। একটার পর একটা বেদনার ঢেউ আসছে, আর আমি মাথা পেতে দিচ্ছি সেই উত্তাল তরঙ্গের সামনে। আজ আবার দেখবে আমার পার্ট আরও খুলবে।

আরো খুলবে? তার মানে? আজ আবার নতুন করে কি দুঃখ পেলেন?

নিজের অগোচরে অরুণের কাছে রমলা ধরা পড়ে যাচ্ছিল, সামলে নিল। তাড়াতাড়ি বলল, না ভাই নতুন করে দুঃখ পেয়ে আর দরকার নেই। পুরোনোর টাল সামলাতেই প্রাণান্ত হচ্ছে। যাক গে, তুমি নতুন আর কি লিখছ বল?

আর একটা নাটক আরম্ভ করেছি দিদি।

তাই নাকি! বাঃ কিন্তু এতে দুঃখের মিশেল একটু কমিয়ে দিও ভাই। একটু আনন্দের ছিটে দিও, খুশীর ঝিলিক।

অরুণ হাসল, আনন্দের খবর আমি কোথা থেকে পাব দিদি। আমার জীবনের কাহিনী তো শুনিয়েছি আপনাকে। বাইরের সব জানলা দরজা বন্ধ। আনন্দের রশ্মিও আসে না, খুশীর বন্যাও নয়।

আনন্দের টুকরো কারো কাছ থেকে না হয় ধার কর অরুণ।

ধার করব? কার কাছ থেকে?

আমাদের ওপর ভার দাও তো চেষ্টা করে দেখি। আনন্দের পশরা বয়ে আনবে এমন কাউকে টেনে আনি তোমার পাশে।

এতক্ষণ পরে অরুণ বুঝল। লজ্জায় লাল হয়ে বলল, যান আপনার কেবল ঠাট্টা। বলে নিজের থাকবার, খাবার সংস্থান নেই, আর একজনকে টেনে আনব।

চিরদিন এমন থাকবে না অরুণ। তুমি খুব বড় হবে। চারদিকে তোমার জয় জয়কার। মঞ্চে মঞ্চে তোমার বইয়ের অভিনয় হবে, রুপোলী পর্দায় তোমার কাহিনীর প্রতিচ্ছায়া, তোমাকে ঘিরে স্তাবকের দল গুঞ্জন করবে।

সত্যি দিদি? আনন্দে উৎসাহে ছোট্ট ছেলের মতন অরুণের দুটো চোখ চকচক করে উঠল।

দেখে দেখে রমলার আশা যেন মিটল না। পৃথিবীতে কেবল নরকের ছায়াই দেখে এসেছে। হিংস্র ভয়াল পশুর সার। আজ

অনেকদিন পরে দেখল এক টুকরো স্বর্গের ছবি। একটি শিশুর মুখ। অনাবিল আনন্দ।

কিছুক্ষণ আগে শোকের যে বেগ রমলার হৃদয়তন্ত্রীতে মোচড় দিচ্ছিল সেটা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হল।

থিয়েটারের দিন অরুণ ছুটি নিল। সকালেই হোটেলে চলে এল। রমলার সঙ্গে সঙ্গে রইল।

আজকে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে দিদি।

তোমার আনন্দ হচ্ছে, আমার ভয়ে বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। রমলা ভয় পাওয়ার ভান করল।

ভয়ে বুক শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?

আগাগোড়া তো সবটাই আমার পার্ট। একটু খারাপ হলে দর্শকরা হয়তো কিছু বলবে না কিন্তু তুমি ক্ষমা করবে না তা জানি।

আহা কি যে বলেন। সেদিনও আপনি এই কথা বলেছিলেন। দেখবেন। আপনি তারিফ পাবেন সবচেয়ে বেশী।

সত্যিই তাই। প্রত্যেকটি দৃশ্যে, রমলাকে দেখে দর্শক যেন পাগল হয়ে গেল। আর রমলাও প্রাণ ঢেলে অভিনয় করল। নিখুঁত অভিব্যক্তি, জড়তাহীন সংলাপ।

প্রদীপ হাজরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বার বার রমলার পাশে এসে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন। এমন প্রাণবন্ত অভিনয় তিনি জীবনে আর দেখেননি। রমলা নিজের পুরোনো কীর্তিকেও ম্লান করে দিয়েছে।

যবনিকা পড়তে রমলা একটা চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিল। ক্লান্তি আর পরিশ্রান্তিতে শরীর অবসন্ন। বেশ কয়েকজন ভিড় করে এল তার কাছে। অকুণ্ঠ প্রশংসার বাণী অস্পষ্টভাবে কানে এল। অনেকগুলো মালা আর তোড়া সামনের টেবিলে জড়ো হল। রমলা এত সম্বর্ধনার উত্তরে একটি কথাও বলতে পারল না।

একটু পরে অরুণ এসে দাঁড়াল।

দিদি, মেক-আপটা তুলে নিন। রাত হয়েছে।

রমলা ক্লান্ত দুটি চোখ তার দিকে ফেরাল। আর পারছি না ভাই। এই ভাবেই চলে যাব। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আমার যাবার বন্দোবস্ত কর।

যাবার বন্দোবস্ত করাই ছিল। প্রদীপ হাজরা গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। অরুণ ফুলের মালা আর তোড়াগুলো গাড়ীতে তুলে দিল।

রমলা টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। এত পরিশ্রান্ত কোনদিন মনে হয়নি। শুধু পরিশ্রান্ত নয়, আশ্চর্য ধরনের এক রিক্ততা। রমলার মনে হল দর্শকসাধারণের সামনে অভিনয় নয়, নিজের অন্তরঙ্গ কাহিনীই উন্মোচিত হল দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে।

গাড়ীতে উঠতে গিয়েই রমলা দাঁড়িয়ে পড়ল। কে একজন এগিয়ে আসছে।

রমলাদেবী! পরিচিত কণ্ঠস্বর।

কে? রমলা ঘুরে দাঁড়াল।

আমি। অভিনয় শেষ হবার পরই আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম খুব ভিড়।

আপনি? আপনি এসেছেন অভিনয় দেখতে? রমলার সমস্ত ক্লান্তি, দৌর্বল্য দূর হয়ে গেল।

কেন, অভিনয় দেখাটা কি দোষের! অভিনয় দেখাও যেমন দোষের নয়, অভিনয় করাও তেমনি নয়। অবশ্য যদি সত্যিকারের ভাল নাটক হয়।

আজকের নাটক কেমন লাগল বলুন?

ভাল, কিন্তু তার চেয়েও ভাল আপনার অভিনয়। আপনি এত চমৎকার অভিনয় করতে পারেন, তা আমার জানা ছিল না।

আমার সম্বন্ধে কতটুকু বা আপনি জানেন। রমলা হাসল। শান্তনুর দিকে চেয়ে। কোন খবরই তো রাখেন না।

রাখি বই কি। জানি আপনি ইউনিক ইণ্ডাস্ট্রীজ ছেড়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া আর একটা দুঃসংবাদও কাগজে পড়েছি। আমি খুব দুঃখিত সে সংবাদে। আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই।

পলকের জন্য রমলা একটু অসুবিধায় পড়ল। দু গালে কৃত্রিম রংয়ের রূপ। সেই রং ভেদ করে লজ্জার লালিমাটুকু ফুটলেও শান্তনু বোসের দেখতে পাবার কথা নয়। মিস্টার সেন মারা গিয়ে অন্তত একটা লজ্জার হাত থেকে রমলাকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

কথাটা পালটাবার জন্যই বলল, আপনি একলা কেন? মিসেস বোস কোথায়?

আসে নি।

আসেন নি, না আনেন নি সঙ্গে? রমলা হাসাব চেষ্টা করল।

যা বলেন। সিনেমা থিয়েটার দেখতে খুব ভালবাসে না। ঠাকুর-দেবতা পূজোঅর্চনা নিয়েই আছে।

বাঃ তাহলে তো আপনার যোগ্য সহধর্মিনী। রমলা পারল না, চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের খোঁচাটুকু এড়াতে।

শান্তনু কিন্তু কথাটা গায়ে মাখল না। বলল, বিশ্বাস করুন। এত ভাল অভিনয় আমি কোনদিন দেখিনি।

রাত বাড়ছে, পাশে দাঁড়ানো অরুণ একবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

কথাটা শান্তনুর কানে গেল। সে তাড়াতাড়ি একটু সরে গিয়ে বলল, মাপ করবেন, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে। একদিন যাবো আপনার কাছে।

রমলা আশ্চর্য হয়ে গেল। সেই শান্তনু, যে জার্মানী থেকে ফিরে এসে আসন পেতে মা-বাপের ফটো সামনে রেখে পূজা করতে

বসত। তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলামেশা দেখে যে শিউরে উঠত। আধুনিক সব কিছুই যার কাছে নীতিবিরুদ্ধ। এই সেদিনও যে রমলার হাতে অফিসের একটা ক্যাটালগও তুলে দেয় নি, অফিসের কানুন-বহির্ভূত বলে।

তবু রমলা বলল, বেশ তো যাবেন। আমি কিন্তু একটা হোটেলে থাকি। রমলা হোটেলের নাম আর ঠিকানাটা বলল।

মোটরে ওঠার মুখে ঘুরে বলল, মিসেস বোসকে সঙ্গে আনলে ভারি খুশী হব।

শান্তনু কোন কথা বলল না। ফুটপাথে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একদৃষ্টে রমলার দিকে চেয়ে।

এই প্রথম রমলা শান্তনুকে ঠিক বুঝতে পারল না। প্রকাশ্য মঞ্চে রমলা অভিনয় শুরু করেছে। পুরুষদের সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশায় তার কোথাও কোন অসুবিধা নেই। থাকে এক হোটেলে।

তবু শান্তনু এগিয়ে এসেছে তার অভিনয়ের তারিফ করতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলেছে। হোটেলের ঠিকানা নিয়েছে। আসবার ইচ্ছাও জানিয়েছে। শান্তনু এত বদলাল কি করে!

এক গাড়ীতে প্রদীপ হাজরা অরুণ আর রমলা। পথে অরুণকে নামিয়ে দেওয়া হবে।

অরুণই প্রথম কথা বলল, ভদ্রলোকটি কে দিদি?

আমার বাবার বন্ধুর ছেলে।

ভারি চমৎকার দেখতে ভদ্রলোককে। অরুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

শিক্ষা দীক্ষা আরও চমৎকার। জার্মান ফেরত ইঞ্জিনীয়ার। ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট। চাকরিও করেন খুব বড়। এলায়েড এনটার-প্রাইজের টেকনিকাল ডিরেক্টার।

হ্যাঁ, চাকরি খুব বড় করেন বলেই মনে হল।

কি করে বুঝলে?

বাঃ পরনে কি দামী পোশাক। আর ঝকঝকে নতুন মোটরে গিয়ে উঠলেন যে।

রমলা কোন উত্তর দিল না। অরুণের শেষ কথাগুলো তার কানেও যায়নি। মোটরের সামনে টাঙানো দর্পণে চোখ পড়েছে।

অপরূপ লাবণ্যময়ী এক নারীর প্রতিচ্ছবি। রাণীর মহিমায় সে মুখ ভাস্বর। রমলা যা হতে চেয়েছিল এ বুঝি তারই আলেখ্য।

সে রাতে অনেকবার শান্তনুর কথা রমলার মনে এল। অভিনয়ের শেষে শান্তনু যদি পুষ্পস্তবক এনে দাঁড়াত রমলার কাছে, রমলা দু হাত পেতে সে দান গ্রহণ করত। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরত সে স্তবক। শান্তনুর স্বীকৃতিটুকু সগৌরবে বহন করে আনত।

মনে মনে রমলা ঠিক করল, শান্তনু যদি না আসে তাকে বমলা টেলিফোন করবে। আমন্ত্রণ জানাবে শান্তনু আর তার স্ত্রীকে। শান্তনুর চেয়ে শান্তনুর স্ত্রীকে দেখার সাধ রমলার বেশী। গার্গী খনা মৈত্রেয়ীর সগোত্রা এই নারীরত্নটিকে দেখে একবার জীবন সফল করবে।

পরের দিন সকালে প্রদীপ হাজরা খবর আনলেন। রমলা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল, প্রদীপ হাজরা ঘরে এসে ঢুকলেন।

আর এক কাপ চা আনতে বলি মিস্টার হাজরা?

না, না, প্রদীপ হাজরা হাত নাড়লেন, আমি এখনই বেরিয়ে যাব। আপনাকে শুধু একটা কথা বলতে এসেছি।

কি বলুন?

আজ সকালেই বৈশাখী সঙ্ঘ ফোন করেছিল। তাদের ইচ্ছা বইটা এই রবিবার আবার আমরা মঞ্চস্থ করি। সব খরচ তাদের। তা ছাড়াও থোক টাকা তারা আমাদের দেবে। লোভটা সামলাতে পারলাম না। আপনাকে না জানিয়েই সম্মতি দিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু এই রবিবার! শরীরটা কাল থেকে আমার খুব খারাপ যাচ্ছে।

এখনও তো হাতে বেশ কয়েক দিন সময় আছে। পুরো বিশ্রাম করে নিন। তাছাড়া শেখানোর খাটুনিটা তো আর নেই। আপনি অরাজী হবেন না মিস রয়, তাহলে অথৈ জলে পড়ব।

রমলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বেশ তাই হবে, তবে এক শর্তে।

শর্ত বলুন?

আমি এর মধ্যে আর রিহার্স্যাল দিতে পারব না। দরকার হয় শনিবার সকালে একবার শুধু স্টেজ রিহার্স্যাল দেবঁ।

ব্যস, ব্যস তাই যথেষ্ট। বললাম যে, আপনার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। You rest on your laurels.

প্রদীপ হাজরা হাসতে হাসতে উঠে গেলেন।

রমলা চুপচাপ চোখ বুঝে শুয়ে রইল।

এতদিন পরে কি বুঝতে পেরেছে শান্তনু বোস। বুঝতে পেরেছে যে কালের বিরুদ্ধে চলা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মন নিয়ে এ যুগে বাস করা অসম্ভব।

তাই ধীরে ধীরে তার মন বদলাচ্ছে। তার দৃষ্টিতে বুঝি সেই পরিবর্তনেরই ছায়া।

সত্যিই কি আসবে শান্তনু? রমলার আমন্ত্রণ রক্ষা করবে? পুরোনো সব কথা ভুলে, রমলার সব অপরাধ ক্ষমা করে বন্ধুর বেশ ধরে এসে দাঁড়াবে।

আর শান্তনুকে অন্য কোন ভাবে পাবার আশা রমলা করে না। সে সত্যিই বন্ধু ভাবেই আসুক। অমন একজন দৃঢ়চেতা সংযতচরিত্র মানুষের আজ রমলার খুবই প্রয়োজন। বিপদে তাকে পথ দেখাবে। অসতর্ক মুহূর্তে সাবধান করে দেবে, অন্যায় দেখলে জ্বলে উঠবে।

এই বিড়ম্বিত জীবনে শান্তনু পরম নির্ভর।

বিকেলের দিকে অরুণ এল। হাত ভরতি জিনিস।

রমলা অবাক।

কি ব্যাপার অরুণ, নিজের বিয়ের বাজার করছ নাকি?

আপনার এক কথা দিদি। অরুণ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

তবে কি?

অরুণ জিনিসগুলো টেবিলের ওপর রেখে বসল।

কাল প্রদীপদা টাকা দিলেন কিনা।

কিসের টাকা?

ওই নাটকটার জন্য। কত পেয়েছি জানেন দিদি?

তুমি না বললে কি করে জানবো ভাই?

অরুণ হাতের দুটো আঙুল দেখাল, দুশো টাকা, জানেন একটা নাটকের জন্য দুশো টাকা। কম না কি, বলুন? আমি তো জীবনে কল্পনাই করতে পারি নি।

অরুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

শোন তুমি আরো দুশো টাকা পাবে।

আরো দুশো টাকা?

হ্যাঁ, তোমার বই সামনের রবিবারে আবার হচ্ছে যে।

সামনের রবিবারে? কারা করছে?

আমরাই করব। তবে আমার যা শরীরের অবস্থা, আমাকে বাদ দিলেই ভাল হয়।

তা হলে যারা দেখতে আসবে তারা পর্দা জ্বালিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

বল কি অরুণ?

হ্যাঁ দিদি, সত্যিই তাই। কাল শেষের কটা দৃশ্য আমি সারা অডিটোরিয়ম ঘুরে ঘুরে দেখেছি। সকলের মুখেই আপনার তারিফ।

কেউ কেউ আবার বলল, আপনি সিনেমায় নামলে নাকি খুব নাম করতে পারবেন।

তুমি কি বল অরুণ?

না দিদি, আমি চাই না আপনি সিনেমায় নামুন। আপনি যে থিয়েটার করেন, তাও আমার পছন্দ নয়।

তবে কি তোমার পছন্দ, অরুণ?

সেই যে সেদিন বলেছিলাম, লালপাড় শাড়ী, শাঁখা আর সিঁদুর। একেবারে গৃহলক্ষ্মী। মাঝে মাঝে আমি আপনাদের ছোট্ট সংসারে এসে ঢেউ তুলে যাব। কোথাও আমার নাটক হলে আপনাদের দুজনকে ধরে নিয়ে যাব।

রমলা তন্ময় হয়ে শুনল। আশ যেন আর মেটে না। নাট্যকার অরুণ তার হাতের কলম দিয়ে পারে না এমনি এক স্বর্গ রচনা করতে যেখানে রমলা শুধু বধূ? আর তার অন্য পরিচয় থাকবে না।

নিশ্বাস ফেলতে গিয়েই রমলা থেমে গেল। অরুণ হেঁট হয়ে কাগজের মোড়কগুলো খুলছে।

ওসব আবার কি অরুণ?

অরুণ কোন কথা বলল না। মোড়ক খুলে লাল পাড় শাড়ী বের করে রমলার কোলে ফেলে দিল।

বুঝতে পেরেও রমলা বলল, একি?

খাবারের বাক্সটাও অরুণ রমলার হাতে তুলে দিল। তারপর হাসতে হাসতে বলল: সব টাকাটাই আপনার পাওনা। আপনি না বললে প্রদীপদা আমার নাটকটা নিতেন না। তা ছাড়া আপনার প্রতিভার ছোঁয়ায় আমার নাটককে আপনি জাতে উঠিয়েছেন।

বা, তুমি তো বেশ কথা বলতে শিখেছ অরুণ। কিন্তু এ সব আনতে গেলে কেন আমার জন্য। শুধু একটাকার মিষ্টি নিয়ে এলেই আমি খুব খুশী হতাম।

তাহলে আসল কথাটা বলব দিদি ?

ও বাবা, আবার আসল কথা আছে বুঝি ?

অরুণ হাসল, সামনের মাসের পনরো তারিখে ভাইফোঁটা। আমার খুব ইচ্ছা, আপনি এই শাড়িটা পরে আমার কপালে ফোঁটা দেবেন। কাঁটা পড়বে যমের দরজায়।

আর পারল না রমলা। দু চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

তাই হবে অরুণ। ওই দিন ভোরবেলা তুমি চলে আসবে এখানে। সারাটা দিন ভাইবোনে হৈ হৈ করব।

অরুণ নীচু হয়ে রমলার পায়ের ধুলো নিল। রমলা বাধা দিতে গিয়েও কি ভেবে দিল না।

অনেক ভেবে চিন্তে রমলা শনিবার শান্তনুকে ফোন করল।

রমলা আশা করেছিল সে রাত্রের দেখার পরে দু-তিন দিনের মধ্যেই শান্তনু আসবে দেখা করতে। অন্ততঃ তার ঠিকানা নেওয়ার আগ্রহ দেখে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু শান্তনু এল না।

একবার মনে করিয়ে দেওয়াটা আর দোষের কি। আর কিছু নয়, মানুষের শরীরের অসুখবিসুখ তো আছে। এমনও হতে পারে শান্তনু অসুস্থ। সে খোঁজ নেওয়া রমলার নিশ্চয় উচিত।

ফোন শান্তনু ধরল। গম্ভীর গলা, শান্তনু বোস কথা বলছি।

আমি, আমি রমলা।

রমলা ভেবেছিল তার নাম শুনলেই শান্তনু উৎফুল্ল হয়ে উঠবে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর যেন আরো খাদে নামল।

বলুন।

খুব কোমল গলায় রমলা বলল, আপনি একদিন আমার ওখানে আসবেন বলেছিলেন।

দৃঢ় সংযত গলায় শান্তনু উত্তর দিল, আপনি আমার সে রাতের

উচ্ছ্বাস মার্জনা করবেন। আপনার অভিনয় আমার খুব ভাল লেগেছিল, সাময়িক একটু বিভ্রান্তি হয়ে থাকবে।

এত কথা এসব কথা কেন বলছে শান্তনু? সাময়িক বিভ্রান্তির প্রসঙ্গ কেন তুলছে?

রমলা সেই কথাই বলল, বিভ্রান্তির কথা কেন বলছেন?

বিভ্রান্তি বই কি। নাহলে কোন অভিনেত্রীর অভিনয় ভাল লেগেছে বলে তার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করতে হবে কেন? সেখানে সেতো সামাজিক জীব। আমরা দর্শকরা তাদের রঙ্গমঞ্চের জীবন-টুকুই গ্রহণ করব। তার বেশী কিছু চাইতে গেলেই ঠকতে হবে।

বুকের মধ্যে তীব্র এক যন্ত্রণা! মুখটা বিকৃত করল। টেলি-ফোনের হাতলধরা হাতটা ঠক ঠক করে কাঁপছে। কিছু একটা বিপর্যয় না ঘটে যায়।

খুব আস্তে বলল, মাপ করবেন, আমার অন্যায় হয়েছে। আমি এতটা বুঝি নি। সে রাতে আপনি হোটেলের ঠিকানা চেয়েছিলেন, আসবেন বলেছিলেন, তাই খোঁজ নিলাম।

না না, একটা যেন বিব্রত গলা শান্তনুর, আপনার দিক থেকে কোন ত্রুটি হয়নি। দোষ আমার। আমিই একটু মাত্রা ছাড়িয়ে-ছিলাম। অভিনয় আপনি ভালই করেন। অভিনয় করা দোষের নয়। রঙ্গমঞ্চই একটা জাতের প্রকৃত পরিচয় বহন করে কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনাদের সঙ্গে আমাদের অবাধ মেলামেশা করতে হবে। যে জীবন অন্ধকারের, সেখান থেকে কিছু গ্রহণ করার থাকে না।

আর ভয় নেই শান্তনুর। সাময়িক বিভ্রান্তি, একটা রাতের দুর্বলতা সব শান্তনু কাটিয়ে উঠেছে। চরম পদস্খলনের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। সে রাতে ও ভাবে রমলার কাছে এগিয়ে আসার জন্য নিশ্চয় প্রায়শ্চিত্ত করেছে শান্তনু। আসন পেতে তপ-জপের মাত্রা হয় তো বাড়িয়ে দিয়েছে।

রমলা অভিনেত্রী, অন্ধকারের জীবন বরণ করে নিয়েছে রমলা।

অনেকক্ষণ পরে রমলার খেয়াল হল, সে টেলিফোনটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তারের ও প্রান্ত নীরব। শান্তনু নিশ্চয় ছেড়ে দিয়েছে।

ফোনটা রেখে রমলা ওপরে উঠে এল।

কাল অভিনয়। অভিনয়ের কথাটা আর শান্তনুকে বলা হল না। বলে লাভও নেই। শান্তনু হয়তো আরো কঠোর উত্তর দিত।

বিছানার ওপরে রমলা শুয়ে পড়ল। আর ভয় নেই। তার শ্রেণী নির্ণয় হয়ে গেছে। সে অভিনেত্রী। ব্যারিস্টার রাজীব রায়ের একমাত্র সন্তানের পুরোনো পরিচয় অবলুপ্ত। নতুন এই পরিচয়ে নতুন এই কলঙ্ক-পসরা মাথায় নিয়ে তাকে সারা জীবন কাটাতে হবে।

বলা যায় না, শান্তনুর মতন ডাক্তার সৌরীন ঘোষালও হয়তো রমলার এই নতুন পরিচয় পেয়ে শিউরে উঠবেন। এত দিন রাজ্যের কালি আর কুৎসা অঙ্গে মেখে ওপরে ওঠার রমলা একটা প্রাণপণ চেষ্টা করছিল, আজ থেকে তার অবসান।

তবু এই নরকে একটা আলোর রেখা, একটা আনন্দের দ্যুতি আছে। সে আলো, সে আনন্দ, অরুণ। তাকে দিদি বলে ডেকেছে। হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছে রমলাকে। এ ভালবাসায় দেহের গন্ধ নেই, এ ভালবাসা নিসর্গের।

পরের দিন সকাল থেকে রমলা বিছানা থেকে উঠল না। প্রদীপ হাজরা রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন।

কি ব্যাপার, মিস রয় শরীর খারাপ নাকি?

শরীর খারাপ হলে কি পরিত্রাণ মিলবে?

প্রদীপ হাজরা একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, আজ রাতটা কোন রকমে উদ্ধার করুন আমাকে। আমি ভাবছি, তারপর সমস্ত

ইউনিট নিয়ে দিন পনরোর জন্য দার্জিলিং চলে যাব। সকলেরই একটু বিশ্রামের দরকার।

রমলা কোন কথা বলল না। শূন্য দৃষ্টি মেলে প্রদীপ হাজরার দিকে চেয়ে রইল।

আপনার এ রোলটা বড় মারাত্মক রোল। নার্ভের ওপর ভীষণ চাপ পড়ে, তা বুঝতে পারি। বিশেষ করে যে সিনটায় আপনি গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছেন। ফাঁস একেবারে তৈরী, সেখানটা আপনার মুখ চোখের চেহারা দেখে আমারই ভয় হয়। মনে হয় নায়ক জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকতে একটু দেরি করলে সত্যি সত্যিই বুঝি আপনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়বেন।

•

রমলা উঠে বসল।

মৃত্যু এখন তার কাছে পরম রমণীয়। বিচার হয়ে গেছে। রমলা দোষী। ফাঁসির মঞ্চে তার জীবনের সমাধি। কোন আক্ষেপ নেই রমলার। কিন্তু আর কোন ভাবে, অন্য কোন উপায়ে কি তার জীবন শেষ করা যেত না? মসৃণ রজ্জুর বাঁধন। গলার চারপাশে ধীরে ধীরে সে বাঁধন দৃঢ় হবে, নিষ্পেষিত করবে কণ্ঠনলী। হয়তো দুটো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠবে, বীভৎস ভাবে ঝুলে পড়বে জিভ। পঙ্কিল বিষ-জর্জর দেহটা বার কয়েক কেঁপে উঠে নিথর হয়ে যাবে।

তার চেয়ে, শেষ কথা যখন মৃত্যু, তখন তীব্র বিষ প্রয়োগে কি বাধা ছিল! ওষ্ঠলগ্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে চেতনালুপ্তি। এত বীভৎসতা এত রূঢ়তা এই নির্মমতার প্রয়োজন হত না।

কিন্তু তা হবে না। রমলার কথায় বিচারের পদ্ধতি বদলাবে না। তা ছাড়া বিষ। বিষ তো রমলার সর্বাঙ্গে প্রতি লোমকূপে। সমাজের দেওয়া গরল নির্বিচারে পান করে সে বিষকণ্ঠী হয়েছে। কিন্তু সেই পরিসমাপ্তির আর কত দেরি। আর কতদিন কারা-

কক্ষে বসে বসে রমলা প্রহর গণনা করবে। কবে আসবে মৃত্যু দুঃখহরণের বেশ ধরে।

এই আর এক অসহ্য নিয়ম। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী জানতেও পারবে না তার চরম লগ্নের কথা। প্রতীক্ষা করতে হবে। অন্তহীন প্রতীক্ষা।

হঠাৎ একরাতে তার ঘুম ভেঙে যাবে। চমকে জেগে উঠবে বিছানার ওপর। ঠক্ ঠক্ ঠক্।

মৃত্যুদূত আসছে অশ্বারোহণে। তারই বুঝি অশ্বখুরের ধ্বনি।

চোখ কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে দেখবে। ফাঁসির মঞ্চ গড়ে উঠছে তারই সেলের পাশে। অন্ধকারে অস্পষ্ট কাঠামো আরো ভয়াবহ।

আর দেরি নেই। পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে বলির প্রাঙ্গণে। জেলার থাকবেন, ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন একজন, আর একজন ডাক্তার। অনুষ্ঠান শুরু হবে। বিসর্জনের বাজনা। যে দড়ি টানবে তার আকুল প্রার্থনা। সে নিমিত্ত মাত্র। তাকে যেন অপরাধী না করা হয়। সে দোষী নয়।

না, দোষী কেউ নয়। কারো কোন দোষ নেই। সকলের দোষ, সকলের পাপ মাথায় নিয়ে দণ্ডিত এগিয়ে যাবে মঞ্চের দিকে।

কিন্তু কেউ এক মুহূর্তের জন্যও প্রকৃত অপরাধীর কথা মনে করবে না। সমাজের কোন দোষ নেই। তার বিধান, তার ব্যবস্থা ত্রুটিহীন। দোষী শুধু মানুষ। পরিবেশের পাপচক্রে যারা বিবেক হারায়, আত্মাকে বিক্রি করে।

রমলা দেয়ালে মাথা রেখে চোখ বুজল।

সে রাতে হলঘর ঠাস বোঝাই। বাড়তি চেয়ার দিয়েও আর লোক ধরানো গেল না। সংবাদপত্রের কল্যাণে চারদিকে প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছে। দূর দূর থেকেও লোক দেখতে এসেছে।

অরুণ রমলার কাছে এসে দাঁড়াল, দিদি।

রমলা দর্পণের সামনে বসে ভ্রূ আঁকছিল। বলল, কি ভাই?

একবার স্ক্রীণের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখবেন আসুন। লোকে লোকারণ্য।

রমলা হেসে বলল, জয় নাট্যকারের জয়।

মোটেই না, অরুণ মাথা নাড়ল, নাট্যকারের জন্য নয়, নায়িকার জন্য। আমি টিকেট ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি।

ভ্রূ ছেড়ে রমলা কপালের মাঝখানে টিপ আঁকছিল। দর্পণে অরুণের প্রতিচ্ছবির দিকে চেয়ে বলল, কি শুনেছ?

সবাই বলছে আপনার কথা। এদের মধ্যে অনেকেই আগের বাবের অভিনয় দেখেছে। কথাবার্তায় তাই মনে হল। বলছে, আপনার আত্মহত্যা করতে যাওয়ার দৃশ্যটা নাকি অদ্ভুত।

হাত কেঁপে টিপটা বেঁকে গেল। আঁচল দিয়ে কপালটা মুছে রমলা আবার টিপ আঁকতে শুরু করল।

একটা কথা ভেসে উঠল মনের মধ্যে। আগে যারা দেখেছে তারাও আবার এসেছে। এমনও তো হতে পারে শান্তনু আবার এসেছে। অভিনয় দেখতে আসার আর অসুবিধা কোথায়। সেবার একলা এসেছিল, এবার হয়তো স্ত্রীকে সঙ্গে এনেছে।

রমলা উঠে দাঁড়াল। চল অরুণ, পর্দার ফাঁক দিয়ে একবার দেখেই আসি। তোমার ভক্তের সংখ্যা কত তার একটা মোটামুটি আন্দাজ থাকা ভাল।

অরুণের পিছনে রমলা স্টেজের ওপর উঠে এল।

অরুণ পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে ধরল। রমলা চোখ রাখল সেই ফাঁকে।

সত্যিই বেশ ভিড় হয়েছে। কেবল কালো কালো মাথা। একটা মিলিত কলরব।

দেখেছেন দিদি। অরুণ পিছন থেকে বলল।

না, রমলা অন্য কিছু দেখছে না। সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে সামনের কয়েকটা সারির ওপর লক্ষ্য করছে। ঠিক বুঝতে পারছে না। নেই বোধ হয় শান্তনু। থাকলে ঠিক রমলার নজরে পড়ত।

চল ভাই, দেরি হয়ে যাবে। আমার এখনও মেক আপ নেওয়ার অনেক বাকী।

রমলা সাজঘরে ফিরে এল। অরুণ চলে গেল বাইরে।

কয়েকটা দৃশ্য করার পরেই রমলা বুঝতে পারল শরীর তার বশে নয়। মাথা ব্যথা করছে। পা দুটো টলছে। আর দুটো অঙ্ক শেষ করতে পারলেই অব্যাহতি, তারপর রমলা কিছুদিন বিশ্রাম পাবে।

প্রদীপ হাজরা লক্ষ্য করলেন রমলার মুখ চোখের ভাব। কাছে এসে বললেন, বুঝতে পারছি মিস রয়, আপনার শরীরটা বেশ খারাপ হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি যা অভিনয় করছেন, অপূর্ব। আর ঘণ্টা দুয়েক ব্যস, তা হলেই নিশ্চিন্ত।

রমলা কোন কথা বলল না। ঠোঁটে রং ঘষতে লাগল।

আর একটা অঙ্ক। রমলার গোটা দুয়েক দৃশ্য। তা হলেই শেষ।

ক্লান্ত রমলা একেবারে কোণের দিকে চেয়ার নিয়ে বসেছিল আলোর আওতা থেকে সরে গিয়ে, অরুণ পাশে এসে দাঁড়াল।

দিদি।

কি ?

এই নিন।

পাশ ফিরেই রমলা অবাক।

অরুণের হাতে দুধের গ্লাস।

একি হবে ?

আপনি খাবেন।

আমি ? কেন ?

আপনার মুখ, চোখ কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। আমি উইংস-এর-পাশ থেকে লক্ষ্য করছিলাম। তাই ছুটে সামনের দোকান থেকে এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এলাম। খেয়ে ফেলুন দুধটা। আমি স্ট্র-ও এনেছি। ঠোটের রং উঠবে না।

রমলার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। বিড় বিড় করে বলল, এ রং উঠে গেলেই বাঁচি ভাই। জীবনের সব রং হারিয়ে তবে এ রং মাখতে হয়। কিন্তু তুমি কেন আবার কষ্ট করতে গেলে?

বারে, আমি যে আপনার ভাই। অরুণ দুধের গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরল।

রমলা আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগল।

এত সাবধান হয়েও বিপর্যয় এড়ানো গেল না।

শেষ দৃশ্যে রমলা ছুটে পালিয়ে যাবে নায়কের হাত থেকে। যে নায়ক তাকে আত্মহত্যার পাপ থেকে বাঁচিয়েছিল। ছুটে পালিয়ে যাবে কারণ সে কলঙ্কিনী। নায়কের জীবন তার পাপ-স্পর্শে সে কলুষিত করতে চায় না।

যে দিকে বাজনার লোক বসেছিল এস্রাজ, বেহালা, তবলা আর হারমোনিয়ম নিয়ে, সেই দিকে রমলা ছুটে গেল, অথচ সেদিক দিয়ে তার প্রস্থান করার কথা নয়। শরীরটা বেঠিক থাকায় অত আর খেয়াল ছিল না।

দেহ দুর্বল ছিলই, তার ওপর এমন উত্তেজনার দৃশ্যে সমস্ত স্নায়ুশিরা উত্তপ্ত হয়েছিল। টাল সামলাতে না পেরে রমলা ছিটকে বাদ্যযন্ত্রের ওপর গিয়ে পড়ল। এস্রাজটা তলপেটে লেগে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। রমলা জ্ঞান হারাল।

অভিনয় শেষ, কাজেই বাইরের দর্শকেরা এ বিপদের আঁচ পেল না। অচৈতন্য রমলাকে ধরাধরি করে গাড়ীতে ওঠানো হল। অরুণ সঙ্গে রইল।

কাছেই অরুণের এক চেনা ডাক্তারের আস্তানা। যে ফার্মে

অরুণ কাজ করে তাদের বাড়ীর চিকিৎসক। সেই সূত্রে অরুণের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা।

প্রদীপ হাজরাও সঙ্গে ছিলেন।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে রমলা চোখ চাইল। এদিক ওদিক দেখল, তারপর আবোল-তাবোল কথা শুরু করল।

ডাক্তারই কথাটা বললেন, আমি তো ভাল বুঝছি না। আমার মনে হয় কোন হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেন। কিংবা যদি বলেন, কাছেই আমার নার্সিংহোম, সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

প্রদীপ হাজরা বললেন, নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়াই ভাল অরুণ। 'হাসপাতালে ঠিকমত যত্ন হবে না। এখানে ইনি নিজে দেখাশোনা করতে পারবেন।

অরুণ বিহ্বলের মতন বসে রইল। একটি কথাও বলল না। তার মুখ দেখে মনে হল এ আঘাত যেন তাকেই সব চেয়ে বেশী লেগেছে। সমস্ত ঘটনাটা এমন আকস্মিক, এত দ্রুত ঘটে গেল যে, তাকে একটু ভাববারও অবসর দিল না।

দিন পনরো পর রমলা হোটেলে ফিরল। তলপেটে এখনও ব্যাণ্ডেজ। তবে ব্যথা অনেক কম। ডাক্তার বলেছেন, আর দিন দুয়েক, তারপরই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাগ্য ভাল রমলার যে মাথায় চোট লাগে নি।

চোখ খুলেই রমলা দেখল বিছানার পাশে প্রদীপ হাজরা আর হোটেলের ম্যানেজার বসে রয়েছেন।

রমলা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর একটা মানুষকে খুঁজল। যে মানুষটার বিশেষ করে থাকবার কথা।

একটু পরে প্রদীপ হাজরাকে জিজ্ঞাসা করল, অরুণ কোথায়?

প্রদীপ হাজরা চেয়ারটা একটু টেনে আনলেন বিছানার দিকে।

বললেন. আজ দুদিন অরুণ আসছে না। কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। অথচ নার্সিংহোমে সকাল বিকাল গিয়েছে।

একটু খোঁজ করুন। সে বেচারির হয়তো অসুখ বিসুখ কিছু হয়েছে।

প্রদীর হাজরা অপ্রস্তুত হলেন। গলার স্বর নীচু করে বললেন, একটু পরেই আমি যাব খবর নিতে।

রমলা ঘাড় কাত করে ক্যালেণ্ডারের দিকে দেখার চেষ্টা করল। পারল না। প্রদীপ হাজরাকে প্রশ্ন করল, আজ কত তারিখ?

দশ। কেন বলুন তো?

না, কিছু নয়। রমলা চোখ বন্ধ করল। মনে মনে হিসাব করল। আর পাঁচদিন। তার মধ্যে রমলা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। অরুণকে ভাইফোঁটা দিতে কোন অসুবিধা হবে না।

সন্ধ্যার দিকে আবার প্রদীপ হাজরা এলেন। রমলার খবর নিতে।

কি, দেখা হল অরুণের সঙ্গে?

হাতের কমলালেবুগুলো টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে প্রদীপ হাজরা বললেন, হ্যাঁ।

শরীর ভাল আছে তো?

ভালই তো দেখলাম।

এখানে আসছে না কেন?

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলল কাজের চাপ বেশী, সময় পাচ্ছে না।

কাজের চাপ বেশী? ভ্রুকুটি করতে গিয়েই রমলার কথাটা মনে পড়ে গেল। ঠিক তাই, লজ্জায় অরুণ এখন আসছে না। সেজে গুজে একেবারে পনরো তারিখ সকালে আসবে ভাই-ফোঁটা নিতে।

ছেলেমানুষ। অরুণ সত্যি বড্ড ছেলেমানুষ। কিন্তু এই ছেলে-মানুষীর জন্যই তাকে রমলার এত ভাল লাগে।

পনরো তারিখে খুব ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠল। শরীর প্রায়

ঠিক হয়ে গিয়েছে। নীচু হতে একটু কষ্ট হয়। আর কোন অসুবিধা নেই।

স্নান সেরে অরুণের দেওয়া লালপাড় শাড়ীটা পরে নিল। চুল এলো করে দিল। আগের দিন বেয়ারাকে দিয়ে ফুল আনিয়েছিল। সেগুলো গোটা চারেক ফুলদানীতে সাজাল। হোটেলের ম্যানেজারকে বলাই ছিল, রমলার একজন অতিথি আসবে। তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

রমলা আরও একটা কাজ করেছিল। নতুন ভাল একটা ধুতি আনিয়েছিল অরুণের জন্য। রুপোর থালায় ধান দূর্বা চন্দন সাজিয়ে রমলা অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু এত দেরি করছে কেন অরুণ! স্নান সেরে ভোর বেলা আসবার কথা।

বেলা নটা নাগাদ একজন ছোকরা এসে দাঁড়াল রমলার দরজায়।

দরজা খোলাই ছিল। সকাল থেকে রমলা খুলে রেখেছিল। ছোকরা এসে দাঁড়াতেই রমলা জিজ্ঞাসা করল, কে?

আমি অরুণবাবুর কাছ থেকে আসছি। চিঠি আছে।

চিঠি! হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিতে নিতে রমলা উদ্বিগ্ন গলায় বলল, অরুণের শরীর ভাল তো? সে এল না কেন?

ছোকরাটি কোন কথা বলল না। চিঠিটা রমলার হাতে দিয়ে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

রমলা চিঠিটা খুলল। কোন সম্বোধন নেই। তলায় শুধু লেখা অরুণ। কয়েক লাইনের চিঠি কিন্তু সেই কয়েক লাইনই যথেষ্ট। চিঠির ছত্রে ছত্রে তীব্র গরল। বিষের তেজে রমলার মুখ নীলাভ হয়ে উঠল।

অরুণ যে কোনদিন এমন চিঠি লিখতে পারে তা রমলার ধারণারও অতীত ছিল।

ডাক্তার অরুণের খুব পরিচিত। তার কাছে অরুণ রমলাকে সম্পর্কীয়া দিদি বলেই পরিচয় দিয়েছিল। কুমারী দিদি। অভিনয়

ঠিক তার জীবিকা নয়, শখ মাত্র। শখ মিটলেই দিদি ফিরে যাবে নতুন সংসারে। মনের মানুষ নিয়ে ঘর বাঁধবে।

কদিন আগে ডাক্তার নিষ্ঠুর সত্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন অরুণের কাছে। বলেছেন তার দিদি—কুমারী তো নয়ই, সন্তানেরও জননী। সন্তানধারণের সমস্ত চিহ্ন রয়েছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। তলপেটের ক্ষত পরীক্ষা করতে গিয়ে অনেক কিছুই ডাক্তারের নজরে এসেছে।

শুনে পর্যন্ত ঘুম নেই অরুণের। সারারাত পর্যন্ত পথে পথে বেড়িয়েছে। রমলা তার সঙ্গে এ ভাবে প্রবঞ্চনার খেলা খেলবে এটা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। রমলাকে তার ভাল লেগেছিল। দিদি বলে ডেকেছিল, সে নিষ্পাপ জেনেই। যদি জানত সে কুলটা, তা হলে অরুণ এ ভাবে পবিত্র একটা সম্বোধনের মর্যাদা নষ্ট করত না।

কুলটা! কুলটা! কুলটা!

রমলার মনে হল ভারি একটা যন্ত্র দিয়ে কে যেন তার বুকের পাঁজরগুলো একটার পর একটা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। তার দেহেব আবরণ টেনে খুলে নিয়ে নগ্ন করে তাকে পথেব ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সহস্র মানুষের কুৎসিত দৃষ্টির সামনে।

অরুণ আর আসবে না। তাকে আর রমলা ডাকতেও পারবে না।

কার অভিশাপে এমন করে রমলার সর্বস্ব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। যাকে আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছে সেই সরে যাচ্ছে। পায়ের তলা থেকে মাটি একটু একটু করে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে।

তীব্র একটা যন্ত্রণায় রমলার সমস্ত দেহটা পাক দিয়ে উঠল। এ ভাবে বাঁচবে না রমলা, বাঁচতে পারে না।

পৃথিবীর সবাই এক জোট হয়ে রাজ্যের কলঙ্কের জঞ্জাল ওর দেহে ফেলবে। একটি কথা বলতে পারবে না। যন্ত্রণায় ক্ষীণ আর্তনাদ পর্যন্ত নয়।

উঠতে গিয়ে শাড়ীর আঁচল লেগে রুপোর থালা মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। ধান, দূর্বা চন্দন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

পড়ুক, তোলবার রমলা কোন চেষ্টা করল না। এ সব মাঙ্গলিকীর বস্তু তার জন্য নয়। সে তো কুলটা। সমাজের নীচের স্তরের বাসিন্দা। অন্ধকারের কারবারী।

ড্রয়ার খুলে টাকার ব্যাগটা বের করে নিল। ব্যাগটা বুকের মধ্যে ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল। দরজাটা বন্ধ করবার কথাও খেয়াল হল না।

তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাজপথে এসে দাঁড়াল। কয়েক পা এগোতেই একটা ট্যাক্সির দেখা মিলল। হাত নেড়ে থামিয়ে রমলা ট্যাক্সির মধ্যে গিয়ে বসল।

তারপর! তারপর রমলা কোথায় যাবে? কি নির্দেশ দেবে ড্রাইভারকে? তার মত মেয়ের যাবার একটি জায়গাই আছে। জাহান্নম। তার ঠিকানা ড্রাইভারের জানা আছে?

রেবার কথা রমলার মনে পড়ে গেল। কলেজে তার একদা-সহপাঠিনী রেবা, ইউনিক ইণ্ডাস্ট্রিজের সহকর্মিনী।

তার সঙ্গে রমলার দেখা করার আজ খুব প্রয়োজন। দুঃখ ভোলার যে ওষুধের কথা রেবা সেদিন বলেছিল, সে ওষুধ না পেলে রমলা বাঁচবে না।

চৌরাস্তার কাছ বরাবর গিয়েই রমলা ড্রাইভারকে থামতে বলল। ওই তো শো-কেসের কাঁচের মধ্যে থরে থরে সাজানো রক্তাভ জীবনীশক্তি। স্পর্শে বিস্মৃতি, জ্বালার নিরাময়, ক্ষতের উপশম।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে রমলা নেমে পড়ল।

দরজায় দাঁড়ানো দারোয়ান সেলাম করে সুইংডোর খুলে দিল। রমলা একেবারে কোণের চেম্বারে গিয়ে ঢুকল।

ঘড়িতে সাড়ে দশ। এ সময়ে এ ধরনের খদ্দেরের ভিড় হয় না। রমলা ছাড়া আর একজন বসে রয়েছে। একটি চীনা ভদ্রলোক।

রমলা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারা এসে দাঁড়াল। কি চাই ?

কি চাই রমলার ? তীব্রতম হলাহল, যা অনন্ত বিস্মৃতি এনে দেবে। মানুষের ব্যঙ্গ, পরিহাস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিছুই আর ত্বকে বিঁধবে না। নিন্দার শায়ক প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে।

অতিষ্ঠ বেয়ারা আবার জিজ্ঞাসা করল, কি দেব মেমসাব ?

ওয়াইন। আস্তে আস্তে অনেকটা নিজের মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করার মতন সুরে রমলা বলল।

জিন ? বিয়ার ? রাম ? ব্রাণ্ডি—কি দেব বলুন ?

হুইস্কি আছে ?

হঠাৎ এ নামটা কেন রমলা বলল, তা সে নিজেই জানে না। বোধ হয় খবরের কাগজে দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন দেখে দেখে নামটা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে।

বেয়ারা চলে গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফিরে এল বোতল আর গ্লাস নিয়ে।

এইবার সমস্যার শুরু।

বেয়ারা একটা সোডার বোতল খুলে পাশে রেখে গেছে।

উপায় নেই। পানপাত্র সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে রমলা এখানে আসেনি। এ বিষ তাকে পান করতে হবেই। এটা না পান করলে পৃথিবীর বুকে বেড়াবার স্বাধীনতা হারাবে। মানুষের ভ্রূকুটি পার হয়ে যাবার রসদ ওই চ্যাপটা বোতল।

রেবা দুঃখ ভুলেছে, দেহের অশুচিতা ভুলেছে। রমলাও ভুলবে।

চোখ বন্ধ করে রমলা মুখের মধ্যে ঢেলে দিল। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল গলা আর বুক। দুহাতে মুখ চেপে ধরে রমলা নিজেকে সামলাল। তরল অগ্নির স্রোত শিরা উপশিরা বেয়ে নেমে চলল। অপূর্ব দাহিকা শক্তি নিয়ে। চোখের সামনে অজস্র অগ্নির

রমলা দ্বিতীয়বার পানপাত্র শূন্য করল। প্রথমবার যা মনে হয়েছিল গরল, এবার তা অমৃতের রূপ নিল।

জীবনে একটা ছন্দ এল, দু কানে মৃদু মৃদঙ্গের বোল। ধীরে ধীরে বর্তমান মুছে গেল, তার সব জ্বালা, সব দাহ নিয়ে। রমলা পরিবেশ ভুলল। নিজেকে ভুলল।

হাত বাড়িয়ে আবার বোতলটা উপুড় করল গ্লাসে। এতক্ষণ পরে সোডা মেশাল, তারপর নিশ্চিন্তে গালে ঢেলে দিল।

প্রায় একটা নাগাদ বেয়ারা হাত ধরে তুলে দিল। জড়িত কণ্ঠে রমলা বলল, ট্যাক্সি ডেকে দাও।

বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে মেমসাব।

টলতে টলতে রমলা উঠে দাঁড়াল। বিল আগেই মেটানো হয়েছিল। খুচরোগুলো বেয়ারার হাত থেকে আর ফেরত নিল না।

ট্যাক্সির কোটরে বসে একটু একটু করে খেয়াল হল। এখন কোথায় যাবে? কোন্ আস্তানায়?

হোটেলে আর ফিরবে না। অন্তত এখন তো নয়ই। সেখানে চেনা লোক সব রয়েছে। এখনই এগিয়ে এসে দরদ দেখাবে। সহানুভূতির সুর মেশাবে কণ্ঠে। হয়তো সেবা-ই করতে আসবে। তার চেয়ে আর কোথাও যেতে হবে। যেখানে চেনা লোক কেউ নেই। নিভৃত নির্জন কক্ষ। মুখোমুখি শুধু সে আর বিস্মরণের এই অমৃত।

কাঁহা যানে হোগা মায়জী। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল। আর লজ্জা নেই রমলার। সঙ্কোচ নেই। বলল, কই শরাবকা দুকানমে লে চল।

অপেক্ষাকৃত ছোট গলি। দোকানটাও ছোট। কিন্তু লোকের ভিড়। বেয়ারা রমলাকে সসম্ভ্রমে ওপরের তলায় নিয়ে গেল। সারি সারি কাঁচের পার্টিশন দেওয়া কামরা। তারই একটাতে।

এবার বেয়ারা আসতেই রমলা ঠিক অর্ডার দিল। ইতস্তত করল না। আর হাত কাঁপল না গ্লাস তুলতে।

একবার শুধু আবছা মনে হল অরুণের দেওয়া লাল পাড় শাড়ীতে কিছুটা মদ চলকে পড়ল। লাল হয়ে গেল। এ দাগ বোধ হয় আর উঠবে না। সারা জীবনেও নয়।

হঠাৎ অস্পষ্টতার মধ্য দিয়েই রমলার মনে হল সবাই মিলে হুড়োহুড়ি শুরু করেছে। বাইরে পালাবার চেষ্টা। অনেকগুলো বুটের আওয়াজ। লাঠিঠোকার শব্দ। তারপর কারা এসে রমলার সামনে দাঁড়াল। জোরে জোরে কথাবার্তা। থানায় নিয়ে যাবার ভয় দেখাল। তারপর রমলার আর কিছু মনে নেই।

যখন চোখ খুলল, দেখল আধো অন্ধকার এক ঘর। বাতিতে ঠুলি পড়ানো। বড় একটা খাটে রমলা শুয়ে আছে। মাথার কাছে কে একজন বসে রয়েছে।

তখনও নেশার ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নি। মাথা ঝিমঝিম করছে। উঠতে গেলেই বোধ হয় ঘুরে পড়ে যাবে। ক্লান্ত গলায় শুধু বলল, একটু জল।

আবছা দেখল কে একজন উঠে কোণের দিকে সরে গেল। কাঁচের গ্লাসে জল এনে তার মুখের কাছে ধরল।

মাথাটা একটু উঁচু করে রমলা এক চুমুকে জল শেষ করল, তারপর বলল, আমি কোথায়?

খনখনে গলায় উত্তর এল, ভয় নেই, ভাল জায়গাতেই আছ। এখান থেকে ধরে নিয়ে যাবে এমন পুলিশ এখনও মায়ের গর্ভে।

চোখ কুঁচকে রমলা দেখবার চেষ্টা করল, কিছু দেখতে পেল না, শুধু দৃষ্টির সামনে মোটা অনন্ত আর এক গোছা চুড়ির সার দেখা গেল।

তারপর একটু একটু করে সামনে অন্ধকার নেমে এল।

পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙল একই কর্কশ কণ্ঠে। নাও, নেবুর রসটা খেয়ে নাও, তবু একটু ঘোর কাটবে।

একটু একটু করে রমলা মনে করার চেষ্টা করল। এক দোকান থেকে আর এক দোকানে। এক নাগাড়ে বিষ পান। একটি মিনিটের বিরতি নয়। তারপর বোধহয় পুলিশের দল দোকানে হানা দিয়েছিল। সেখান থেকে রমলাকে কে রক্ষা করল? কে তুলে আনল এখানে? এরা কেউ?

কি গো ভালমানুষের বেটি, কথা কানে যাচ্ছে না। নাও, কাপটা ধরো।

আর দ্বিরুক্তি না করে রমলা লেবুর রসটা পান করল।

ওই পাশে কলঘর। কলঘরে গামছা, শাড়ি, তেল, সাবান সব আছে। যাও, স্নানটা করে এস।

স্নান করার ইচ্ছা রমলার নিজেরই খুব প্রবল। কেমন অশুচি মনে হচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে জল ঢেলে ঢেলে স্নান না করলে যেন তৃপ্তি হবে না।

রমলা উঠে দাঁড়াল, আর তখনই মহিলাটির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হল।

নিকষ কালো রং, বর্তুলাকার চেহারা, কাণে, গলায়, প্রকোষ্ঠে, বাহুমূলে অলঙ্কারেব স্তূপ। চুল চূড়ো করে মাথার ওপর বাঁধা। পরনে খাটো ডুরে শাড়ি, ব্লাউজের বালাই নেই।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রমলা কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, কিন্তু বেশীক্ষণ চেয়ে থাকবার সাহস হল না। আবার সেই কাংস্য কণ্ঠ।

বলি, ড্যাবড্যাব করে দেখছ কি? আমি না হয় তোমার মতন অপ্সরী কিন্নরী নই। কিন্তু এই চেহারাতেও যা করেছি, তা তোমার ভু পুরুষে পারবে না। নেত্য বাড়ীউলির নামে পুলিশের বড় কর্তা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপে।

নেত্য বাড়ীউলির সামনে রমলা আর দাঁড়াতে পারল না। দ্রুত পায়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

ভিতরে ঢুকেও রমলা অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। পাশের ছোট জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল। চারদিকে ঢেউ-টিনের চালা, মাঝখানে চৌকো উঠান। মেয়ের পাল। কেউ রোদে চুল শুকোচ্ছে, কেউ রান্নার আয়োজন করছে, কেউ কেউ এমনি গল্প করছে বসে বসে।

তাদের দেখলেই চিনতে কোন অসুবিধা হয় না। পেশার কথা যেন সর্বাঙ্গে লেখা। তা হলে এইখানে এসে পড়েছে রমলা। ভোগের পীঠস্থানে। ব্যারিস্টার রাজীব রায়ের মেয়ে নামতে নামতে একেবারে শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে। নামবার আর বোধ হয় ধাপ নেই। এবার পা বাড়ালেই নীরন্ধ্র তমসা। পূর্ণগ্রাস। জীবনের সামান্য চিহ্নও কোথাও থাকবে না।

জানলা থেকে সরে এসেই রমলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

উঠানে যারা বসে আছে, ঘোরাঘুরি করছে, তাদের সঙ্গে রমলার কোন প্রভেদ নেই।

চোখের নীচে ঠিক অমনি গভীর কালি, রাত্রি জাগরণের ক্লান্ত দুটি চোখ, মাথার চুল খুলে সারা পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। উচ্ছৃঙ্খল জীবনের চিহ্ন হাবে ভাবে।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে রমলা স্নান করল। সাওয়ার বাথের তলায় অনেকক্ষণ বসে রইল। চেয়ে চেয়ে দেখল জলের ধারা নামছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেয়ে। কিন্তু এ তো শুধু বাইরের ময়লা পরিষ্কার হচ্ছে, অন্তরের মালিন্য, ভিতরের কুশ্রীতা কিসে মুছবে? কোন পুণ্য স্রোতধারায়?

বাইরে এসে রমলা অবাক।

নেত্য বাড়িউলি দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে ঠাকুরের হাতে ঝকঝকে থালায় ফুলকো লুচি, তরকারি, মিষ্টি।

তুমি কি জাত জানি না বাছা, তাই বামুন ঠাকুরকে দিয়ে সব তৈরি করালাম। অবশ্য এ জায়গা তো শ্রীক্ষেত্তর, এখানে আবার জাত-বেজাত। হুঃ, আমি তো মুদীর মেয়ে। বাপের নামটা আর কবব না। সগ্‌গে গেছে, তাকে নিয়ে মিছে টানাহ্যাঁচড়া করব না। আমরা তো পাল অথচ সর্বেশ্বর চাটুয্যের ছেলে মাণিক চাটুয্যে, অত বড় কুলীনের ঘরের ছেলে, ত্রিসন্ধ্যা না করে জলস্পর্শ করে না, আমার এখানে শনিবার রাত্তিরে আসত, আর যেত সেই সোমবার সকালে। তাও কি এমনি যেত। গালাগাল দিয়ে বাড়ি পাঠাতাম। আহা, কচি বউটা হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবে। এসব কি আজকের কথা!

সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে নেত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর গলা খাদে নামিয়ে বলল, নাও বাছা, সংয়ের মতন আব দাঁড়িয়ে থেক না। লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

স্নান করে এসে রমলার শরীরের অবসাদ অনেকটা কমেছিল। মাথাধরাটাও নেই। এতক্ষণ পরে বুঝতে পারল, সে রীতিমত ক্ষুধার্ত।

রমলা সামনের আসনে বসে পড়ল। খেতে খেতেই ভাবতে লাগল কি করে আসল কথাটা পাড়বে।

কিন্তু তার আগে নেত্যই কথা শুরু করল।

চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে খুব ভালঘরের মেয়ে। খুব শোকতাপ পেয়েছ বুঝি? নইলে আর ওভাবে দোকানে বসে মদ গেল! কি ব্যাপার বলতো, ভাতার নেয় না? নাকি কেউ ফুসলে বের করে এনেছে?

এত সোজাসুজি নির্দ্বিধায়, কেউ এমন কথা বলতে পারে তা' রমলার ধারণাও ছিল না। কোন উত্তর দিল না প্রথমে। গ্লাসের জলটা নিঃশেষ করে বলল, আমি থাকব না এখানে। কেন আমাকে ধরে নিয়ে এসেছ? যদি যেতে না দাও, আমি চেঁচামেচি করব।

নেত্য কিছুক্ষণ অবাক হবার ভান করল, তারপর বলল, অ, খেয়েদেয়ে তাগদ হয়েছে বুঝি? এতক্ষণ তো নির্জীব হয়ে পড়েছিলে, এবার কুলোপানা চক্কোর তুলছ? যাবে বই কী, এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে তোমায় নিয়ে এসেছি, খাইয়ে দাইয়ে ছেড়ে দেবার জন্য কিনা!

রমলা কোন কথা শুনল না। শুনতে চাইল না। আরো গলা চড়িয়ে বলল, যদি ভালোয় ভালোয় যেতে না দাও, আমি পুলিশে খবর দেব। জানলায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করব।

রমলা মরীয়া। এ নরককুণ্ড থেকে বেরোতে না পারলে পরিত্রাণ নেই।

নেত্য অবাক হয়ে একটা হাত দিয়ে গাল চাপড়াল। বলল, অ মা, মেয়ের কথা শোন! সাধে বলেছে ঘোর কলি। মানুষের উপকার করতে নেই।

নেত্য উঠে বাইরের বারান্দার কাছ বরাবর গিয়ে হাঁকল, ও শেতল, এদিকে কাণ্ড দেখে যা বাবা। আমাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছে। একবার আয় বাপ।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে যে ঘরে ঢুকল, তাকে দেখে রমলার গলা দিয়ে স্বর বেবোল না।

ছ ফিট লম্বা এক যোয়ান। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। লাল টকটকে দুটি চোখ। কপালের কাছে বিরাট একটা ক্ষত-রেখা চোখের কোণ পর্যন্ত নেমে এসেছে। পুরু, কালো ঠোঁট। গলায় কালো সুতোর একটা তাবিজ ঝোলানো। চওড়া কালোপাড় শাড়ি মালকোঁচা মেরে পরা।

কি হল মাসী, তোকে পুলিশের ভয় আবার কে দেখায়? পুলিশ তো তোর বেহাই।

ওই দেখ বাছা, তখন থেকে তড়পাচ্ছে। নেত্য রমলার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

শীতল রমলার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে একবার চোখ কুঁচকে দেখল। কুৎসিত লেহন-করা দৃষ্টি। রমলার মনে হল সে দৃষ্টির সামনে যেন উলঙ্গ হয়ে পড়ল। তার গায়ের ওপর দিয়ে জীবন্ত একটা সরীসৃপ পরিক্রমণ শুরু করল।

ও ভালমানুষের মেয়ে, গোলমালের চেষ্টা করলে বিপদে পড়বে। ভাল ভাবে থাকো তো মাথায় করে রাখব। আর এদিক ওদিক করলে একেবারে খতম।

শীতল তুটো দাঁতে ঘসাঘসির শব্দ করল।

সারাটা, তুপুর নেত্য মাসী কাছে কাছে রইল। অনেক বোঝাল।

তোমার তুঃখুটা কি তাই বলতো? বাইরের পৃথিবী তো দেখলে। জ্বলে পুড়ে না মলে ভদ্রঘরেব মেয়েছেলে কি আর মদ ধরে। তবে বাইরে যাবার এত ইচ্ছা কেন। এখানে থাক আমার কাছে। তোমার চুলের ডগাটি কেউ ছুঁতে পারবে না। যখন যা দবকাব আমাকে বলবে। তুমি তো রাজরাণী, তোমার অভাব কিসের। তুদিনে দেখবে লক্ষপতি বাবুরা পায়ের তলায় এসে পড়বে।

রমলা কিছু শুনল, কিছু শুনল না। দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে চুপ করে বসে রইল।

বাইরে যে যেতে চাচ্ছে, কোথায় যাবে? পথে ঘাটে শান্তনু বোস রয়েছে। শাণিত কথার ঝিলিক। ব্যঙ্গের হাসি। ধাপে ধাপে রমলার অধঃপতন লক্ষ্য করে চলেছে।

কোন্ জীবন গ্রহণ করবে। চাকরি, সে হবার নয়। অভিনেত্রীর জীবন? তাও বুঝি সম্ভব নয়। সেখানে পর্দার আড়ালে অরুণ দাঁড়িয়ে আছে। যে অরুণ বুকভরা স্নেহ প্রীতি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। বোনের হাত থেকে ললাটে জয়টিকা নেবার আশায়। প্রবঞ্চিত হয়ে ফিরে গেছে।

এ দুর্বহ জীবনে রমলা ক্লান্ত। মনে হচ্ছে, পথের পাশে যদি জীবনের বোঝাটাকে নামিয়ে পালিয়ে যাওয়া যেত। আবার সব কিছু নতুন ভাবে শুরু করা সম্ভব হত।

এখন আর রমলাকে কেউ বিশ্বাস করবে না। তপস্বিনীর জীবন যাপন করলেও নয়। একবার পদস্খলন হলে, এরা কেউ আর ক্ষমা করে না। সেই পঙ্ক থেকে তোলার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। বরং আরো দুরূহ করে তোলে জীবনযাত্রা।

এবার তা হলে অন্ধকারের জীবনই শুরু হোক। এক পাপ থেকে অন্য পাপ, এক আবিলতা থেকে অন্য আবিলতায়। ত্রিশঙ্কুর মতন এভাবে আশা আর আশঙ্কার মাঝখানে রমলা ঝুলতে পারে না। দ্বিধার অবসান হোক। যে রমলা ভদ্রভাবে বাঁচবার এতদিন ধরে চেষ্টা করেছিল, তার অপমৃত্যু হোক।

শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। একটু শুচ্ছি।

রমলা খাটের ওপর শুয়ে পড়ল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু শুয়ে নাও। শরীর যখন খারাপ, তখন একটু গড়াবে বৈকি। শরীরই সব মেয়ে, বুঝলে। ওই মন্দির। ওটা ঠিক থাকলে তবে দেব্‌তারা আসবে। সব সময়ে শরীরের তোয়াজ করবে।

বিড় বিড় করতে করতে নেত্য উঠে দাঁড়াল। পাখাটা পুরোদমে চালিয়ে দিয়ে সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলল, একটু পরে ভাত তরকারী পাঠিয়ে দিচ্ছি বাছা।

খাওয়া দাওয়ার পরে আবার রমলা বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে চারদিকে।

আশে পাশে হারমোনিয়ামের আওয়াজ, তবলার শব্দ। বেল-ফুলের উগ্র সুরভিও নাকে এল।

রমলা বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবার জন্য দরজা ধরে টানল। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

জোরে শিকলের আওয়াজ করতেই জানলায় শীতল এসে দাঁড়াল।

কি ?

দরজা খুলে দাও।

এত তাড়াতাড়ি নয়। কিছু দিন দাঁড়ে বসে ছোলা চিবোও, কৃষ্ণনাম বল, পোষ মানো। তারপর দেখা যাবে।

শীতল সরে গেল।

নীচে কোথায় গান শুরু হয়েছে। তালে তালে ঘুঙুরের আওয়াজ।

দু হাতে মুখ ঢেকে রমলা উচ্ছ্বসিত আবেগে কেঁদে উঠল। এ কোথায় এল রমলা! কোন্ নরকে! এমন কি কেউ নেই যে এখান থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে। অঙ্গের সমস্ত মালিন্য মুছিয়ে দিয়ে সম্মানের বেদীতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এ গানের, এ ঘুঙুরের বোলের, এ সুরভির অর্থ রমলার অজানা নয়। একটা প্রবল ঘূর্ণিপাকে রমলাকে টেনে নিয়ে যাবে রসাতলে। পদস্পৃষ্ট কুসুমের মতন সমস্ত জীবন অশুচি হয়ে যাবে।

দরজার ওপর রমলা আছড়ে পড়ল।

ওগো খুলে দাও, দরজা খুলে দাও। পায়ে পড়ি তোমাদের, আমাকে বাইরে যেতে দাও। পার হতে দাও এই অন্ধকারের এলাকা।

নিষ্করুণ দরজা একটুও ফাঁক হল না।

এ চক্রব্যূহে বুঝি প্রবেশ করা যায়, নিষ্ক্রমণের কোন পথ নেই। আজীবনের মতন নিজেকে বাঁধা রাখতে হয় এখানে।

যদি এ জীবন থেকে নিষ্কৃতি অসম্ভব, তবে অন্তত এইটুকু রমলার প্রার্থনা। নিষ্কৃতি দাও দেবতা, অনন্ত নিষ্কৃতি।

চোখ তুলেই রমলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনন্ত বিস্মৃতি নয়, সাময়িক বিস্মৃতির উপকরণ শীতল এগিয়ে দিয়েছে জানলা দিয়ে।

রমলা আগ্রহে বোতল আর গ্লাস টেনে নিল।

মেঝের ওপর ছোট কার্পেট পাতা। তার ওপর রমলা বসল। বোতলটা তুলে ধরে আলোয় একবার দেখল। টলটলে রক্তের রং। রক্তই বোধ হয়। সারাটা জীবন ধরে একটার পর একটা আঘাতে রমলার দেহ থেকে যে রক্ত ক্ষরণ হয়েছে সেটুকু বুঝি জমিয়ে রাখা হয়েছে এভাবে। রমলাই একদিন পান করবে সেই আশায়।

রমলা গ্লাসে ঢেলে কিছুক্ষণ বসে রইল। বাইরে জীবন ক্রমে উদ্দাম হয়ে উঠছে। কোথায় একটানা চীৎকার। হাসির হুল্লোড়। পরকালহীন, বিবেকবর্জিত উত্তাল জীবনযাত্রা।

রমলা গ্লাস মুখে তুলে ধরল।

এই তো ভাল। সৎ হবার সরু রাস্তা বেয়ে অনবরত পড়ে যাবার শঙ্কা বুকে নিয়ে ভীরু পায়ে চলার চেয়ে বল্গাহীন জীবনের স্বাদ গ্রহণ অনেক গুণে শ্রেয়। এখান থেকে আর নীচে পড়ে যাবার ভয় নেই। পুরুষের স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলার মূঢ়তাও নয়। পলে পলে অপমৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি।

বোতল প্রায় শেষ হবার মুখে রমলার আবছা মনে হল দরজার পাল্লা দুটো যেন খুলে গেল। কিন্তু তখন আর রমলার উঠে বসার শক্তি নেই।

অস্পষ্ট মনে হল নেত্য মাসীর পিছন পিছন আর একজন কে যেন ঘরে ঢুকল। দীর্ঘ, গৌরবর্ণ চেহারা। অঙ্গের সুরভিতে ঘর মশগুল।

ফিসফিস করে কথাবার্তা, তারপর নেত্যমাসী বাইরে চলে গেল। আবার বন্ধ হল দরজা।

কে বুঝি রমলাকে আকর্ষণ করছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও রমলা নিজেকে ছাড়াতে পারল না। এখনও কানে আসছে সঙ্গীতের সুর। বাজনার রেশ। এ পৃথিবীতে দুঃখ নেই, বেদনা নেই, বিবেকের ছলনা নেই।

রমলার প্রতিরোধ শ্লথ হয়ে এল।

রমলার ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন সবে ভোর হয়েছে। জানলার কাঁচের মধ্য দিয়ে কাঁচা রোদের ফালি বিছানার ওপর এসে পড়েছে। সেই অস্পষ্ট আলোয় আর একবার রমলা নরকের ছবি দেখল। বিছানার চাদরের কিছুটা মেঝেয় লুটাচ্ছে। বেলকুঁড়ির একটা মালা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে শয্যার ওপর। রমলারই বালিশে মাথা রেখে এক দেবকান্তি যুবক ঘুমাচ্ছে।

রমলা উঠে বসল। দরজার দিকে দেখল। মনে হল দরজা আগের মতনই বন্ধ। আস্তে আস্তে উঠে বাথরুমে ঢুকল।

মাথার মধ্যে ভারি একটা বোঝা। দু কানে জলতরঙ্গের সুর। জানলা দিয়ে উঠানের দিকে রমলা একবার চেয়ে দেখল। না, এত ভোরে কেউ ওঠে নি। কিন্তু ওদের সঙ্গে আর রমলার কোন প্রভেদ নেই। দেহোপজীবিনী নারী, এ ছাড়া রমলার আর কোন পরিচয় নেই আজকের সমাজে। ভবতারিণী বিদ্যামন্দিরের সেক্রেটারির কাছ থেকে নিজেকে যে ভয়ে রমলা গুটিয়ে গুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, ইউনিক ইণ্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সেনের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে বিরোধের সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, আজ সব কিছুর অবসান।

বাঁচবার কোন' প্রলোভনই রমলার আর রইল না।

ওপর দিকে চেয়ে দেখল জলের নলটা সোজাসুজি রয়েছে। ওর সঙ্গে পরনের শাড়ীটা জড়িয়ে চমৎকার দোলা খাওয়া যায়। মরণ দোলা। অবশ্য তার আগে শাড়ীর একটা প্রান্ত নিজের গলায় বাঁধতে হবে।

রমলা তাই করল।

একটা প্রান্ত নলে বাঁধল, আর একটা প্রান্ত নিজের গলায়। বসে স্নান করার যে ছোট চৌকীটা ছিল, তার ওপর দাঁড়াল। তারপর পা দিয়ে টুলটা ঠেলে দিতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল।

ওগো শুনছ, কোথায় গেলে ? ওগো ?

এমন একটি আহ্বানের জন্যই কি রমলা এতদিন উন্মুখ হয়েছিল সারা জীবন ধরে শবরীর প্রতীক্ষা ?

রমলা চৌকী থেকে নামল। শাড়ীটা অঙ্গে জড়াল। দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল।

কইগো, কোথায় তুমি ?

পুরুষটি চোখ খোলে নি। শুয়ে শুয়েই সারাটা বিছানা হাতড়াচ্ছে।

এত দুঃখেও রমলার একটু সান্ত্বনা। সব পুরুষই তো প্রতারণা করেছে তাকে। দেহভোগ করার পরেই দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কেউ আবার ভালবাসার ভান করে সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু এমন করে আকুল হয়ে তো কেউ খোঁজে নি।

কি চাই কি ? রূঢ় গলায় রমলা বলল।

কণ্ঠস্বরে পুরুষটি চোখ খুলল। প্রদীপ্তলোচন। একদৃষ্টে রমলার দিকে চেয়ে বলল, তুমি, তুমি এত সুন্দর ? কালরাতে ভাল করে বুঝতে পারি নি। ঘরে ঢুকিয়েই নেত্যমাসী বাতি নিভিয়ে দিয়ে গেল।

দুহাত দিয়ে রমলা নিজের কান চাপা দিল। এ অনর্থক রূপের স্তুতি আর সে শুনতে পারে না। এদের সকলেরই এক কথা। পুষ্পস্তবক ঘিরে সব ভ্রমরের এক গুঞ্জন। আসলে ফুলের প্রশংসা নয়। মধু লোটবার ফন্দী।

রমলা বিছানার পাশে গিয়ে বসল। ঝুঁকে পড়ে বলল, আমি খুব সুন্দর দেখতে তো ? আমায় আপনার খুব ভাল লাগে ?

পুরুষটি কিছুক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে রইল, তারপর ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

বেশ, তাহলে আমাকে বিয়ে করুন। বিশ্বাস করুন, আমি এ দলের নই। আমাকে এরা জোর করে ধরে এনেছে। আপনি

আমায় উদ্ধার করুন। আমি লেখা-পড়া জানা মেয়ে। আমাকে বিয়ে করলে আপনি অসুখী হবেন না।

বিয়ে? পুরুষটি ঘাড় নাড়ল, না, বিয়ে নয়।

রমলা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তার মানে, শুধু ফুর্তি করতে চান। দেহটুকু দরকার, মনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আপনার রাখতে চান না?

লোকটি বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসল। কিছুক্ষণ রমলার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল, কি বলছ, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। বিয়ে করলেই যে তুমি মরে যাবে।

মরে যাব? কেন?

কেন আবার। দু দুবার বিয়ে করলাম, একটা বৌও টিঁকল না। তাই এবার ঠিক করেছি, বিয়ে আর নয়। ভাল মেয়ে পেলে বৌয়ের মতন যত্নে রাখব। নেত্যমাসীকেও তাই বলে রেখেছিলাম।

আপনি কি করেন? রমলা আবার বিছানার প্রান্তে বসল।

আমি? আমি ঠিক কিছু করি না। বাবার পাটের কারবার, শিউড়ীতে চিনির কলও আছে। মাঝে মাঝে আমি অবশ্য বসি দোকানে গিয়ে। কিন্তু ওসব আমার ভাল লাগে না।

কি করতে আপনার ভাল লাগে?

আমার বাঁশী বাজাতে ভাল লাগে। তাস খেলতে ভাল লাগে, আর, আর এবার থেকে তোমার কাছে আসতে ভাল লাগবে।

শুনুন একটা কথা বলি, রমলা গলায় অন্তরঙ্গতার সুর আনল, আমাকে বিয়ে করুন, আমি সহজে মরব না। অনেক মৃত্যু, অনেক যন্ত্রণা আমি পার হয়ে এসেছি। আমার ভয় নেই। এ নরকে আমি থাকতে পারছি না।

লোকটি নির্নিমেষ-নয়নে দেখল রমলাকে, তারপর রমলার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, বেশ, ছ মাস দেখি।

তুমি আদর যত্ন কর, বহাল তবিয়তে বেঁচে থাক, তারপর তোমায় বিয়ে করব। প্রতিজ্ঞা করছি। তিন সত্যি।

দরজায় শব্দ হতেই রমলা উঠে দাঁড়াল। একেবারে দেয়ালের কোণ ঘেঁষে। নেত্য মাসী ঘরে ঢুকল। পিছনে একটা ছোকরা চাকর। ট্রের ওপরে চা আর ডিম।

ভিতরে ঢুকে নেত্যমাসী আড়চোখে একবার তুজনের দিকে দেখল। মনে হল, দেখে যেন খুশীই হল। মুখ টিপে হেসে বলল, নাও, মুখে দিয়ে নাও। হ্যাঁ বাছা, ডিম খাও তো? শেষ প্রশ্নটার লক্ষ্য রমলা।

রমলা স্নানের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, স্নান না করে আমি কিছুই খাই না।

বাথরুম থেকে রমলা বেরোল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর। বেরিয়ে দেখল কাপতুটো ডিশ চাপা। ডিমের প্লেটতুটোও তেমনি পড়ে রয়েছে।

একি খান নি আপনি?

লোকটি বাইরে থেকে বোধ হয় মুখ হাত ধুয়ে এসেছে। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে।

রমলার প্রশ্নে কাগজ থেকে মুখ তুলে বলল, একলা খায় নাকি কেউ? তোমার সঙ্গে খাব বলে বসে আছি।

রমলা চায়ের কাপ আর ডিমের প্লেট লোকটির দিকে এগিয়ে দিল। নিজে শুধু চায়ের কাপটা টেনে নিল।

একি ডিম খাবে না?

না, সকালে আমি ডিম খাই না।

রমলা একটি মুহূর্তও লোকটির দিক থেকে দৃষ্টি সরাল না। যেমন করে হোক এই লোকটার সাহায্য নিয়ে এই নরকপুরী থেকে বাইরে যেতে হবে।

আপনি পড়াশোনা কতদূর করেছেন? চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে রমলা জিজ্ঞাসা করল।

আই. এ পাশ করেছি ; বি. এ বার দুয়েক ফেল করাতে বাবা বললেন, থাক, আর বিদ্যের দরকার নেই, ব্যবসায়ে ব'স।

আপনার নামটা জানতে পারি ?

কি তখন থেকে আপনি আপনি করছ ? বৌ কি স্বামীকে আপনি বলে নাকি ?

মাথা নীচু করে রমলা মনের ভাবটা দমন করল। আস্তে বলল, একটু সময় নেবে। মাত্র প্রথম দিনের আলাপ তো। কিছুদিন গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

লোকটি সায় দিল।

তা সত্যি, প্রথম প্রথম লজ্জা করে বই কি। আমার নাম অজয় সিংহ। ওই যে বললাম না, সিংহ সুগার মিল, শিউড়ীর, ওটা আমাদেরই। তা ছাড়া ন্যাশনাল জুট কোম্পানীও আমাদের। তোমার কোন ভয় নেই, সোনায় মুড়ে রাখব তোমাকে। কোন কষ্ট পাবে না।

কথার ধরনে রমলা হেসে ফেলল। আর ভয় নেই। সুখের অন্ত থাকবে না রমলার। আর এক অলীক প্রতিশ্রুতির ঘাটে বুঝি রমলা নৌকা বাঁধল।

ঠক্, ঠক্, ঠক্।

একটানা শব্দ হতেই রমলা উঠে বসল। সামান্য তন্দ্রার মতন এসেছিল। একটু ঝিমুনি। তার মধ্যেই সর্বনাশা শব্দটা কানে গিয়ে পৌঁছল।

এই শব্দটার জন্য রমলা এতদিন সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। ওই শব্দটুকুই তার সব যন্ত্রণা, সব দুঃখের অবসানের বার্তা বহন করে আনবে। তার সেলের কাছেই নির্মিত হবে তার ফাঁসির মঞ্চ। রাত্রির অন্ধকারে তিল তিল করে গড়ে উঠবে কাঠের অস্পষ্ট কাঠামো। উষার আলোয় রমলার যাত্রা শুরু হবে। অনন্ত যাত্রা।

কিন্তু নিশীথ রাত্রে ওই শব্দটা শুনে কেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল রমলা? তবে কি এখনও তার জীবনের মায়া ঘোচে নি? মৃত্যুর তুহিন স্পর্শে শান্তি, এ বিষয়ে এখনও দ্বিধা, এখনও সন্দেহ!

অন্ধকারে দুটি চোখ বিস্ফারিত করে রমলা চেয়ে রইল। কই, কোথায় পাতা হচ্ছে রমলার মৃত্যুর সিংহাসন। যে সিংহাসনে বসে সে বিস্মৃত হবে জীবনের গ্লানি, মুছে যাবে অপমানের শেষ কালিমার চিহ্ন।

কোথাও কিছু রমলা দেখতে পেল না। কাছে নয় অনেক দূরে কোথাও শব্দ হচ্ছে। কাঠঠোকরা বুঝি অবিচল নিষ্ঠায় ঠোঁট দিয়ে আঘাত করে চলেছে গাছের বাকলে। ঠক্, ঠক্, ঠক্। কিন্তু রাতের বেলা কি পাখী জেগে থাকে? কি জানি কিছু বলা যায় না। ব্যারিস্টার রাজীব রায়ের মেয়েরই কি নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করা উচিত অপরিসর কারাকক্ষে?

সব আবছা আবছা রমলার মনে পড়ল। অজয় সিংহ সত্যিই সুখে রেখেছিল। বিয়ে করে নি। আলাদা বাড়িতেও নিয়ে যায় নি। এখানেই রেখেছিল।

অন্য কোন বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে তেতে উঠেছে। বলেছে, জানো, এখানকার সমস্ত খরচ আমার। মাস মাস নেত্য মাসীর হাতে এক মুঠো করে টাকা তুলে দিই। বুঝলে? আলাদা বাড়ির হাঙ্গামা অনেক। লোকজন রাখতে হবে। দেখাশোনা করতে হবে। ঝামেলা কম! এখানে টাকা ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিস এসে হাজির।

অভিমানে রমলা গাল ফুলিয়েছে, বেশ, আলাদা বাড়িতে নিয়ে যাবার মুরোদ না থাকে, বাইরেই কোথাও নিয়ে যাও।

বাইরে? অজয় সিংহ উত্তেজিত হয়ে উঠল, কোথায় যাবে একবার বল? দিল্লী, বোম্বাই? ঘরের কাছে দার্জিলিং?

না গো না, অতদূরে নয়। কলকাতা শহরেই নিয়ে বেড়াও একটু। তোমার নেত্যমাসী সেই যে এনে খাঁচায় পুরেছে, তারপর একটু বেরোতে পারি নি।

এই কথা। কালই গাড়ী নিয়ে আসব। বাড়ির গাড়ী আনা মুশকিল, জানাজানি হয়ে যাবে। এক বন্ধুর গাড়ী নিয়ে আসব। ঠিক ছটায়, তুমি সেজেগুজে তৈরী থেক।

ঠিক ছটাতেই অজয় এল। সেজে গুজে রমলা তৈরী ছিল। আশ পাশের তু একটি মেয়ে উঁকি দিতে এসেছিল, রমলা তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এখনই হাজার প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, হবে হাজার কৈফিয়ত। নিভৃতে তিল তিল করে নিজে পুড়বে, রমলা তার কৃতকর্মেব প্রায়শ্চিত্ত কববে, কিন্তু আর কারো কৌতূহলের বস্তু হতে পারবে না।

এরা ওকে ভুল বুঝবে। ভাববে, একটা আবরণ দিয়ে নিজেকে ঢাকার চেষ্টা করছে। যা নয়, তাই প্রমাণ করছে নিজেকে। ওর বংশ পরিচয়, ওর আভিজাত্য কেউ বিশ্বাস করবে না।

বন্ধ দরজার ওপার থেকেও টিটকারির শব্দ ভেসে এল।

দেমাক লো দেমাক! কটা বংয়ের দেমাক।

এখন সময় ভাল যাচ্ছে, মাসীর পেয়ারের। তাই অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ছে না। চাকা ঘুরবে একদিন। ও রূপও থাকবে না, যৌবনও নয়। তখন আমাদের মতন সন্ধ্যার অন্ধকারে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। খদ্দের দেশলাই জ্বেলে পরখ করে তবে ঘরে ঢুকবে।

তু হাতে কান চেপে রমলা বসে রইল। জীবনে কি ভেবেছিল, এমন আস্তানায় বসে এ ধরনের কথা তাকে শুনতে হবে? এই সব মেয়েদের কাছ থেকে?

কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি। বাইরেও কি কথা শোনাবার লোকের অভাব। মিষ্টার সেন টেলিফোনে কথা শোনান

নি? শান্তনু বোস কি অব্যাহতি দিয়েছিল? এই সেদিন অরুণও তো বলতে ছাড়ে নি। সম্ভবত লজ্জায় মুখে বলতে পারে নি, কিন্তু সমস্ত জ্বালা, দাহ এনেছিল কলমের মুখে। প্রতি ছত্রে তীব্র গরল ঢেলে দিয়েছিল।

বাইরে বরং ভাল ছিল। বার বার পোশাক পরিচ্ছদে ভদ্র সেজে রমলা লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ ছদ্মবেশ অটুট থাকে নি। সবাই মিলে তার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল। তার প্রকৃত চেহারা শান্তনুর কাছে ধরা পড়েছে, অরুণের কাছেও। সে কলঙ্কিত, সে ভ্রষ্টা। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অরুণকে কাছে টানতে গিয়েছিল। ভ্রাতৃপ্রেমের পসরা সাজিয়ে আবাহন করতে গিয়েছিল তাকে, নির্মম আঘাতে কাছে টানার সে স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

যাদের দরজা বন্ধ করে রমলা ফিরিয়ে দিল, তাদের সঙ্গে তার কিন্তু খুব বেশী প্রভেদ নেই। অন্তত এরা ভান করে না। মিথ্যা ইজ্জতের বোরখা জড়িয়ে আভিজাত্যের ভড়ং করে না। হাবে ভাবে, চালচলনে এরা যা, এরা তাই।

এদের এখানে আনার জন্য যে সমাজ দায়ী, সেই সমাজই টেনে হিঁচড়ে রমলাকেও এই অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছে।

তবু পারবে না। কোথায় এখনও একটা ক্ষীণ বাধার বেড়া রয়েছে। রমলা নিসঙ্কোচে, নির্দ্বিধায় এদের সঙ্গে মিশতে পারবে না।

অজয় ঘরে ঢুকেই চমকে গেল।

বা, একেবারে মহারানীর মতন দেখাচ্ছে। কি ইচ্ছা করে জান?

কি?

তোমাকে এই বেশে একবার বাবার কাছে টেনে নিয়ে যাই। বুড়ো একেবারে থ হয়ে যাবে। কি সব হুটো বউই দেখে দেখে এনেছিল। পছন্দ বলিহারি!

থাক, থাক, তোমার মুরদ। তোমাদের মুরদ আমার জানা আছে। তোমরা কেবল বাকসর্বস্ব।

আরে দেখ না। বাবা আর কদিন, তার অফিসের তাক থেকে গণেশকে সরিয়ে তোমাকে বসাব।

খুব হয়েছে। চল, এখন।

ঘোমটা দিয়ে রমলা মোটরে উঠল। একটু গিয়েই ঘোমটা নামিয়ে দিল পিঠের ওপর। সামনের দিকে চেয়েই চমকে উঠল।

ড্রাইভারের পাশে শীতল। পরিপাটি পোশাক। ভ্রূ কুঁচকে ফিসফিস করে রমলা অজয়কে বলল, এ কেন? একে কেন নিয়ে এলে?

আমি আনব কেন? নেত্য মাসী সঙ্গে দিলে যে।

না, না, নেমে যেতে বল। রমলা বিরক্ত হল।

আহা হা, অসুবিধাটা আর কিসের। তোমার গায়ে এত গহনা রয়েছে, থাকই না সঙ্গে।

রমলা আর কোন কথা বলল না। বুঝতে পারল, এখনও নেত্য মাসী তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। ঠিক ভেবেছে, অজয়কে ভুলিয়ে রমলা কোথাও সরে পড়বে। কিংবা বলা যায় না, পুলিশেই হয়তো খবর দিয়ে দেবে।

মোটর ইডেন গার্ডেনে থামল। অজয়ের ইচ্ছা ছিল গঙ্গার ধারে বেড়াবে। কিন্তু সে কথা বলাতে রমলা বিচলিত হয়ে উঠেছে। না না, ওই গঙ্গার কূলে অনেক স্মৃতির মুক্তা ছড়ানো। আঁচল ভরে কুড়িয়েও রমলা শেষ করতে পারবে না। আর এক প্রবঞ্চকের নিশ্বাস জড়ানো রয়েছে ওখানকার বাতাসে। গঙ্গার ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফেনা। ওখানে গেলে রমলা জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। অবসাদে দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

ইডেন গার্ডেনে আধো-অন্ধকার গাছের তলায় অজয়ের গা ঘেঁষে বসে রমলা দেখতে পেল একটু দূরে দুটি আগ্নেয়চোখ। এক

মুহূর্তের জন্যও সে জ্বলন্ত দৃষ্টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। নেত্যমাসী কাঁচা মেয়ে নয়, কাঁচা হলে শহরের বুকে এমন ফলাও ব্যবসা করতে পারত না।

একটা কথা বলব তোমায়?

বল? অজয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল।

তুমি যদি শোন, যদি জানতে পার আর কেউ ভোগ করেছে আমায়, তাহলে ঘৃণা করবে না, বিরক্ত হবে না?

মাথা খারাপ। একটা ফুল একজন শুঁকেছে বলে আমি শুঁকব না? তা হলে ফুলের আর কি? আমারই তো ক্ষতি। আসল কথাটা হচ্ছে যতটুকু বাঁচবে, ফুর্তি করে নাও। কটা দিনের জন্যই বা পৃথিবীতে আসা, তার মধ্যে বেদ-বেদান্ত আউড়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলে আনন্দ করাব জন্য আর বাকি রইল কি বল? স্পর্শকাতরতা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে এ অনেক ভাল। যতটুকু আয়ু ততটুকু আনন্দ। অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, শুধু বর্তমানটুকু সুখের স্তবকে মোড়া।

কিন্তু আমাকে বিয়ে করলে তো আবো কাছে কাছে পাবে আমাকে?

এও তো কাছে কাছে পাচ্ছি। যখন খুশী যেতে পারছি তোমার কাছে। বাইরে যাবার ছুতোয় তোমার কাছে রাত কাটাচ্ছি। বিয়ে করলে তো তোমারই ক্ষতি। তোমার সুখ শান্তি হাসি আনন্দ সব শুধু একজনকে ঘিরে থাকবে। আমার যদি কিছু হয়, তুমি দুঃখ পাবে। জীবন থেকে সব রং মুছে ফেলে কি বিশ্রীভাবে দিন কাটাতে হবে বল তো? বিধবার জীবন যে কি দুঃখের তা জানি তো!

থাক, থাক, অন্য কথা বল। বমলা অজয়ের হাতে চাপ দিল।

কথা থাক। কাজ শুরু করা যাক। অজয় হেসে পকেট থেকে চ্যাপটা একটা বোতল বের করল। ছোট্ট এক গ্লাসও।

গ্লাসে ঢেলে রমলার ঠোঁটের কাছে ধরে বলল, নাও, পেসাদ করে দাও।

অজয় কি অন্তর্যামী! এই মুহূর্তে ঠিক এমন একটা কিছুরই প্রয়োজন বোধ করছিল রমলা। বিস্মৃতি আনতে পারে এমন কোন মহৌষধ। একসঙ্গে অনেকগুলো নাম ভিড় করে এসেছিল মনের সামনে। জয়ন্ত, শান্তনু, মিস্টার সেন। মিস্টার সেনের কথাই বেশী। দুর্ঘটনায় মিস্টার সেন মারা গেছেন বলেই কি জীবন থেকে সব আনন্দ, সব সুখ রমলা মুছে ফেলেছে? দীন জীবন যাপন করছে? আর কোন আশার দিকে, আশ্বাসের দিকে, সে হাত বাড়ায়নি?

কিন্তু তাই বা কেন হবে। মিস্টার সেন তো কোনদিনও তাকে স্বীকার করেন নি। বরং রক্তের ক্ষীণ সূত্রটুকু, সান্নিধ্যের সম্ভাবনা-টুকুও কৌশলে অপসারিত করেছেন।

এই অজয় সিংহও একদিন আসা বন্ধ করল। কোথাও কিছু নেই। বিকেলে রমলা সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। কয়েকদিন আগে অজয়ের সঙ্গে গাড়ীতে বেড়াতে বেড়াতে দেয়ালের গায়ে পোস্টার দেখেছে। অরুণের লেখা নতুন বই 'অশ্রু কাজল'।

শুনছ? রমলা অজয়ের হাতে হাত রেখেছে।

বল।

ওই যে পোস্টার দেখছ। অশ্রু কাজল। সামনের বুধবার হবে নিউ এম্পায়ারে, আমাকে নিয়ে যেতে হবে ওই বই দেখতে।

অজয় নীচু হয়ে বলল, আরে দূর্, ও আবার বই নাকি। স্টারে চন্দ্রগুপ্ত হচ্ছে, তার টিকিট কাটি বরং সামনের রবিবার।

না, না, ওই বইটা দেখব। ও বইটার খুব নাম। আগে যে নায়িকা সাজত তার সঙ্গে আমার খুব চেনা। ওই 'অশ্রু কাজল' এর দুটো টিকিট কেনো। সবচেয়ে বেশী দামের।

অজয় হাসল, তুমি যদি বল তো, সারা হলের টিকেটই কিনে নিই। স্রেফ তুজনে বসে বসে দেখব।

ইয়ারকি করতে হবে না। থিয়েটার দেখব তো সামনে বসে দেখব। দশজনের পিছন থেকে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে কিছু দেখা যায় না।

যথা আজ্ঞা দেবী।

অজয়ের নির্দেশে মোটর ঘুরল। রমলা বসে রইল গাড়ীতে। অজয় নেমে তু' খানা দশ টাকার টিকেট কিনে নিয়ে এল।

বাড়ি ফিরে এসে রমলা অনেকবার ভেবেছে। একেবারে সামনের সীটে বসবে, ওই দলের সবাই তো চেনা। হঠাৎ যদি চোখাচোখি হয়ে যায়। কাছে এসে কেউ কথা বলতে চায়। পুবোনো দিনের কথাব রেশ।

সব চেয়ে ভয়ের কথা, যদি অরুণের সঙ্গে দেখা হয়। নাট্যকার হিসাবে অরুণ নিশ্চয় থাকবে। হয়তো সামনের সারির কাছাকাছিই ঘোরাঘুরি করবে। চোখে চোখ পড়লেই চিনতে পারবে।

অরুণ কথা বলবে না। পবিত্র একটা সম্পর্ক রমলা তিক্ত করে দিয়েছে। পুরোনো পরিচয়েব জের সে টানতে আসবে না। বরং এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা করবে।

কিংবা চেয়ে চেয়ে রমলার পাশেবসা লোকটিকে দেখবে। ভাববে তাব হিসাবে ভুল হয় নি।

তখন কি করবে রমলা? অরুণের সেই ঘৃণা-বিদ্বেষ-ভবা দৃষ্টির সামনে কি করে মাথা তুলবে!

কেন, ভয়ই বা কি! অরুণ কি সব কিছুর বিচারক! পরিবেশ পরিস্থিতি কিছু না দেখে শুধু মানুষের পাপটাকেই প্রাধান্য দেবে, এই বা কি বিচার! অরুণেব কি উচিত ছিল না সোজাসুজি রমলাকে এসে প্রশ্ন করা। যাতে তার দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান হয়। রমলা তাকে সব কিছু খুলে বলতে প্রস্তুত ছিল। কোন একজনকে বলতে না পারলে তার মনের নিরুদ্ধ বাষ্প তাকে অস্বস্তি দিচ্ছিল।

সে সুযোগ অরুণ তাকে দেয় নি। কাছে আসে নি। অন্যের মারফত চিঠি পাঠিয়েছে।

দেখুক অরুণ, সে যা ভেবেছে রমলা তার চেয়ে অনেক, অনেক খারাপ।

কিন্তু অজয় এল না।

আটটা পর্যন্ত দেখে রমলা পোশাক বদলাল। বারান্দার কাছে গিয়ে নেত্যমাসীকে ডাকল।

আজকাল আর শীতল পাহারায় থাকে না। রমলা বাইরে গেলে তার সঙ্গেও যায় না। মাসী বুঝতে পেরেছে রমলা পোষ মেনেছে। এ-জীবন তার ভাল না লাগুক, এ-জীবন থেকে বেরোবার তার সব পথ বন্ধ। এ বেড়া-জাল থেকে নিষ্ক্রমণের পথ সে আর খুঁজবে না।

রমলার ডাকে নেত্য মাসী ওপরে উঠে এল।

কি হল গো মেয়ে? আমি আবার মোটা মানুষ, তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেও পারি না। একটু আসতে দেরি হয়ে গেল। আজই এমন দশা। আমায় দেখলে কেউ বলবে যে এই নেত্যবালা এক সময় এক ঘণ্টা টানা নাচতে পারত? বিশ্বাস না হয়, তোমাকে পুরোনো হ্যাণ্ডবিল দেখাব একদিন। কি ব্যাপার বল দিকিনি?

রমলা বিছানায় বসে ছিল। বসে বসেই বলল, ছটায় আসবার কথা, আটটা বেজে গেল। হল কি মানুষটার? একবার খোঁজ খবর নেবে তো?

ও মা তাই তো বটে। আজ তো তোমাদের থেটার দেখতে যাবার কথা। ছেলে কাল আমাকে মাংসর টাকা দিয়ে গেল। বলে গেল, বেশ ঝাল দিয়ে রেঁধে রাখ মাসী, রাত্তিরে এসে খাব। দাঁড়াও, খবর নিচ্ছি।

নেত্য মাসী নেমে গেল।

আশে পাশে আছে টগর, জুঁই, অতসী, কামিনী। ফুলের নামে নাম। বাসি ফুলের মালা। এ ফুলে পূজা হয় না, কোন বিশেষ প্রিয়জনকে উৎসর্গ করাও যায় না। এরা শুধু একদিন ফুল ছিল। আজ ভোগের পাত্রে শুধু উচ্ছিষ্টের রাশ।

রমলা চিঠি লিখে দিয়েছিল। অজয় আসে নি। তারপরেও রমলা অনেকবার খোঁজ নিয়েছে, কিন্তু অজয়ের পাত্তা পায় নি। শুধু এটুকু খবর সংগ্রহ করেছে। অজয়ের বাবা মারা গিয়েছেন। অজয়রা চলে গেছে বেনারস। মামার কাছে।

মাস তিনেক পরে নেত্য মাসী কথাটা পাড়ল।

হ্যাঁ গা মেয়ে, যা হবার তাতো হল। তোমাকেও পথে বসাল, আর আমার যে কি সর্বনাশ করে গেল, তা আর বলবার নয়। এক কাঁড়ি টাকা খরচ করালে। এ ঘরের সব আসবাব পত্র ভাড়া করা। আজ চার মাসের ওপর ভাড়া বাকি। নিজের গাঁট থেকেই দিতে হবে। কি আর করব বল। তা, আমার হাতে আর এক বাবু রয়েছে। তোমাকে তার খুব পছন্দ। অজয়ের সঙ্গে বাইরে যেতে দেখেওছে কয়েকবার। বলেছে, এ মুক্তোর মালা বাঁদরের গলায় ঝোলালে কেন? মস্ত ঘরের ছেলে। শিমুলঘাটার রাজবাড়ির সম্পর্কে দৌহিত্র। কি চেহারা গো, ঠিক যেন রাজপুত্তুর। আজ বিকেলে এলে, তোমার ঘরে একবার নিয়ে আসব। নিজের চোখে দেখবে।

রমলা উঠে আলমারি খুলল। তার ঘরে সব সময় বোতল মজুদ থাকে। ফুরিয়ে গেলেই শীতল নিয়ে আসে।

গ্লাসে ঢেলে মুখে ফেলে দিল রমলা। আগে আগে মুখটা বিকৃত করত, এখন কিছু করে না। অম্লানবদনে গ্লাসের পর গ্লাস নিঃশেষ করে।

এদেহের ওপর রমলার আর কোন মমতা নেই। যত কিছু বিপত্তি এই দেহ নিয়েই। দুঃখ, জ্বালা, তাপ সব কিছু এই দেহকে কেন্দ্র করে। সব দুর্ভোগ এই দেহের জন্যই।

এ দেহ তো খোসা। বাইরের আবরণ। এ নিয়ে কে লোফা-লুফি করল, তা নিয়ে রমলার তিলমাত্র মাথাব্যথা নেই। একজন যাবে, একজন আসবে। এ পেশার এই বুঝি নীতি।

এরপর এল সুরজিত বসাক। দীর্ঘ, গৌরবর্ণ চেহারা। উচ্চকণ্ঠে কথা বলে। স্পষ্ট কথা। কারও সম্মান রাখে না। খুব ভাল শিকারী। পাখী, খরগোস নয়, লক্ষ্য হরিণ আর বাঘ।

ঘরে ঢুকেই পাঞ্জাবির পকেট থেকে জড়োয়ার একটা হার বের করে রমলার গলায় ঝুলিয়ে দিল। বলল, তোমাকে প্রথমদিন দেখেই এ হারটা গড়িয়ে রেখেছি। জানি আমার দিন একসময় আসবেই। সহজে না আসে, বাঁকা পথ ধরতাম। ওই অজয় বাবুকে দিতাম বন্দুকের গুলিতে খতম করে।

রমলা শুনল। কথাগুলো কানে গেল, কিন্তু সব যে বুঝল এমন নয়। বোঝাব শক্তি তখন ছিল না। ভোর থেকেই নেশা শুরু করেছিল। ইচ্ছা করেই। যত অসুবিধা তো মনকে নিয়েই। সেই মন যাতে বেঁকে না বসে, সেই জন্যই এই ব্যবস্থা।

কি গান গাইতে পার? সুরজিত কার্পেটের ওপর বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করল।

না, গাইতে পারি না, অভিনয় করতে পারি। রমলা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

ব্রাভো। ঠিক আছে। একদিন অভিনয় শুনব। তুমি জনার পার্ট করবে। আমি প্রবীর। দাও মাগো সন্তানে বিদায়। দূর, সম্পর্কটা সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একতলায় মাসী যে কি জিনিস খাওয়ালে।

বোঝা গেল সুরজিতও প্রকৃতিস্থ নয়।

আমি, আমি বেহালা বাজাতে পারি।

বেশ তো, বাজাও।